বিধবার ছেলে।

শ্রীশিবনাথ শাস্ত্রী এম, এ, প্রণীত।

১৩২২

মূল্য এক টাকা মাত্র।

প্রকাশক
শ্রীপ্রিয়নাথ ভট্টাচার্য্য,
২৫নং সুকিয়া ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।

২১১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, ব্রাহ্মমিশন প্রেস হইতে
শ্রীঅবিনাশচন্দ্র সরকার দ্বারা মুদ্রিত।

ভূমিকা।

আমার প্রণীত "মেজবৌ," "যুগান্তর," "নয়ন-তারা" প্রভৃতি যাঁহারা পাঠ করিয়াছেন তাঁহারা সকলেই জানেন যে আমার উপন্যাস লিখিবার বাতিক আছে। প্রায় পনর যোল বৎসর পূর্ব্বে "বিধবার ছেলে" নামক একখানি উপন্যাস লিখিয়া রাখিয়াছিলাম। তৎপরে শরীর রুগ্ন ভগ্ন হওয়াতে তাহা ফেলিয়া রাখি। কবে চলিয়া যাই, এই ভাবিয়া পরিবর্ত্তিত আকারে তাহা প্রকাশ করা গেল। পাঠকগণ ইহাতে অনেক ভ্রম প্রমাদ দেখিতে পাইবেন। আশা করি তাঁহারা উদার ও সহিষ্ণু হইয়া সে সকল গণনা করিবেন না। ইতি

কলিকাতা, } শ্রীশিবনাথ শাস্ত্রী।

বিধবার ছেলে।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

হরিরামপুর চব্বিশ পরগণার মধ্যে একটি প্রসিদ্ধ গণ্ডগ্রাম, কলিকাতার কয়েক ক্রোশ পূর্ব্ব-দক্ষিণ কোণে প্রতিষ্ঠিত। সেখানে প্রধানরূপে ব্রাহ্মণ কায়স্থেরই বাস। তাঁহাদের কাজ চালাইবার জন্য গ্রামের পার্শ্বে কয়েক ঘর কামার, কুমার, শেক্‌রা, ধোপা, মুচি প্রভৃতির বাস আছে বটে, কিন্তু গ্রামটি ব্রাহ্মণ কায়স্থের গ্রাম বলিয়া প্রসিদ্ধ। এই দেশের ব্রাহ্মণগণ এক সময়ে জ্ঞানে গুণে ও পদমর্য্যাদাতে সর্ব্বত্র সমাদৃত ছিলেন; দূর সুদূরে, ধনী গৃহস্থের গৃহে, ক্রিয়া কর্ম্ম উপলক্ষে নবদ্বীপ ভাটপাড়া প্রভৃতি স্থানের ব্রাহ্মণদিগের ন্যায় ইহাঁদেরও অনেকে নিমন্ত্রিত হইতেন। তাঁহাদের অনেকে আজিও ব্রাহ্মণ-কুলোচিত যজন, যাজন, অধ্যয়ন, অধ্যাপনাদি কার্য্যে নিযুক্ত আছেন বটে, কিন্তু কালের গতি কে বারণ করিতে পারে? স্বীকার করিতে বাধ্য হইতেছি যে তাঁহাদের অনেকে ব্রাহ্মণ-কুলোচিত যজন যাজনাদি কার্য্য রাখিতে পারিতেছেন না; তাঁহাদের অনেক বাড়ীর ছেলেরা ইংরাজী শিখিয়া চাকুরী লইয়া দেশবিদেশে বসিয়াছে; কেহ কেহ ওকালতী প্রভৃতি আরম্ভ করিয়াছে; অধিক কি কেহ কেহ নীচ জাতির ন্যায় ব্যবসা বাণিজ্যেও বসিয়াছে। এক সময়ে এই গ্রামের ব্রাহ্মণদের মধ্যে ১০।১২ খানি টোল চতুষ্পাঠী ছিল, কালে তাহা অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছে।

সংস্কৃতের চর্চ্চা রহিত হইয়াছে বলিলে অত্যুক্তি হয় না। এই গ্রামের পঞ্চাশ ষাট বৎসরের পূর্ব্বের কথা বলিতে যাইতেছি।

পঞ্চাশ বা ষাট বৎসর পূর্ব্বে, একদিন বৈকালে, শ্রীরাম চক্রবর্ত্তী নামক একজন ব্রাহ্মণ কোনও কার্য্যোপলক্ষে গ্রামে বাহির হইয়াছেন; যাইতে যাইতে হরিশ ভট্টাচার্য্য নামে দক্ষিণ পাড়ার একটী ব্রাহ্মণের সঙ্গে দেখা হইল। তাঁহাকে দেখিয়া শ্রীরাম দাঁড়াইলেন, এবং হরিশকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—"কি হে হরিশ কেমন আছ? দাঁড়াও দাঁড়াও, একটা কথা আছে।"

হরিশ। (নিজের গতি রোধ করিয়া) কি কথা?

শ্রীরাম। কাল বৈকালে দেখলাম তোমাদের পাড়ার রামগতি বিদ্যালঙ্কারের ছেলে মহেশ একদল ছেলে সঙ্গে বাঁশ ঘাড়ে করে নিয়ে যাচ্চে। বোধ হয় মাঝের পাড়াতে যে বারোয়ারি পূজা হবে, যাত্রাগান হবে, তার আটচালা বাঁধবার জন্যে বাঁশ কেটে নিয়ে যাচ্চে। যা'হোক, দেখে বড় দুঃখ হলো। এত বড় পণ্ডিতের ছেলে, এত বড় ঘরের ছেলে, টোল চতুষ্পাঠীতে পড়্‌ছিল, তাও ছাড়্‌লে, মামা কলকেতায় নিয়ে গেল, সেখান থেকেও দুবছর পরে চলে এসে ডাংপিটেম করে বেড়াচ্ছে! বয়স কুড়ি একুশ বছর হলো, ডাংপিটেম আর গেল না! পড়া শোনা নাই, ভাল কাজে মতি নাই, ছেলেগুলোর মাথা খেলে; নিজেও কিছু করবে না, তাদেরও কিছু কর্ত্তে দেবে না। এমন কি কেউ নেই যে ওকে একটু শাসনে রাখে?

হরিশ। আপনি সব কথা জানেন না। ও আগেকার ডাংপিটে ছেলে আর নাই। ও আট বৎসর পর্য্যন্ত পাঠশালে পড়ে, তারপর বাপের টোলে বসে; সেখানে বেশ পড়্‌ছিল; ব্যাকরণ, কাব্য, অলঙ্কার বেশ শিখছিল;—তারপর, ওর বাবাত ওর পনর বছর বয়সের সময়

ভবধাম ত্যাগ করলেন; টোল চতুষ্পাঠী উঠে গেল; ওরও পড়া শেষ হলো। তারপর ওর মামা ওকে কলকেতায় নিয়ে গেলেন; সেখানে সংস্কৃত কালেজে ভর্ত্তি করে দিলেন। ঈশ্বর বিদ্যেসাগর তখন সেখানকার কর্ত্তা ছিলেন; ও গিয়ে তাঁর হাতে পড়্‌লো। বিদ্যেসাগরের এক ভাই ওর সঙ্গে এক ক্লাসে পড়তো; দুজনে খুব গলাগলি ভাব হলো। ও বিদ্যেসাগরের ভাইএর সঙ্গে তাঁর কাছে যেতে লাগলো; তিনি যেন ওকে কোল দিয়ে নিলেন! মহেশের মামা এ সব সংবাদ কিছু জানতেন না। তারপর, প্রথম বিধবা-বিবাহ যখন উপস্থিত, তখন বিদ্যেসাগর ওকে বিবাহ দেখতে যেতে বললেন; ও বিদ্যেসাগরের ভাইয়ের সঙ্গে বিয়ে দেখতে গেল। এ সংবাদে ওর মামা রেগে গেলেন এবং আপনার বাসা থেকে ওকে তাড়িয়ে দিলেন।

শ্রীরাম। তার পর?

হরিশ। তার পর আর অধিক কি বলবো? বিদ্যেলঙ্কার মশাই ত টাকাকড়ি কিছু রেখে যান নি; ব্রাহ্মণের বৃত্তিরূপে যা পেতেন, ক্রিয়া কর্ম্মেই সব ব্যয় করতেন; কেবল পৈতৃক জমি কয়েক বিঘে রেখে গিয়েছেন, তা হতে যে কিছু আয় হয়, সেই মাত্র ভরসা। এই অবস্থা দেখে মহেশের মামা কৈলাস চক্রবর্ত্তী মাসে মাসে দশটাকা দিতেন; তাও তিনি বন্ধ করেছেন, এখন দিন চলা ভার।

শ্রীরাম। ছি ছি, ওর মামা কৈলাস চক্রবর্ত্তী কি রকম লোক! একটা ছোঁড়ার উপর রাগ করে আপনার বোন্‌কে ভাসিয়ে দিলে! দুই ছেলে এক মেয়ে নিয়ে বিধবা বোন্ হাবুডুবু খাচ্চে, এমন সময় টাকা কয়টা বন্ধ করে দিলে! শুনতে পাই, কৈলাস মাসে আড়াই শ' টাকা মাইনে পায়; কলকেতাতে শ্বশুরের বাড়ী পেয়েছে; স্ত্রীর অনেক হাজার টাকা পেয়েছে;—বোনের মুখ চাইলে না, এ কি রকম! ওদের চলে কি করে?

হরিশ। তা আর কেন বলেন? মহেশ সন্ধ্যার সময় গিয়ে ব্রজনাথ দত্ত মশাইকে বিষ্ণুপুরাণ পড়ে শোনায়; তিনি নাকি মাসে পাঁচ টাকা করে দেন; সেই পাঁচ টাকা ও বিষয়ের সামান্য আয় এইমাত্র ভরসা। পাশের গ্রামে যে নূতন ইংরিজী স্কুলটা খুলেছে, মহেশ আপনার ছোট ভাই গিরিশকে বাংলা স্কুল ছাড়িয়ে তাতে ভর্ত্তি করে দিয়েছে। তার পড়বার ব্যয় পশ্চিম পাড়ার রামধন মিত্র দেবেন বলেছেন। বিদ্যেলঙ্কার মশায়ের উপর তাঁর প্রগাঢ় ভক্তি। তারপর, আগে বাড়ীতে একটা চাকর ছিল, তাও নাই; মহেশ নিজে বাজার হাট করে, গরুর গোয়াল পরিষ্কার করে, খড় কাটে, গরু দোয়; একটা ছেলেকে মাসে চারি আনা দিয়ে গরু চরিয়ে আনে। আগে একটা মেয়ে মানুষকে মাসে এক টাকা করে দেওয়া হত, সে এসে ঘরগুলা গোবর দিয়ে বাসন গুলি মেজে দিয়ে যেত; কৈলাস চক্রবর্ত্তী টাকা বন্ধ করা অবধি মহেশের মা নাকি সে মেয়ে মানুষটিকে ছাড়িয়ে দিয়েছেন, নিজের মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে নিজেই সব কাজ করেন। কেবল তা নয়, পাড়ার একটা মেয়েকে কয়েক সের চাল দিয়ে নিজে বসে বাড়ীর ঢেঁকিতে ধান ভানেন। ভাইএর উপর অভিমান করে ঘরের সকল কাজ নিজের মাথায় নিয়েছেন। মার উপর মহেশের কি ভক্তি—তা আর কি বলবো! মার চরণে নত হয়েই আছে।

শ্রীরাম। তা হবে না! ওর মা কিরূপ সাধু লোকের মেয়ে! আমি এত কথা জানতাম না। মহেশত খুব ভাল ছেলে!

হরিশ। দেখছেন কি? আরও শুনুন। ওর লেখা পড়ায় বড় মন। দিনে দুপুরে বই নিয়েই মগ্ন আছে; ইংরিজী শেখবার জন্যে কোমর বেঁধেছে। কুড়ি একুশ বছর বয়স হলো, ছোট ছেলেটির মত, বই নিয়ে নূতন ইংরিজী স্কুলের দ্বিতীয় মাষ্টার বাবুর কাছে যায়। তিনি আমাদের পাড়াতেই আছেন। সেখানে ছোট ছেলেটীর মত বসে; তাঁর

উপদেশ মত খাতায় সব লিখতে থাকে; দেখলে আশ্চর্য্য মনে হয়। তাঁর মুখে শুনি ইংরিজীতে খুব অগ্রসর হচ্চে।

শ্রীরাম। বটে, এমন ত দেখিনি!

হরিশ। আরও শুনুন। কোনও একটা ভাল কাজের কথা হলেই মহেশ কোমর বেঁধে সে কাজে লেগে যায়; সঙ্গী ছেলেগুলোকেও নাচিয়ে তোলে। আজ গ্রামের গরীব নিরাশ্রয় বিধবাদের জন্য চাঁদা সংগ্রহ করা, কাল পাশের গ্রামের খালটা বড় করবার জন্য দেশের বড়লোকদের বাড়ীতে হাঁটাহাঁটি করা, পরশু দুর্ভিক্ষের সংবাদ পেয়ে, গ্রামে গ্রামে ঘোরা ও টাকা সংগ্রহ করা;—এইরূপ নানা কাজে নিজে মেতে যায় এবং পাড়ার ছেলেদের নাচিয়ে তোলে। সম্প্রতি গ্রামে একটা মেয়ে স্কুল করবার জন্য ব্যস্ত আছে; বাড়ী বাড়ী ঘুরচে। তার উপর এই বার-ইয়ারির ব্যাপারটা এসে পড়েছে। কথাটা কি তা জানেন?—মাঝের পাড়ার ন্যায়রত্ন মশাই একদিন ওকে ডেকে বললেন—"মহেশ, আমাদের পৈতৃক ঠাকুরের বচ্ছর বচ্ছর উৎসব হয় তা'ত জান? আমাকে সকলে ধরেছে যে এবার বৈশাখ মাসে, উৎসবের সময়, একটা বারইয়ারির মত করা হোক; কলকেতা হতে যাত্রাওয়ালা এনে যাত্রা দেওয়া হোক; কথক নিযুক্ত করে কথকতা শোনান হোক, ইত্যাদি। এতে ত খাটবার অনেক লোক চাই; তোমার হাতে অনেক ছেলে আছে, তাই তোমাকে ডেকেছি; এটা কি করে তুলতে পারবে?" মহেশ বললে—"এত বেশ কথা; গ্রামের লোকের একটা আনন্দের ব্যাপার, যাত্রাগান কথকতা শুনবে মন্দ কি? কিন্তু সে যে বড় খরচের ব্যাপার!" ন্যায়রত্ন মশাই বললেন—"যাঁরা অনুরোধ করেছেন তাঁরা টাকা তোলবার ভার নিয়েছেন।" তাতে মহেশ বললে—"বেশ, আমাদের খেটে দেওয়া বৈত নয়, আমরা খাটবো।" তাই বাঁশ কাটতে গিয়েছে।

শ্রীরাম। আহা, বেশ ছেলে!

হরিশ। আরও শুনুন, পাড়ার কারু যদি ব্যারাম হলো, তবে আর যায় কোথা; মহেশ কাজ কর্ম্মের মধ্যে সময় পেলেই ছেলে সঙ্গে সেখানে উপস্থিত; রোগীর সেবা করতে লেগে গেল, বৈদ্যের বাড়ী যাওয়া, ঔষধ আনা, রোগীর কাছে রাত্রি জাগা—এই সব কাজের জন্য কোমর বাঁধলো। এইজন্য পাড়ার লোকে ওকে বড় ভালবাসে।

শ্রীরাম। ভালবাসবে না, এমন ছেলেকে কে না ভালবাসে?

মহেশ যে মেয়ে স্কুলের জন্য খাটিতেছে তার একটু ইতিবৃত্ত আছে। সে যখন কলিকাতায় পড়িবার সময় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের এক ভ্রাতার সঙ্গে সংস্কৃত কলেজে পড়িত, তখন বেথুন সাহেব বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ও তাঁর বন্ধুগণের সাহায্যে কিরূপে বেথুন স্কুল খুলিয়াছিলেন সেই গল্প শুনিত; বিদ্যাসাগর মহাশয় কিরূপ স্কুল সমূহের ইনস্পেক্টর রূপে স্থানে স্থানে বালিকা-বিদ্যালয় স্থাপনের চেষ্টা করিতেছেন, তাহারও সংবাদ পাইত; বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কাছে গেলেই তাঁর মুখে স্ত্রী-শিক্ষার আবশ্যকতা বিষয়ে উপদেশ পাইত; এইরূপে সে স্ত্রীশিক্ষার পক্ষপাতী হইয়া উঠে। তৎপরে মাতুল কর্ত্তৃক তাড়িত হইয়া যখন বাড়ীতে আসিয়া বসিল, তখন তার বয়স আঠার কি উনিশ; তার ভগিনীর বয়স সাত বৎসর। তার নাম তারা। তারাকে অশিক্ষিত রাখা মহেশের ভাল লাগিল না। ভগিনীকে প্রতিদিন সকালে ও বিকালে পড়াইতে আরম্ভ করিল; ইহা লইয়া পাড়াতে কথাবার্ত্তা ও হাসাহাসি চলিল। সে তাহাতে কর্ণপাত করিল না। তাহার মা জগদ্ধাত্রী দেবী নিজে এক সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণ পরিবারের কন্যা। তাঁহার পিতৃগৃহে অদ্যাপি ইংরাজী শিক্ষা পদার্পণ করে নাই। তিনি জন্মাবধি সনাতন ধর্ম্মের যজন যাজন দেখিয়া অভ্যস্ত; নিজেও সেই ধর্ম্মভাবে বর্দ্ধিত হইয়াছেন; পতিগৃহে

ধর্ম্মনিষ্ঠ পতির পার্শ্বে আসিয়া প্রাচীন সংস্কার সকল দশগুণ বর্দ্ধিত হইয়াছে। মহেশ মাতৃচরণে ভক্তিভরে নত; বিশেষতঃ, পিতার মৃত্যুর পর জননীকে চিরবিষাদে মগ্ন হইতে দেখিয়া মহেশ সর্ব্বদা চিন্তিত। মহেশ দেখিলেন, জননী তারার বিদ্যাশিক্ষা ভাল বাসিতেছেন না; দেখিয়া বড়ই চিন্তিত হইতে লাগিলেন। একদিন মাতা পুত্রে কথা হইল। জননী বলিলেন—"মহেশ, এ আবার কি? মেয়েমানুষকে কে কবে পড়ায়? তোমার সবই বাড়াবাড়ি।"

মহেশ। (জননীর পদধূলি লইয়া) মা, তুমি রামগতি বিদ্যালঙ্কারের পত্নী; শাস্ত্রে এ বিষয়ে কি আছে তোমার জানা উচিত। আমাদের শাস্ত্রে দেখতে পাবে, মৈত্রেয়ী, গার্গী প্রভৃতি ঋষিপত্নী ও ঋষিকন্যাগণ বিদ্যাবতী ছিলেন; সভামধ্যে পণ্ডিতদের সঙ্গে বিচার করতেন। স্ত্রীশিক্ষার বিষয়ে শাস্ত্রে কোনও নিষেধ নাই। আর মা, ভেবে দেখনা কেন, তুমি রামায়ণ শুনতে কত ভালবাস; তা শোনবার জন্যে একে ওকে তাকে খোসামোদ করে বেড়াতে হয়। যদি তুমি পড়তে জানতে, খেয়ে দুপুর বেলা শুয়ে মনের সাধে রামায়ণ পড়তে পারতে। তারা লেখাপড়া শিখলে তোমাকে রামায়ণ মহাভারত পড়ে শোনাতে পারে।

জননী। শাস্ত্রে যদি নিষেধ না থাকে, লোকে কেন মেয়েদের পড়ায় না? ঠিক কথা বলেছ, তারা পড়তে শিখলে ঘরে বসেই ত অনেক ভাল বিষয় পড়তে পারে ও আমাকে পড়ে শোনাতে পারে।

মহেশ। ও মা, লোকে কি শাস্ত্র দেখেই চলে? লোকাচারকেই ধর্ম্ম বলে ধরে রেখেছে।

জননী। তা বটে, তবে তুমি তারাকে পড়াও।

পাঠক হয়ত মনে করিতেছেন, মহেশ যাহা ধরিতেছে জননী তাহাতেই সায় দিতেছেন, এ কি রকম। ভিতরকার কথাটা এই—তিনি দৃঢ়চিত্তা

তেজস্বিনী মেয়ে তাহাতে সন্দেহ নাই ; কিন্তু পতিবিয়োগের পর হইতে কিরূপ স্তব্ধ ভাব ধারণ করিয়াছেন! যেন সাতেও হুঁ, পাঁচেও হুঁ। বিশেষতঃ, মহেশের প্রতি তাঁর অতিরিক্ত ভালবাসা ; তাঁকে তিনি সদাশয়, সচ্চরিত্র, মাতৃভক্ত ও সত্যানুরাগী ছেলে বলিয়া জানেন। তিনি মনে মনে স্থির করিয়াছেন, মহেশকে বাধা দেওয়া হবে না ; সে যেমন করিয়া পারে ঘরকন্না চালাক, আপনার মনের মত ব্যবস্থা করিয়া নিক। এই ভাবিয়া মৌনাবলম্বন করিয়া গৃহের কাজ ও জপের মালা সার করিয়াছেন। তাঁর আর একটা গুণ আছে, তিনি যাহা একবার উচিত বলিয়া অনুভব করেন, তাহাতে দৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠিত হন।

তারাকে নিজে পড়াইয়া মহেশের মন তৃপ্ত থাকিল না। গ্রামে একটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করিবার জন্য মন ব্যগ্র হইতে লাগিল। অবশেষে একদিন বিষ্ণুপুরাণ পড়িতে গিয়া ব্রজনাথ দত্ত মহাশয়ের নিকট এই প্রস্তাব উপস্থিত করিলেন। তিনি উদার প্রকৃতির মানুষ ছিলেন; তিনি বলিলেন—"আচ্ছা, মেয়ে স্কুল খুলতে হয় আমার বাহির বাড়ীর চণ্ডীমণ্ডপে খুলতে পার, কিন্তু পণ্ডিতের মাইনে এবং অপরাপর খরচ চালাবে কি করে ?"

মহেশ। আপনি মাথা হতে একটা মহাভার তুলে নিলেন। খরচ চলে যাবে। মাঝের পাড়ায় যদু চক্রবর্ত্তী বেশ পণ্ডিত মানুষ, তাত জানেন ; সংস্কৃত ও বাংলা বেশ জানেন। তাঁর সঙ্গে কথা কয়েছি, তাঁকে বলেছি প্রথম প্রথম তাঁকে পাঁচ টাকা করে দেব ; তার পর স্কুল ভাল করে বসে গেলে মাসে দশ টাকা দেওয়া যাবে ; তাঁকে পড়াবার ভার নিতে হবে ; তিনি তাতে রাজি হয়েছেন। তারপর, প্রথমে বেঞ্চি টেঞ্চি করবো না ; পাঠশালে ছেলেরা যেমন মাদুরে বসে, তেমনি মেয়েরাও মাদুরে বসে পড়বে ; ক্রমে বেঞ্চি করব। গ্রামের ভদ্রলোকদের কাছে ভিক্ষে করে

খরচের কয়টা টাকা কি তুলতে পারব না? নিতান্ত না হয় কলিকাতায় গিয়ে বিদ্যেসাগর মশাইকে ধরে আবশ্যক মত টাকা সংগ্রহ করব।

ব্রজনাথ দত্ত। (অট্টহাস্য করিয়া) হাঃ হাঃ, তাইত, তোমার পিছনে বিদ্যাসাগর আছেন তা ভুলে গিয়েছিলাম। তা যেন হলো, গ্রামের লোক কি স্কুলে মেয়ে দেবে?

মহেশ। সেই একটা ভাবনা আছে। আমরা মেয়েদের পড়াটা একটা খেলার ব্যাপার করে তুলব; ছবি দেখাব, গান শোনাব, গান শেখাব, সঙ্গে করে বাবুদের বাগান টাগান দেখাব, কাপড় চুড়ি প্রভৃতি প্রাইজ দেব, তাহলে মেয়ে জুটবে। মেয়েরাই বাপ মাকে অস্থির করে ওঠাবে।

ব্রজনাথ। এ যে দেখছি একটা বৃহৎ ব্যাপার করে ওঠাবে! মেয়েদের কাপড়, চুড়ি, গহনা প্রভৃতি দেবার খরচ কি ভিক্ষে করে তুলতে পারবে?

মহেশ। দেখবেন পারি কি না। ক্রিয়া কর্ম্মে গ্রামের লোক ত অনেক দান করেন, এই একটা দানের ব্যাপার থাকবে। আমরা ধরে বসলে আমাদের হাত কি তাঁরা ছাড়াতে পার্ব্বেন? আর একটা উপায় ভেবে রেখেছি।

ব্রজনাথ। সেটা কি?

মহেশ। জানেন ত, আমরা একদল ছেলে আছি কোমর বেঁধে ভাল কাজে লাগি। আমরা গৃহস্থদের বলব, যে তাঁদের বাড়ীতে শ্রাদ্ধ বিবাহ প্রভৃতি উপস্থিত হলে, আমরা কোমর বেঁধে লুচি ভাজব, রান্না করব, পরিবেশন প্রভৃতি সকল কাজ করব, তাঁরা আমাদের কিছু না দিয়ে মেয়ে স্কুলের জন্য কিছু কিছু দেবেন।

ব্রজনাথ। এ একটা উপায় বটে। তোমার অসাধ্য কর্ম্ম নাই দেখ্‌ছি। লোকে তোমাদের ডাংপিটে বলে, এমন ডাংপিটে ত ভাল!

মহেশ। আমরা কাজ করি, আপনারা পিছন থেকে উৎসাহ দিন; ভগবানের কৃপায় আমাদের অভাব থাক্‌বে না।

অতঃপর মহেশ বালিকা বিদ্যালয়ের জন্য কোমর বাঁধিয়া লাগিয়া গেলেন; যুবক বন্ধুদিগকে সঙ্গে লইয়া বাড়ী বাড়ী ঘুরিতে লাগিলেন। গৃহস্থদের মধ্যে কাহারও কাহারও বালিকাবিদ্যালয়ের প্রতি প্রবল আপত্তি, কিন্তু অধিকাংশের ঔদাসীন্য ভাব। সকলেই বলে—"এ আবার কি? মেয়েদের লেখাপড়া কেন?" এই তর্কে তর্কে অনেক সময় যাইতে লাগিল। অবশেষে কতিপয় পরিবারের লোক আপনাদের মেয়েদিগকে স্কুলে পাঠাইতে রাজি হইলেন। সেই মেয়ে কয়টি লইয়া স্কুল খোলা হইল। মহেশ আপনার ভগ্নী তারাকে প্রথম ছাত্রীদের মধ্যে একজন করিয়া দিলেন। মাসে দুই টাকা বেতন দিয়া একজন ঝি রাখিলেন; সে সকাল বিকাল আসিয়া বাড়ী বাড়ী হইতে মেয়ে আনিতে ও ঘরে পৌঁছাইয়া দিতে লাগিল। এইরূপে সকল কাজের মধ্যে মহেশের একটা কাজ বাড়িয়া গেল। সপ্তাহের মধ্যে তিন চারি দিন বৈকালে স্কুলে গিয়া মেয়েদের সঙ্গে গল্প করা, হাস্য কৌতুক করা, গান করিয়া শোনান ও গান শেখান, স্কুল ভাঙ্গিলে পণ্ডিতের সঙ্গে মেয়েদিগকে লইয়া বাবুদের বাগান টাগান দেখিতে লইয়া যাওয়া প্রভৃতি কাজ আরম্ভ হইল। গ্রামের লোক বলিতে লাগিল—"বাপ্‌রে বাপ্‌, মহেশের কি নেশা লেগেছে! মেয়ে স্কুল মেয়ে স্কুল করে পাগল হয়ে উঠল দেখ্‌ছি!" এদিকে মেয়েরা আনন্দে উল্লাসে পূর্ণ হইতে লাগিল; স্কুলে আসিবার জন্য ব্যস্ত; খাইতে একটু দেরি হয়, তা যেন সহ্য হয় না; মায়েরা বলেন—"ভাল ত মহেশ ভট্‌চায্যির

স্কুল, খেতে দেরি সয় না !" এইরূপে গ্রামে মেয়ে স্কুলের নাম বাহির হইয়া পড়িল; দেখিতে দেখিতে মেয়ের সংখ্যা বাড়িয়া যাইতে লাগিল। কিছু-দিনের মধ্যে মহেশকে একবার কলিকাতায় যাইতে হইল। সেঁখানে গিয়া একজন পরিচিত ভদ্রলোককে ধরিয়া মেয়ে স্কুলের জন্য চাঁদা তুলিতে লাগিলেন। এই উপলক্ষে একদিন বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। তিনি অনেক দিন পরে মহেশকে দেখিয়া আনন্দিত হইলেন; যেন তাহাকে প্রেমালিঙ্গনের মধ্যে লইলেন! সে কি কাজে ব্যস্ত আছে তাহা জানিতে পারিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয় অতিশয় আনন্দিত হইলেন; বলিলেন—"সে কি, তুমি একটা ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের গ্রামে মেয়ে স্কুল গড়ে তুলেছ! খুব ভাল।" এই বলিয়া স্কুলের সাহায্যের জন্য নিজে এককালীন বিশ টাকা দিলেন, এবং মাসিক চারি টাকা দিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। এতদ্ভিন্ন স্কুলের জন্য গবর্ণমেণ্ট সাহায্য পাওয়া যায় কি না দেখিবেন বলিলেন।

কলিকাতা হইতে প্রায় তিনশত টাকা সংগ্রহ করিয়া মহেশ গ্রামে ফিরিলেন। ফিরিয়া মেয়ে স্কুলের বেঞ্চ, টুল, চেয়ার প্রভৃতি প্রস্তুত করিবার জন্য লোক লাগাইলেন। ব্রজনাথ দত্ত মহাশয় তাঁহার উৎসাহ দেখিয়া পুলকিত হইলেন। একদিন বলিলেন—"মহেশ, বই রাখিবার জন্য আলমারি আর তৈয়ার করতে হবে না; আমার একটা পুরাতন আলমারি আছে, তাহাতে কতকগুলো পুরান বই ও ছেঁড়া কাগজ পড়ে আছে, আলমারিটা তেমন কাজে লাগচে না, সেটা তোমাদের মেয়ে স্কুলের জন্য দেব। আর আমার দুটো ঘড়ির মধ্যে একটা ঘড়ি স্কুল ঘরে রাখব, তাহলে পণ্ডিত মশাই সময় দেখে কাজ করতে পারবেন।" মহেশ তাঁহাকে অন্তরের সহিত ধন্যবাদ করিলেন। ক্রমে চেয়ার, বেঞ্চ প্রভৃতি প্রস্তুত হইয়া স্কুলটি চণ্ডীমণ্ডপ হইতে পাশের দুই

ঘরে উঠিয়া গেল এবং যথানিয়মে কাজ চলিতে লাগিল। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের চেষ্টার ফলস্বরূপ মাসিক পনর টাকা করিয়া গবর্ণমেণ্টের সাহায্য পাওয়া গেল। অতঃপর মাসিক দশ টাকা যদু পণ্ডিত মহাশয়কে দেওয়া হইতে লাগিল; এবং মহেশের এক যুবক বন্ধু নবীন চন্দ্র পাঠককে মাসিক ছয় টাকা করিয়া দিয়া দ্বিতীয় পণ্ডিতরূপে নিযুক্ত করা হইল। নবীন বড় উপহাস-রসিক ও সদাশয় মানুষ ছিলেন; তাঁর প্রকৃতি ভাল-বাসার প্রকৃতি ছিল; যে তাঁর সঙ্গে দুইটা কথা কহিত, সেই তাঁকে ভাল-বাসিত; তিনি সে গ্রামের সকল পাড়ায় মেয়েদের নিকট সুপরিচিত ছিলেন; তাঁহাকে পাইয়া স্কুলের মেয়েরা এবং তাদের বাড়ীর লোক সকলেই আনন্দিত হইল। নবীন পাঠক বেশ সুগায়ক; তাঁহার উপরে মেয়েদিগকে গান শিখাইবার ভার দিয়া মহেশ সেকাজ হইতে ছুটি লইলেন এবং অপরাপর কাজে মন দিতে লাগিলেন।

অপরাপর কাজের মধ্যে নিজের বিদ্যাশিক্ষা ও জ্ঞানোন্নতির চেষ্টা মহেশের একটা প্রধান কাজ দাঁড়াইল। তিনি প্রাতে গৃহকার্য্যে নিযুক্ত হইতেন, গোয়াল পরিষ্কার করা, গরু নাড়িয়া বাঁধা, নানাবিষয়ে মায়ের সাহায্য করা ইত্যাদি; তৎপরে বাজারে যাওয়া, যুবকদলের সঙ্গে মিলিয়া পীড়িত ব্যক্তিদিগকে দেখা, দরিদ্র নিরাশ্রয়দিগকে সাহায্য করা প্রভৃতি কাজে তাঁহাকে সর্ব্বদা ব্যস্ত রাখিত। দুপুর বেলা আহারের পর পাঠে নিমগ্ন হইতেন; অপরাহ্নে ব্রজনাথ দত্ত মহাশয়কে পড়াইতে যাইতেন; তৎপরে সন্ধ্যার পর আসিয়া আহারান্তে কিয়ৎক্ষণ তারাকে পড়াইয়া নিজে পাঠে নিমগ্ন হইতেন। এইরূপে দিন চলিতে লাগিল। কিন্তু ব্রজনাথ দত্ত মহাশয়ের প্রদত্ত' পাঁচ টাকা আর পৈতৃক বিষয়ের আয় সেও পাঁচ টাকার অধিক হইবে না, এই সম্বলে সংসার চালান মহেশের পক্ষে কিরূপ ক্লেশকর হইতে লাগিল তাহা সকলেই অনুমান করিতে

পারেন। মহেশের এক একবার ইচ্ছা হইতে লাগিল যে বাড়ীঘর ছাড়িয়া কলিকাতায় যান এবং বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সাহায্যে একটা কাজকর্ম্মে বসেন। কিন্তু ঘরসংসার কে দেখে? গিরিশের শিক্ষার বন্দোবস্ত কে করে? বড়বৌকে আনিবার কথা হইতেছে, সে বা আসিয়া কোথায় দাঁড়ায়? বিশেষতঃ জননীর চিন্তা তাঁর মনের এক প্রধান চিন্তা। পিতার মৃত্যুর পর জননীর জীবনে এক মহা পরিবর্ত্তন আসিয়াছে। তিনি যেন সংসার হইতে মন বাহির করিয়া লইয়াছেন; কবে চলিয়া যান, কবে চলিয়া যান, সেইদিনের অপেক্ষা যেন করিতেছেন; ঘরের কাজ কর্ম্ম না দেখিলে নয় তাই দেখেন; না খাইলে নয় তাই খান; ঘর-সংসার চালানর ভার সম্পূর্ণরূপে মহেশের উপরে দিয়াছেন। কাজেই মানুষটা গৃহে আবদ্ধ রহিয়াছে। মাতুলের সাহায্য বন্ধ হওয়ার পর, স্বল্প আয়ে সংসার চালানর ভার যেন দুর্ব্বহ বোধ হইতেছে।

এই সকল চিন্তাতে মহেশের হাত পা যেন বাঁধা আছে, নড়িতে পারেন না। তবে মানুষটা প্রেমিক, উৎসাহী ও সদানন্দ মানুষ, তাই দেখিলে কেহ মনে করিতে পারে না যে তাঁর প্রাণে কোনও কষ্ট আছে। তিনি যখন বৈকালে এক পার্শ্বের বাড়ীতে যুবক বয়স্তদিগের সঙ্গে গিয়া বসেন, তখন হাসির ধ্বনিতে ঘর ফাটিতে থাকে। মনটা যখন বড়ই খারাপ হয়, তখন দৌড়িয়া ব্রজনাথ দত্ত মহাশয়ের কাছে যান। তাঁকে বিষ্ণুপুরাণ শুনাইবার জন্য এক ঘণ্টা করিয়া যাইবার কথা, কিন্তু ফলে কোন কোনও দিন দুই তিন ঘণ্টা তাঁর সহবাসে থাকেন। কেবল যে বিষ্ণুপুরাণ পড়া হয় তাহা নহে, আরও অনেক সদালোচনা হইয়া থাকে। জীবনের এই সংগ্রামের মধ্যে বালিকাবিদ্যালয়-স্থাপনের নেশাটা আসিয়াছে, সেও একটা সুখের বিষয়। সেই জন্য বাড়ী বাড়ী ঘোরা, টাকা তোলা, মেয়ে সংগ্রহ করা,

তাদের পড়া দেখা প্রভৃতি একটা মস্ত কাজ। সেটা এক বিনোদনের উপায়।

ইহার উপরে বাড়ীতে আসিয়া জননীর কাজে সাহায্য করা তারার ও গিরীশের পড়াশোনা দেখা তাতেও মনটা ভাল থাকে। মাতার শ্রম লাঘব করিবার জন্য যে তাঁর কিরূপ ব্যগ্রতা তার বর্ণনা হয় না! বাড়ীতে পদার্পণ করিয়াই রান্নাঘরের দ্বারে উপস্থিত হন, ও বলিতে থাকেন—"মা, তুমি কি করছ? আমি কি কিছু করে দিতে পারি?" যদি দেখিলেন যে মা উনান ধরাইতে বসিয়াছেন, অমনি নিজের জুতা খুলিয়া ঘরে প্রবেশ করিয়া বলিতে লাগিলেন—"সর সর মা, আমি উনান ধরিয়ে দিচ্ছি।" উনানের কাঠ লইয়া মাতাপুত্রে কাড়াকাড়ি পড়িয়া যায়।

এতদ্ভিন্ন মহেশের বিনোদনের আর একটা উপায় আছে। শৈশব হইতেই পশুপক্ষী পুষিবার বাতিকটা আছে। যখন দুই তিন বৎসরের ছেলে, মায়ের কোলে বাড়ীর বাহির হইতেন, তখন পথে গাছে একটা সুন্দর পাখী যদি দেখিলেন, অমনি আর কোনও দিকে দৃষ্টি নাই, "মা পাতী, মা পাতী" করিয়া সেই দিকে হাঁ করিয়া তাকাইয়া রহিলেন; সেই পাখীর প্রত্যেক গতিবিধি লক্ষ্য করিতে লাগিলেন। ছয় সাত বৎসর বয়সে যখন পাঠশালে যাইতেন, তখন একদিন পাততাড়ি বগলে হাঁ করিয়া পাখী দেখিতে দেখিতে খানার জলে পড়িয়া গেলেন। বড় হইয়া পিতার টোলে পড়িবার সময় বিড়াল, কুকুর, পাখী পুষিতেন; সেগুলি মরিয়া গেলে কান্না! কান্না! বুঝাইয়া শান্ত করা ভার। তৎপরে কলিকাতায় মাতুলালয়ে পড়িতে যাওয়ার পর গরমির ছুটিতে যখনি বাড়ীতে আসিতেন, তখন বয়স্যদলসঙ্গে গাছে গাছে উঠিয়া পাখীর ছানা সংগ্রহ করা এবং খেজুর পাতার ছাট প্রস্তুত করিয়া মাঠে মাঠে

ঘুরিয়া ফড়িং ধরিয়া তাহাদিগকে খাওয়ান এক প্রধান কাজ হইত। এইরূপ একবার আসিয়া একটা শালিকের বাচ্ছা আনিয়া পুষিয়া রাখিয়া গেলেন এবং একটা বিড়ালের বাচ্ছা আনিয়া তাহাকে দেখিবার ভার তারার উপর দিয়া গেলেন। পাখীর নাম রাখিলেন "টুনো"; বিড়ালের নাম রাখিলেন "রূপী।" পরের বারে আসিয়া দেখেন, মা একটি টিয়া পাখী পুষিয়াছেন, এবং তার নাম হইয়াছে "আত্মারাম"। সেবারে শীতের ছুটিতে আসিয়া মহেশ একটা দোআঁসলা কুকুর বাচ্চা আনিয়া তার নাম রাখিলেন "ধুনিয়া।" কলিকাতায় মাতুলালয়ের চাকর ধুনিয়ার নামে তার নামকরণ হইল!

সকলেই অনুভব করিতে পারেন জীবনের এই সংগ্রামের মধ্যে ধুনিয়া, রূপী, আত্মারাম, ও টুনো মহেশের কিরূপ সঙ্গী! শ্রান্ত ক্লান্ত হইয়া বিষণ্ণ মনে বাড়ীতে আসিয়া টুনোর খাঁচার নিকট দাঁড়াইবামাত্র সে বকিতে আরম্ভ করে। দাদা, দাদা, খুকী, খুকী, মা, মা, ইত্যাদি কত কি বলিতে থাকে। নিজেদের দাবাতে তার সঙ্গে কথা কহিয়া জননীর ঘরের দাবাতে আত্মারামের কাছে যান, আত্মারাম পুরুষ টিয়া, ডানা দুটিতে সুন্দর রক্তবর্ণ দুই দাগ, ঠোঁটটি লোহিত বর্ণ ও সুন্দর, সেও বেশ কথা কয়। তার কাছে দাঁড়াইয়া সেইকথা শোনেন। তারপর রূপীকে কোলে করিয়া রান্না ঘরে মার কাছে গিয়া বসেন। জননীও পশু পক্ষী ভালবাসেন, আত্মারামকে পোষাতেই তার প্রমাণ, কিন্তু তিনি ধুনিয়াকে দেখিতে পারেন না। হিন্দু গৃহস্থের গৃহে কুকুরের আদর নাই। মহেশ যখন তাকে জড়ান তখন মা বলেন—"ওকি কর, ও যে কুকুর!" মহেশ হাসিয়া বলেন—"হোক কুকুর, মুখখানা কি সুন্দর দেখ!" এই বলিয়া তার গলা জড়াইয়া, পিঠে থাবড়া দিয়া, লেজ গুটাইয়া, কাণ মলিয়া কত আদরই হয়! ধুনিয়াকে দুই পায়ে দাঁড় করাইয়া, যখন

বলেন—"ধুনিয়া, ধুনিয়া, সেলাম, সেলাম"; তখন ধুনিয়া এক পা কপালে : । সেলাম করে।

ধুনিয়া অধিকাংশ সময় মহেশের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গ্রামে ঘোরে। তার ইচ্ছা প্রতিবারই সঙ্গে যায়, কিন্তু অনেকসময় মহেশ পশ্চাৎ ফিরিয়া তাহাকে ঘরে ফিরিয়া যাইবার জন্য ইঙ্গিত করেন; ধুনিয়া ইঙ্গিত বুঝিতে পারে এবং ফিরিয়া যায়, কিন্তু মুখ দেখিলেই মনে হয় বড়ই দুঃখিত।

রূপীর সোহাগ অন্যপ্রকার। মহেশ বসিলেই আসিয়া কোলে উঠে এবং আরামে শয়ন করিবার চেষ্টা করে; যেন সে কোলটি তার তুলোর গদি! আহারান্তে শুইয়া মহেশ পড়িতেছেন, রূপী পাশে শুইয়া আছে; রাত্রে মহেশের বিছানাতেই তার শয়ন! রূপী বড় শিকারী, প্রায় ইঁদুর মারে, ফড়িং ধরে, কোনও দিন পাখীও মারিয়া আনে। মহেশ তাহার কাণ মলিয়া দিয়া বকিতে থাকেন—"হতভাগি! তুই বামুনের বাড়ীর বেড়াল, পাখী মারিস্ কেন?" শুনিয়া সকলে হাসিতে থাকে। রূপী সে উপদেশ গ্রাহ্য করে না, পাখী দেখিলেই ধরিতে যায়!

ইতিমধ্যে এক ঘটনা ঘটিয়াছে, তাহার বিবরণ এখানে দেওয়াই ভাল। মহেশের মাতুল কৈলাসচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয় ভাগিনার উপর রাগ করিয়া মাসিক দশ টাকা সাহায্য বন্ধ করিয়াছিলেন, কিন্তু যখন শুনিলেন যে, ভগিনী ঘোর সংগ্রামের মধ্যে বাস করিতেছেন, তখন তাঁহার হৃদয় আবার সাহায্য করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিল। তিনি গোপনে ঐ গ্রামের একজন পরিচিত ব্যক্তির দ্বারা ভগিনীর নিকট ত্রিশ টাকা প্রেরণ করিলেন। একদিন সন্ধ্যার সময় জগদ্ধাত্রী দেবী একান্তে নিজের নাম-সাধনে নিযুক্ত আছেন, মহেশ ব্রজনাথ দত্ত মহাশয়ের ভবনে গিয়াছেন, এমন সময় উক্ত ব্যক্তি আসিয়া জগদ্ধাত্রী দেবীর চরণে ত্রিশটি

টাকা রাখিয়া বলিলেন—"আপনার ভাই কৈলাসবাবু আমার হাতে এই ত্রিশটি টাকা পাঠাইয়াছেন এবং গোপনে আপনার হাতে দিতে বলেছেন।" জগদ্ধাত্রীদেবী গম্ভীর মূর্ত্তি ধারণ করিয়া টাকাগুলি তুলিয়া লইবার জন্য ইসারা করিলেন। সে ব্যক্তি লইলেন না; দাঁড়াইয়া ভাবিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে জগদ্ধাত্রীদেবী কথা কহিয়া বলিলেন—"আমাদের টাকায় প্রয়োজন নাই; আমাদের দিন চলে যাচ্চে; তুমি টাকা নিয়ে যাও, আমার ভাইকে দিয়ো, দিয়ে এই কথা বলো।

সমাগত ব্যক্তি। আমার ত কিছু অগোচর নাই; আপনাদের কিরূপে চলছে, তা জানি। আপনার ভাই বরাবর ত মাসে দশ টাকা করে দিতেন, কেবল মহেশের প্রতি রাগ করে কিছুদিন বন্ধ করেছিলেন, আবার মন নরম হয়েছে, তাই টাকাগুলি পাঠিয়েছেন।

জগদ্ধাত্রী। সে নরম মন নিয়ে থাকুক, আমাদের টাকার দরকার নেই।

সমাগত ব্যক্তি। ফিরিয়ে দিলে তিনি অপমানিত হবেন, তা ত বুঝতে পারেন!

জগদ্ধাত্রী। তা আর কি করব; জান ত বিদ্যোলঙ্কার মশাই যদিও ব্রাহ্মণপণ্ডিত ছিলেন, কারও কাছে কখনও মাথা হেঁট করেন নি; আমি কি তাঁর মাথা হেঁট করাতে পারি? তাঁর প্রসাদে আমাদের দিন চলে যাবে, এ টাকা আমি নেব না, তুমি গিয়ে কৈলাসকে ফিরিয়ে দিও।

সমাগত ব্যক্তি। আপনি যখন নিতান্তই নেবেন না, তখন আমাকে বাধ্য হয়ে ফিরিয়ে দিতে হবে। কিন্তু তিনি রাগ করবেন।

জগদ্ধাত্রী। (ঈষৎ হাসিয়া) ঐ যে কথায় বলে, রাগ কর ত ঘরের ভাত বেশী করে খাও, কৈলাসের ভাগ্যে তাই হবে, ঘরের ভাত বেশী করে খাবে!

এই বলিয়া সেখান হইতে উঠিয়া গেলেন। সমাগত ভদ্রলোক আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া টাকাগুলি লইয়া ফিরিয়া গেলেন।

সন্ধ্যার পর মহেশ বাড়ীতে ফিরিয়া আসিলে জগদ্ধাত্রীদেবী তাঁহাকে এ সংবাদ দিলেন না; কিন্তু তারা মহেশের কাণে কাণে এই সংবাদ দিল। মহেশ বলিলেন—"মা, মামা রাগ করে টাকা বন্ধ করেছিলেন সেজন্য বোধহয় অনুতাপ হয়েছে, তাই আবার টাকা পাঠিয়েছেন, তুমি নিলে না কেন? তিনি ত অপমান বোধ করবেন।

জগদ্ধাত্রী। করুক অপমান বোধ! আমাদের চলে যাচ্চে। আমি কি ঘরের কাজকে ডরাই? না খেয়ে মরা ভাল, তবু এরূপ সাহায্য নেওয়া ভাল নয়।

মহেশ। আমি আর কি বল্‌ব; তুমি ঐ গুণেই ত বিদ্যালঙ্কারের স্ত্রী হয়েছ।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

মেয়ে স্কুল খোলার পরে প্রায় এক বৎসর অতীত হইল। এই এক বৎসর কালের মধ্যে মহেশ বালিকা বিদ্যালয়টিকে স্থায়ী ভিত্তির উপরে দাঁড় করাইয়াছেন। স্কুলের জন্য যাহা যাহা প্রয়োজন তাহার কিছুরই অপ্রতুল নাই। আবশ্যক মত মাসিক ও বার্ষিক চাঁদার বন্দোবস্ত হইয়াছে; এবং একজন বন্ধুর উপরে তাহা সংগ্রহ করিবার ভার দিয়াছেন। মহেশ সাহায্যের জন্য ধরিয়া বসিলে কেহ যেন "না" বলেন না। বিশ একুশ বৎসরের ছেলেকে যে মানুষ বিশ্বাস করিয়া এত সাহায্য করিল—এই আশ্চর্য্য। ব্যাপার খানা এই; তাঁর ব্যবহারে, ভাষাতে, দৃষ্টিতে, এমন কিছু আছে, যাহা দেখিলে লোকের মন মুগ্ধ হয়, তাঁর প্রতি বিশ্বাস জন্মে ও তাঁকে সাহায্য করিতে প্রবৃত্তি জন্মে। এইরূপে অর্থ সংগ্রহ হইয়া কাজ বসিয়া গেল।

এই এক বৎসর কাল বালিকা-বিদ্যালয়ের কাজটা মহেশের একটা প্রধান কাজ ছিল বটে, কিন্তু বয়স্যদিগের সহিত মিলিত হইয়া, জনহিতকর অপরাপর কাজে মন দিতে ত্রুটি করেন নাই। তন্মধ্যে একটা কাজ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সে বৎসর অসময়ে অতিরিক্ত বৃষ্টি হইয়া গ্রামের পার্শ্ববর্ত্তী জমিগুলি প্লাবিত হইয়া গেল। চাষবাস বন্ধ হইবার উপক্রম; গ্রামের পার্শ্বে গবর্ণমেণ্টের বাঁধা এক রাস্তা, ধেনো জমির মধ্য দিয়া চলিয়া গিয়াছে, স্থানে স্থানে তাহা না কাটিলে জমিগুলির জল নিকাশ হয় না। এই সংবাদ পাইয়া মহেশ একদিন বয়স্যদিগের সঙ্গে জল ভাঙ্গিয়া গিয়া সেই রাস্তাটি দেখিয়া আসিলেন; আসিয়া গ্রামস্থ ভদ্রলোকদের বাড়ী বাড়ী ঘুরিতে লাগিলেন; কাহারও দ্বারা গবর্ণমেণ্টের রাস্তা কাটিবার

অধিকার প্রার্থনা করিবার দরখাস্ত করাইতে পারেন কি না—সেই চেষ্টায় রহিলেন। কিন্তু পদস্থ ব্যক্তিরা সকলেই ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন; বলিতে লাগিলেন—"কে গাল বাড়াইয়া চড় খাইবে? কাহারও অনুরোধে গবর্ণমেণ্ট যে রাস্তা কাটিবার অনুমতি দিবেন, এরূপ মনে হয় না।" অবশেষে মহেশ নিরুপায় হইয়া নিজের শিক্ষক ইংরাজী স্কুলের দ্বিতীয় মাষ্টারের দ্বারা এক দরখাস্ত লিখাইয়া গ্রামবাসী ভদ্রলোকদের দ্বারা স্বাক্ষর করাইতে লাগিলেন। প্রায় পঞ্চাশ ষাঠ জনের স্বাক্ষর করাইয়া দুইজন বয়স্য বালকের হাতে দিয়া নিজেদের বাসগ্রামের কয়েক মাইলের মধ্যবর্ত্তী গবর্ণমেণ্ট আদালতের কর্ম্মচারীর নিকট প্রেরণ করিলেন। যথা-সময়ে অধিকার পত্র আসিল। তখন মহেশ বয়স্যদিগের সহিত মিলিত হইয়া কয়েকজন বিজ্ঞ কৃষককে সঙ্গে লইয়া গবর্ণমেণ্টের রাস্তা কোথায় কোথায় কাটা যায়, দেখিবার জন্য গেলেন। দেখিয়া শুনিয়া, জায়গা স্থির করিয়া রাস্তা কাটিয়া দেওয়া হইল। সঞ্চিত জলরাশি দুই চারদিনের মধ্যে বাহির হইয়া নিকটস্থ খালে গেল। কৃষকগণ দুই হাত তুলিয়া মহেশকে ধন্যবাদ করিতে লাগিল। এই সংশ্রবে আর একটা কাজ আসিয়া পড়িল। হরিরামপুরে সংবাদ আসিল যে জলপ্লাবনের দুই তিন ক্রোশের মধ্যে, ছত্রপুকুর নামক এক জলামধ্যস্থ গ্রামে, প্রজাদের বড় অন্নকষ্ট উপস্থিত হইয়াছে; তাহারা অতি কষ্টে দিন কাটাইতেছে। শুনিয়া মহেশের প্রাণ ব্যাকুল হইয়া উঠিল। তিনি কতিপয় বয়স্য সঙ্গে একদিন শালতি করিয়া সেই গ্রামে গেলেন। গিয়া দেখেন যে গ্রামের অধিকাংশ অধিবাসী কৃষক; ধান রুইবার সময় ধান রোয়; ধান কাটিবার সময় ধান কাটে; শালতি করিয়া সেই ধান লইয়া হাটে বাজারে বেচিয়া আসে; তারপর কয়েক মাস সিমটা, বেগুণটা, উচ্ছেটা লইয়া হাটে বাজারে বেচে; আর অধিক কিছু অর্থাগমের উপায় জানে না। এবার

অতিরিক্ত বৃষ্টির জন্য তাহাদের ধানের ও অপরাপর ফসলের চাষ খারাপ হইয়াছে; তাহাদের দিন চলা ভার।

মহেশ সেই গ্রামের কতকগুলি কৃষককে একত্র ডাকিয়া বলিলেন—"আচ্ছা দেখ, তোমাদের চাষবাসের কাজ ত সব সময় থাকে না, অনেক সময় তোমরা বসে থাক; এক কর্ম্ম কেন কর না? আমরা তাঁতী ও তাঁত সঙ্গে করে এনে, তোমাদের মধ্যে তাঁতীকে বসিয়ে দিয়ে যাব; তোমরা তার কাছে কাপড় বুন্‌তে শেখ; তাহলে তোমাদের নিষ্কর্ম্মা সময়ের জন্য একটা কাজ থাকবে; বাজারে মূল্যে বেগুণের সঙ্গে কাপড়ও বেচতে পারবে। এ প্রস্তাবটা কেমন লাগে?

তারা শুনিয়া হাসিয়া বলিল—"সে কি বাবু, আমাদের বাপ দাদারা কে কবে তাঁতীর কাজ করেছে! তাঁতীর কাজ করা আমাদের পক্ষে লজ্জার কথা। তা আমরা পারব না।" মহেশ নিরাশ হইয়া ফিরিয়া আসিলেন। পথে বয়স্যগণকে বলিতে লাগিলেন,—"দেখেছ, জাতিভেদ প্রথাতে এ দেশকে কি করে রেখেছে? কৃষক অনাহারে মরে সেও ভাল, কিন্তু তাঁতে হাত দেবে না, তাতে জাত যাবে। অথচ শাস্ত্র খুলে দেখ, গরীব কৃষকের একাজ করতে কোথাও নিষেধ নাই।"

আশ্চর্য্য মহেশের কাজ করিবার শক্তি! এত কাজের মধ্যেও এই এক বৎসরের ভিতরে তিনি আপনার ইংরাজী ও সংস্কৃত বিদ্যার আশ্চর্য্য উন্নতি করিয়াছেন। ব্রজনাথ দত্ত মহাশয়ের সহিত প্রতিদিন সন্ধ্যার সময় সংস্কৃত বিদ্যাবিষয়ে নানা আলোচনা হয়; সুতরাং সংস্কৃতের চর্চ্চা আছেই। দুপুর বেলা তারাকে যে সময় পড়ান হইত, সেই সময়টা নিজের ইংরাজী শিক্ষাতে দিয়া অদ্ভুত উন্নতি লাভ হইয়াছে। বিদ্যালয়ের বালকেরা সচরাচর তিন চারি বৎসরে যাহা শেখে, তাহা এক বৎসরে শিখিয়া ফেলিয়াছেন। মহেশ ইংরাজী শিখিবার এক কৌশল বাহির

করিয়াছেন; একখানি খাতা বাঁধিয়া প্রতিদিন এক ঘণ্টা ইংরাজী হইতে বাংলা অনুবাদ করেন এবং ইংরাজী পুস্তকে যাহা পড়িলেন, তাহার ভাবটা স্মৃতি হইতে ও নিজের রচিত ইংরাজী ভাষাতে সেই খাতাতে লেখেন। তদ্ভিন্ন আঁকের এক খাতা করিয়াছেন, রোজ আট দশটা আঁক কসেন। এইরূপে এক সপ্তাহে যাহা লেখেন, তাহা রবিবার প্রাতে ও বৈকালে সেই মাষ্টার মহাশয়ের নিকট লইয়া গিয়া সংশোধন করিয়া লন। মাষ্টার বাবুটিকে তিনি বেতন দেন না; কিন্তু এটা ওটা করিয়া দেন, ফাই ফরমাস খাটেন। ফল কথা এই, মাষ্টার বাবুটি তাঁকেও বড় ভাল বাসেন। মুখে মুখে ইংরাজী গ্রামারের অনেক কথা শিখাইয়া দেন; সে সমুদয় তিনি খাতাতে টুকিয়া লন; পরে বাড়ীতে আসিয়া মন দিয়া পড়েন।

লোকে বলাবলি করে "দেখ দেখ, এত কাজকর্ম্মের মধ্যে মহেশ কিরূপ পড়াশোনায় মন দিচ্ছে!" কথাটা এই, নিয়মে কাজ করিলে অনেক কাজ করা যায়। মানুষ নিয়মে কাজ করে না বলিয়া, কাজের লোক হইতে পারে না। ব্রজনাথ দত্ত মহাশয় মহেশকেই যে কেবল মাসিক পাঁচ টাকা করিয়া বেতন দেন, তাহা নহে; মধ্যে মধ্যে এটা ওটা উপহার দিয়া থাকেন। তাহার মধ্যে একবার পুরস্কার স্বরূপ একটা টেঁক ঘড়ি দিয়াছেন; সেই ঘড়িটি পাওয়া অবধি মহেশের কাজকর্ম্ম নিয়মাধীন হইয়া পড়িয়াছে। তিনি ঘড়ি দেখিয়া উঠেন, ঘড়ি দেখিয়া খান, ঘড়ি দেখিয়া বাহিরে যান, ঘড়ি দেখিয়া কাজকর্ম্ম করেন।

যখন মহেশ পরোপকারব্রতে ও নিজের উন্নতিসাধনে এইরূপ ব্যস্ত, তখন মহেশের বালিকাপত্নী ক্ষীরদা পিতৃভবন হইতে শ্বশুরগৃহে আসিয়া উপস্থিত। জগদ্ধাত্রীদেবী লোকের উপর লোক পাঠাইয়া তাহাকে

আনাইলেন। বৌয়ের বয়স সতর আঠার বৎসর। আর কতদিন বাপের বাড়ী থাকিবে? তৎপরে তিনি নিজে জগৎ হইতে চলিয়া যাইবার পূর্ব্বে বিদ্যালঙ্কার মহাশয়ের বংশরক্ষা হইল, ক্ষীরদার কোলে অন্ততঃ একটি বংশধর রাখিয়া গেলেন, তাহাকে নিজের হাতে মানুষ করিয়া বড় করিয়া রাখিয়া গেলেন, ইহা দেখিতে চান। ক্ষীরদাকে ব্যগ্র হইয়া আনাইবার সেও একটা কারণ। তাই তাকে আনিবার জন্য লোকের উপর লোক পাঠাইয়াছিলেন। বৌটির একটু পরিচয় এখানেই দেওয়া ভাল। সেটি গোবিন্দপুর গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণ পরিবারের মেয়ে; তার পিতা ও তিন পিতৃব্য সকলেই পণ্ডিত; কেহ তর্কভূষণ, কেহ বিদ্যাভূষণ, কেহ ন্যায়রত্ন, কেহ তর্কালঙ্কার। তাঁরা গোবিন্দপুর গ্রামের ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদিগের অগ্রণী। ক্ষীরদার পিতা মধুসূদন ন্যায়রত্ন মহাশয়ের কলিকাতায় টোল চতুষ্পাঠী আছে। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের যথেষ্ট বৃত্তি আছে; তদুপরি পৈতৃক বিষয়সম্পত্তি আছে। তাহার ইতিবৃত্ত এই :—ক্ষীরদার পিতামহ একজন প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ছিলেন; তিনি একবার অপরাপর পণ্ডিতদের সহিত সে প্রদেশের জমিদার রাজা বরদাপ্রসন্নের সভাতে উপস্থিত ছিলেন। রাজা বড় সংস্কৃতানুরাগী মানুষ ছিলেন। একদিন তিনি সমস্ত পণ্ডিতদিগের মুখের দিকে চাহিয়া হাসিয়া বলিলেন—"দেখুন, আপনাদের মধ্যে যে কেহ অর্দ্ধদণ্ডের মধ্যে এমন একটি কবিতা করিয়া শুনাইতে পারিবেন, যাহাতে শব্দগুলিতে আকার ইকার প্রভৃতি স্বরবর্ণ কিম্বা ব্যঞ্জনবর্ণের যুক্তাক্ষর নাই, তাহলে কবিকে আমি সমুচিত পুরস্কার দিব।" অমনি পণ্ডিতেরা মনে মনে কবিতা রচনাতে বসিয়া গেলেন। ক্ষীরদার পিতামহ সর্ব্বাগ্রে উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং আকার ইকার প্রভৃতি স্বরবর্ণ ও যুক্তবর্ণবিহীন একটি কবিতা পাঠ করিয়া শুনাইলেন। সেটি বিষ্ণুর বন্দনা। সমুদয় কবিতাটি মনে নাই; শেষ পংক্তি এই :—

"জগদঘমপহর হতদশবদন।"

অর্থাৎ হে রাবণবিজয়ী রাম জগতের পাপ-হরণ কর।

কবিতাটি শুনিবামাত্র সভামধ্যে ধন্য ধন্য রব উঠিয়া গেল। রাজা বরদাপ্রসন্ন গম্ভীরভাবে বলিলেন—"আপনি আপনার বাসগ্রামের নিকটে দুইশত বিঘা ব্রহ্মোত্তর জমি পাইবেন।" সেই দুইশত বিঘা জমি এই পরিবারের সম্পত্তিরূপে অদ্যাপি আছে। তাহার আয় এবং ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের বৃত্তি লইয়া ইঁহাদের দিন সুখেই কাটে। বারমাসে তের পার্ব্বণ, দুর্গোৎসব, জগদ্ধাত্রী পূজা, প্রভৃতি সমারোহেই সম্পন্ন হয়। ক্ষীরদা সেই পরিবারের মেয়ে, আসিল ঘোর দারিদ্র্যের মধ্যে।

তাহার আসিবার পূর্ব্বে একটি ঘটনা হইয়া গিয়াছে, তাহা এখানেই বর্ণন করা ভাল। মা বৌকে আনিবার জন্য লোক পাঠাইয়াছেন শুনিয়া একদিন প্রাতে উঠিয়া মহেশ মাতৃসন্নিধানে উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন, মা সেই প্রাতে স্নান ও পূজা সমাধা করিয়া এক প্রান্তে এক চৌকীতে বসিয়া, তাঁহার জপের মালা লইয়া নাম জপ করিতেছেন; অল্পক্ষণ পরেই রন্ধনশালায় প্রবেশ করিবেন। তিনি গিয়া মায়ের পায়ে মাথা দিয়া পড়িলেন, এবং বলিলেন—"মা একটা কথা বলব, বল রাগ করবে না?"

জননী অবনত হইয়া বামহস্ত দিয়া তাঁহার মাথা নিজের কোলে তুলিলেন; এবং বলিলেন—"কথাটি কি বল, রাগ করবো কেন?"

মহেশ। মা, তুমি বৌকে আনতে লোক পাঠিয়েছ, বৌ আসুক, এসে তোমার সেবা করুক। আমি তাকে নিজে পড়িয়ে লেখাপড়া শেখাব; তোমাকে দয়া করে সম্মতি দিতে হবে; তাতে তোমার লাভ; তোমাকে প্রতিদিন রামায়ণ মহাভারত পড়ে শোনাবে।

জননী। সে আর নূতন কথা কি? তারাকে স্কুলে দেবার সময় ত সে কথা স্থির হয়েছে। আচ্ছা, বৌকে তুমি পড়িও।

মহেশ। আর একটা কথা আছে, আমি কিছুদিন তার কাছে শোব না; সে রাত্রে তোমার ও তারার কাছে থাকবে; আমি ও গিরিশ ওই ঘরে থাকব। আমি তাকে দিনের বেলা আমার ঘরে নিয়ে পড়াব; রাত্রে সে তোমাদের কাছে থাকবে।

এই কথা শুনিয়া জগদ্ধাত্রীদেবীর অন্তরে বড়ই আবেগ উপস্থিত হইল। তিনি বিদ্যালঙ্কার মহাশয়ের বংশরক্ষার জন্য ব্যগ্র হইয়াছিলেন, তাঁহার সে আশা ধূলিসাৎ হইল; মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন— "ছেলেটার সকলদিকেই বাড়াবাড়ি। কোনদিন কি করিয়া বসে তার স্থির নাই। ঠাকুরপূজোর ভার ত গিরিশের উপর দিয়েছে, ঠাকুরঘরের দিকে যায় না; তারপর শুনেছি কায়েতদের বাড়ীতে জলখাবার দিলে খায়; কর্ত্তা ত তা খেতেন না; বন্ধুতা যত ইতর জাতির মানুষের সঙ্গে; তারপর বংশরক্ষা হবে বলে বৌটা আন্‌ছি, সে পথেও ত কাঁটা দিতে চায়।" এই ভাবিতে ভাবিতে একবার ইচ্ছা হইল, তাহাকে বৌএর কাছে শুইবার জন্য বাধ্য করিবেন, কিন্তু পরক্ষণেই সে ভাব অন্তর্হিত হইল। তিনি তেজস্বিনী ও স্বাধীনচিন্তা নারী; কাহারও সঙ্গে মেশেন না; অন্যায় দেখিলে সহ্য করেন না; কাহারও দ্বারস্থ হন না; কাহারও নিকট হাত পাতেন না; এইজন্য পাড়ার মেয়েরা তাঁর ভয়ে ভয়ে থাকে। কিন্তু পতিবিয়োগের দিন হইতে তাঁহার প্রকৃতিতে পরিবর্ত্তন আসিয়াছে। মুখে কথা নাই, সংসারে বিরাগ, নিজের ধর্ম্মসাধনে একেবারে মগ্ন, সংসারের কাজ করিতেছেন, তাহাও যেন কর্ত্তব্যবোধেই করিতেছেন, মন অন্যত্র আছে, প্রধান মন ধর্ম্মসাধনে। পতিবিয়োগের পর তাঁহার ভ্রাতা, কৈলাসচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর সাহায্যে সমস্ত তীর্থ ঘুরিয়া আসিয়াছেন; আসিয়া জপ তপ শিবপূজা প্রভৃতি লইয়াই আছেন। মহেশের কথা শুনিয়া তাঁহার মনে হইল

মহেশ তাঁহার বড় ভক্ত, তিনি করিতে দিবেন না বলিয়াই ফুলচন্দন দিয়া তাঁর পা পূজা করেন না, কিন্তু প্রাণ মন দিয়া তাঁর সেবা করেন। "কি মা, কি রাঁধছ" বলিয়া দশবার রান্নাঘরে উঁকি মারেন। মা যে রান্নার শ্রমটুকু করেন, তাও যেন তাঁর সহ্য হয় না! এমন ছেলেকে কোন মায়ে কর্কশ কথা বলিতে পারেন? তাই জগদ্ধাত্রীদেবী ভাবিয়া চিন্তিয়া নিজের ভাব সম্বরণ করিয়া বলিলেন—"তোমার সকলদিকেই বাড়াবাড়ি, বৌ এতদিনের পর এল, তাকে ঘরে নেবে না সে কি রকম! শুনেছি বৌ বড় ভাল মেয়ে; তার আত্মীয়স্বজন কি মনে করবে?"

মহেশ। মা, তোমার বৌ যে ভাল মেয়ে তা আমি জানি; লোকের মুখে তার প্রশংসা ধরে না। তাকে যে কাছে নিতে চাচ্ছি না, সে কিছু দিনের জন্য; তারপর কাছে নেব বৈ কি। আর আমি অধিক ভেঙ্গে কি বলবো?

জগদ্ধাত্রীদেবী ধীর চিত্তে ভাবিতে লাগিলেন—ভাই যে মাসে দশ-টাকা দিতেন তা' বন্ধ করেছেন, আয় অল্প, দিন চলা ভার, সেইজন্যই বৌকে কিছুদিন দূরে রাখতে চাচ্চে। আচ্ছা, তাই করুক। এই স্থির করিয়া ধীরভাবে বলিলেন—"আচ্ছা, তুমি ত বাড়ীর কর্ত্তা, তুমি যা ভাল বোঝ তাই কর।"

মহেশের মাথার বোঝা যেন নামিয়া গেল। ইহার কিছুদিন পরে ক্ষীরদা আসিলেন। বৌ সন্ধ্যার সময় আসিয়া পৌছিল; বৌ সন্ধ্যার পর পাকশালায় শ্বশ্রূর কাছেই যাপন করিল; আহারান্তে জগদ্ধাত্রীদেবী বৌকে নিজের ও তারার কাছে শয়ন করিতে আদেশ করিলেন। সে দিন মহেশের সঙ্গে আর তাঁহার সাক্ষাৎ হইল না।

পরদিন আহারাদির পর দুপুর বেলায় জননী বিশ্রামশয্যায় শয়ন

করিয়া নিদ্রিত হইলে, মহেশ আসিয়া ক্ষীরদার গা টিপিয়া ইঙ্গিত দ্বারা নিজের ঘরে ডাকিয়া লইয়া গেলেন। মা ঘুমাইতেছেন, গিরিশ ও তারা স্কুলে, বাড়ীতে কেহ নাই, দুইজনে অবাধে কথা কহিবার সুবিধা পাইলেন। বৌটী ঘোমটা দিয়া মহেশের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গিয়া লজ্জাতে জড়সড় হইয়া দরজার পার্শ্বে দাঁড়াইল। মহেশ নিকটে আসিয়া ঘোমটা খুলিয়া দিয়া হাতখানি ধরিয়া বলিলেন—"ওকি, আমার কাছে আবার ঘোমটা কি ? এস এই তক্তপোষে বস, আমি সম্মুখে ওই চেয়ারে বসছি, কিছু কথা আছে।

ক্ষীরদার বয়স যদিও সতর আঠার বৎসর, দেখিলে বেশী বয়স মনে হয়। দেহটি সুস্থ ও সবল, উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ, চক্ষু দুটী বড় বড়, মুখে একপ্রকার প্রসন্নতা, সরলতা ও কৌতুকপ্রিয়তার আভা আছে, যাহা দেখিলে মনে আনন্দ হয়। সেই দুটী বড় বড় চোখ, ও সেই প্রসন্নতার আভা দেখিয়া মহেশের মন আনন্দিত হইয়া উঠিল ; মহেশ বলিলেন— "বাঃ, তোমার মুখখানি কি সুন্দর ! এই কথা বলিয়াই ক্ষীরদার মুখের দিকে চাহিয়া দেখেন সে মৃদুমন্দ হাসিতেছে।"

মহেশ। হাসচ যে ?

ক্ষীরদা। তুমি কি আমার মুখ আজ নূতন দেখলে ? বিয়ের সময় দেখেছ, তিনবার আমার বাপের বাড়ী গিয়েছ ; এখানে দুবার এসেছিলাম তখন তুমি বাড়ী ছিলে না বটে, কিন্তু আমার বাপের বাড়ীতে ত কতবার দেখেছ ; আজ কি নূতন দেখলে যে আশ্চর্য্য বোধ্ করছ ?

মহেশ। তোমার বাপের বাড়ীতে কি তোমায় ভালকরে দেখতে পেয়েছি ? লোকারণ্য বাড়ী, দিনে ত দেখতে পেতাম না, তারপর রাত্রেও তুমি প্রদীপ জ্বালিয়ে রাখতে দিতে না, পাছে জানালার ফাঁক

দিয়ে কেউ উঁকি মারে। এইবারে সাধ মিটিয়ে তোমার মুখ দেখব। যাক ওকথা, যেজন্যে তোমায় ডেকেছি তা বলি শোন।

প্রথম কথা, আমার মাকে আমি দেবতা মনে করি; এমন ধার্ম্মিক স্ত্রীলোক তুমি জীবনে দেখেছ কি না জানি না; কাছে থাকলেই দেখতে পাবে। আমার মাকে পূজা করলে দেবপূজা করা হয়। বাবার মৃত্যুর পর উনি সংসার হতে মন বার করে নিয়েছেন; কেবল ধর্ম্মসাধন নিয়ে আছেন; এস দুজনে প্রাণমন দিয়ে মায়ের সেবা করি। মা পরের রান্না খেতে ভাল বাসেন না; কাজেই সকালে নিজে রাঁধবেন, তাত আর বারণ করবার যো নেই। তাও তুমি সব গুছিয়ে দেবে। তবে বিকেলে তিনি খান না, সুতরাং বিকেলের রান্নাটা তুমি করবে। পারবে ত? রাঁধতে জান ত?

ক্ষীরদা। বড়পিসী আমাকে হাতে ধরে রাঁধতে শিখিয়েছেন, আমি বেশ রাঁধতে জানি।

মহেশ। তবে বেশ হয়েছে। মা একবেলা রাঁধা হতে বাঁচলেন, ঢের হলো। আর এক কথা, গিরিশ ও তারা এদের প্রতিও দৃষ্টি রাখবে; এদের খাওয়া দাওয়া দেখবে; এদের যা কিছু আবশ্যক হয় দেবে; যদি রাগ করে কথা কয় সহ্য করে থাকবে; মোট কথা, প্রেমে এদিগকে বশীভূত করবে।

ক্ষীরদা। তবে আমি এলাম কি করতে, এদের সেবা করাই ত আমার কাজ।

মহেশ। বেঁচে থাক, এখন আসল কথা বলি। আমাদের আয় অল্প, মামা সাহায্য বন্ধ করেছেন, সংসার অতি কষ্টে চলে, তাই মনে করেছি গত রাত্রে যেমন মায়ের কাছে ছিলে এইরূপ কিছুদিন চলুক; দিনের বেলা প্রতিদিন তুমি এই ঘরে এসে আমার কাছে পড়বে;

ভাল যা কিছু, তোমাকে এনে দেব; যাতে তোমার জ্ঞানের উন্নতি হয় বিধিমতে তার চেষ্টা করবো। তুমি আমাকে তোমার সহায় ও বন্ধুরূপে পাবে ; কিন্তু পতিরূপে পাবে না। বুঝতে পারলে ত ? •

ক্ষীরদা। (ঈষৎ হাসিয়া) আমি তোমার মনের ভাব বুঝতে পেরেছি ; এতে আমার সম্পূর্ণ মত আছে।

মহেশ। (আনন্দে নিজ চেয়ার হইতে উঠিয়া বামহস্তে ক্ষীরদার গলা জড়াইয়া, দাড়িতে দক্ষিণ হস্ত দিয়া, মুখখানি তুলিয়া, বড় বড় চোখ দুটীর দিকে চাহিয়া) তুমি কি ভাল মেয়ে! আমাদের কি সৌভাগ্য যে এমন ভাল মেয়ে আমাদের ঘরে এল।

ক্ষীরদা। মানুষ নিজে ভাল হলেই অপরকে ভাল দেখে। তুমি নিজে ভাল লোক কিনা, তাই আমাকে ভাল দেখছ। (একটু হাসিয়া) ওঃ, এতদিনের পর বুঝতে পারলাম, কেন তুমি শেষবারে আমাদের বাড়ীতে গিয়ে আমার কাছে শোও নি। আমি শুলাম, তুমি বই নিয়ে পড়তে বসলে, আমাকে বললে 'তুমি ঘুমাও, আমি অল্প পরে শোব'। আমি ঘুমিয়ে পড়লাম, ভোরে জেগে দেখি, তুমি আর একটা তক্তপোষে একা ঘুমাচ্চ।

মহেশ। (হাসিয়া) তুমি এটা লক্ষ্য করেছিলে ? এখন মনের কথা সব জানলে।

অতঃপর মহেশ ক্ষীরদাকে লেখাপড়া শিখাইবার যে আয়োজন করিয়া রাখিয়াছিলেন, তাহা লইয়া ক্ষীরদার বর্ণপরিচয় করাইতে বসিয়া গেলেন।

•সেদিন বৈকালে বাহির হইবার সময় মহেশ জননীর নিকট গিয়া বলিলেন—"মা, আজ হতে তোমার বৌ বিকালে রাঁধবে, তুমি বিকালে রাঁধতে পারবে না।"

জননী। একি! ভদ্রলোকের মেয়ে ঘরে পা দিতে না দিতে গলায় ফাঁস দেবে?

মহেশ। গলায় ফাঁস আবার কি? এত বৌয়েরই কাজ। ইহার কয়েকদিন পরে মহেশ আর এককাজ আরম্ভ করিলেন। ব্রজনাথ দত্তের বাড়ী হইতে আসিয়া ভাইবোনদের সঙ্গে আহার করেন, পরে সকলের আহার হইয়া গেলে মা যখন দাবার একধারে চৌকিতে বসিয়া নাম জপ করিতে থাকেন, তখন অপরদাবাতে মহেশ মাদুরে বসিয়া তারা ও ক্ষীরদাকে গল্প শুনাইতে থাকেন। খুব হাসাহাসি পড়িয়া যায়। গিরিশকে ডাকিলে সে আসে না; সে মনে মনে বলে—দাদার সব বিষয়েই বাড়াবাড়ি; বৌটাকে বেহায়া করে তুলবেন, তারই যোগাড় দেখছি; বৌ ঘোমটা দেয় না, যেন এটা তার বাপের বাড়ী! দাদা সকলের সুমুখে ক্ষীরদা, ক্ষীরদা, করে ডাকেন; গল্প শুনে বৌ হাসছে দেখ না! ওখানে গিয়ে কি হবে? দেখলে রাগ হবে বৈ ত নয়।

তারাকে মেয়ে স্কুলে দেওয়ার পর দুপুর বেলাটা মহেশের পাঠে যাইত। ব্রজনাথ দত্ত মহাশয়ের নিকট হইতে নানা বই আনিয়া তাহা পাঠ করিতেন; অঙ্ক কষিতেন; আটলাস প্রভৃতি দেখিতেন; এইরূপে চারি পাঁচ ঘণ্টা পাঠে মগ্ন থাকিতেন। ক্ষীরদা আসার পর ক্ষীরদার শিক্ষার জন্য ২।৩ ঘণ্টা যাইতে লাগিল; কিন্তু মনে এই সন্তোষ রহিল যে, জীবনের একটি প্রধান কর্ত্তব্য করা হইতেছে। ক্ষীরদাও মনের উৎসাহে কোমর বাঁধিয়া বিদ্যাশিক্ষায় লাগিয়া গেলেন। স্কুলে বালক বালিকারা দুই মাসে যাহা শিক্ষা করে, ক্ষীরদা তাহা এক সপ্তাহে শিখিতে লাগিলেন। পতির প্রতি তাঁহার প্রীতি ও শ্রদ্ধা দিন দিন বাড়িতে লাগিল।

ওদিকে মহেশের আর একটি কাজ আসিয়াছে। বয়স্ক যুবকেরা

কেবল আমোদ আহ্লাদ করিয়া বেড়ায়, আত্মোন্নতির কোনও প্রয়াস নাই, ইহা ভাল লাগিতেছে না। কেমন করিয়া তাহাদের মনে জ্ঞানস্পৃহা উদ্দীপ্ত হয়, কিরূপে তাহারা জ্ঞানোন্নতির সুবিধা পায়, কিরূপে জ্ঞানালোচনাতে তাহাদের মতি জন্মে, এই চিন্তা কিছুদিন হইতে তাহার মনে জাগিতেছে। স্বীয় পত্নীকে মাতৃক্রোড়ে প্রতিষ্ঠিত করিয়া ও তাহার শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়াই, এই মহা কার্য্যে লাগিবার অবসর আসিল। প্রায় প্রত্যহ বৈকালে বয়স্যেরা মিলিত হইলে এই প্রসঙ্গ উপস্থিত হইতে লাগিল। অবশেষে স্থির হইল, যে আত্মোন্নতি সভা নামে একটি সভা স্থাপিত হইবে; সেই সভার অধীনে একটি পুস্তকালয় থাকিবে; সেখানে প্রতিদিন সন্ধ্যার সময় যুবকেরা সম্মিলিত হইবে; দুই ঘণ্টা পাঠ ও আলোচনা চলিবে; তাহারা ইচ্ছা করিলে পুস্তকালয় হইতে পুস্তকাদি ঘরে লইতে পারিবে; এতদ্ব্যতীত কোনও শিক্ষিত ভদ্রলোক গ্রামে আসিলে লাইব্রেরীতে তাঁকে নিমন্ত্রণ করিয়া তাঁর কথা শোনা হইবে। কেবল তাহাই নহে, এই আত্মোন্নতি সভার হস্তে একটি দাতব্য ফণ্ড থাকিবে (কারণ পরোপকারও আত্মোন্নতির মধ্যে); সেই ফণ্ড হইতে নিরাশ্রয় বিধবাদিগকে সাহায্য করা হইবে।

এই পরামর্শ স্থির হইলেই চিন্তা আসিল, আত্মোন্নতি সভার জন্য ঘর পাওয়া যায় কোথায়, এবং তাহার ব্যয় কিরূপে উঠে। মহেশের সকল বিষয়ে পরামর্শদাতা ও উৎসাহদাতা ব্রজনাথ দত্ত। মহেশ এই প্রস্তাব তাঁহার নিকট উপস্থিত করিবামাত্র, তিনি বলিলেন—"বাঃ বাঃ, বেশ কথা, গ্রামের ছেলে কেবল আমোদ করে বেড়ায়; এরূপ একটা উপায় হলে তাদের অনেকে মানুষ হয়ে যেতে পারে। যত শীঘ্র পার, আত্মোন্নতি সভাটা স্থাপন কর।"

মহেশ। তা ত বুঝলাম, কিন্তু কোথায় স্থাপন করি তাই ভাবছি।

ব্রজনাথ দত্ত। বাঃ মেয়ে স্কুলের ঘর দুটো কি জন্য আছে? তোমরা ত রাত্রে পড়তে আসবে, রাত্রে ত স্কুল থাকে না, ঐ দুই ঘরে বসেই পড়াশোনা করবে; রাত্রের আলোর খরচ আমি দেব; এক একদিন আমি নিজে গিয়ে বসব, তোমাদের কথাবার্ত্তাতে যোগ দেব। কিছু টাকা তুলে বই আর আলমারির যোগাড় কর; প্রথমে আমি কতকগুলি বই দেব; লাইব্রেরী ও বই রাখিবার জন্য ঐ দুই ঘরের পাশের ঘরটা দিচ্ছি।

মহেশ। বাঃ, তাই ত, মেয়ে স্কুলের ঘরদুটোর কথা আমার মনে যোগায় নাই! তা হলে ত আমরা কাল হতেই বসতে পারি। কিন্তু আমি যে সন্ধ্যার সময় এসে আপনাকে প্রাচীন পুরাণ প্রভৃতি পড়ে শোনাই তার কি হবে?

ব্রজনাথ দত্ত। তাই বা কঠিন কি? তুমি সন্ধ্যার পরে এসে থাক, তা না এসে, সন্ধ্যার এক ঘণ্টা পূর্ব্বে আসবে; এক ঘণ্টা পড়ে শুনিয়ে ওখানে গিয়ে বসবে।

মহেশ। হাঁ, তা হতে পারে। আপনার সদাশয়তার আর পার নাই! আমার সৌভাগ্যক্রমে আপনাকে আমার অভিভাবকরূপে পেয়েছি!

ব্রজনাথ দত্ত। যাও যাও, ওসব কথা বল না; তুমি যে ভাল ছেলে, তোমাকে আরও সাহায্য করা উচিত, পারি না বলে লজ্জা হয়।

অতঃপর তৎপরবর্ত্তী রবিবার বৈকালে গ্রামস্থ ভদ্রলোকদিগকে ডাকিয়া, ব্রজনাথ দত্ত মহাশয়ের চণ্ডীমণ্ডপে সমবেত করিয়া, সকলের

শুভাশীর্ব্বাদ গ্রহণ পূর্ব্বক "আত্মোন্নতি সভা" স্থাপিত হইল; এবং সেই দিন হইতেই সন্ধ্যার পরে মেয়ে-স্কুলগৃহে যুবকদলের সমাগম হইতে লাগিল। মহেশ প্রথম সম্পাদক, তিনি প্রায় প্রতিদিন প্রাতে দ্বারে-দ্বারে ঘুরিয়া গ্রামবাসীগণের মধ্যে যিনি যাহা সাহায্য করিতে পারেন, সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। গ্রামের নিরাশ্রয় বিধবাগণের সাহায্য করা হইবে, সে এক বড় কথা, মহেশ কাহাকেও ধরিতে বাকি রাখিলেন না। সে ভিক্ষারও এক নূতন প্রণালী বাহির হইল! সকলকেই যে পয়সা দিতে হইবে তাহা কেন? যিনি যাহা দিতে পারেন তাহাই লওয়া হইবে। একজন গৃহস্থ বলিলেন, "বাপু! তোমাদের কাজটা ভাল; নিরাশ্রয় বিধবাদিগকে দেখিবে, এর চেয়ে ভাল কাজ কি আছে? কিন্তু আমি গরীব আমার হাতে পয়সা নাই"। মহেশ বলিলেন "আচ্ছা আপনার কয়েক ঝাড় বাঁশ ত আছে, কয়েকটা বাঁশ দিন না কেন, আমরা বেচে নেব।"

গৃহস্থ—। (হাসিয়া) আচ্ছা অমুক ঝাড় হতে পাঁচটা বাঁশ নিয়ে যাও।

পরদিন প্রাতে মহেশ কয়েকজন বয়স্য সঙ্গে বাঁশ কাটিয়া আনিলেন; এবং পাড়ার এক গৃহস্থের ঘরের চাল নির্ম্মাণ হইতেছিল, তাহাকে বিক্রয় করিয়া আসিলেন। কোনও গৃহস্থ বলিলেন,—"আমার পয়সা নাই কি দিব তাই ভাবচি।"

মহেশ। আচ্ছা আপনার গোলাতে ত চাল আছে তাই দিন আমরা বিক্রয় করে নেব।

গৃহস্থ দশ সের চাল দিলেন; মহেশ বয়স্যদের হাত দিয়া তাহা অপর কোনও গৃহস্থের নিকট বিক্রয় করাইলেন। এই চাঁদা সংগ্রহ বিষয়ে একটি স্মরণীয় ঘটনা আছে। মহেশ পাড়ার একটি নিম্নজাতীয়া

স্ত্রীলোকের বাড়ীতে গিয়া উপস্থিত। সেই নারী বাড়ীতে বসিয়া পাটের দড়ি বুনিয়া দড়ির তাল প্রস্তুত করে; তদ্ভিন্ন উঠানে ভারা বাঁধিয়া শসার গাছ দিয়াছে; এবং বাড়ীর সংলগ্ন জমিতে ফুটি কাঁকুড়ের ক্ষেত করিয়াছে; সেই দড়ির তাল ও ফুটি কাঁকুড় প্রভৃতি মাথায় করিয়া বাজারে লইয়া বেচিয়া আসে। মহেশ কাহাকেও ছাড়িবার লোক নহেন। একদিন সেই নারীর বাড়ীতে গিয়া উপস্থিত। নারী সকল কথা শুনিয়া বলিল "বাবা তোমরা বড় ভাল ছেলে, যে সব গরীব বিধবা মেয়েদের দেখবার কেউ নাই, তাদের জন্যই যে তোমরা ভাবছ এটা বড় ভাল কথা।

মহেশ। ভাল কথা ত বটে, কিন্তু লোকে আমাদের সাহায্য না করলে আমরা কি করে এ কাজ করতে পারি ?

নারী। তা বৈ কি ? তোমাদের সাহায্য করা দরকার।

মহেশ। তবে তুমি কিছু সাহায্য কর।

নারী। বাবা, আমার অবস্থাত দেখছ, মাথায় বোঝা করে বাজারে গিয়ে কোনও রূপে দুমুটো খাবার যোগাড় করি। আমি বাবা কি সাহায্য করব।

মহেশ। কেন তুমি এই দড়ির তাল করেছ, আমাকে দুটো তাল দেও, আর ঐ শসার মাচা হইতে পাঁচটা শসা দেও।

নারী। (হাসিয়া) ওঃ সেই জন্য তুমি আমায় কাছে এসেছ! তোমার হাত ছাড়ান ভার; আচ্ছা নেও দুটো দড়ির তাল ও পাঁচটা শসা নেও।

মহেশ দড়ির তাল ও শসা লইয়া বাড়ীতে আসিলেন; পথে ভাবিতে ভাবিতে আসিলেন কার হাতে এগুলি বাজারে পাঠাই। কিন্তু বাড়ীতে আসিয়া দেখেন পাড়ার একজন ভদ্রলোকের মেয়ে জগদ্ধাত্রীদেবীর

হিত দেখা করিতে আসিয়া উঠানে দাঁড়াইয়া কথা কহিতেছেন। হেশ আসিয়া জননীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "মা আমাদের বিধবা-শ্রমের জন্ম এক চাষার মেয়ের কাছ থেকে এই দড়ির তাল ও শসা নেছি, কারু হাতে বাজারে পাঠাব ভাবচি।"

জগদ্ধাত্রী দেবী। দুতাল দড়ি ও পাঁচটা শসা আবার বাজারে পাঠাবে কি? আমাদের ঘরেই রাখ না, আমাদের কাজে লাগতে পারে। আগত মহিলাটি মহেশকে বড় ভাল বাসেন, তাঁর জনহিতকর কাজের খুব উৎসাহদায়িনী। তিনি জগদ্ধাত্রী দেবীকে বলিলেন, দুটো শসা তুমি রাখ তিনটা আমি নিয়ে যাই। আর ঐ দুতাল দড়ি আমাকেই দাও; আমাদের গোলা মেরামত হচ্চে, দড়ি আমাদের কাজে লাগবে।" এই বলিয়া সহাস্য বদনে মহেশের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "তিনটে শসা ও দুতাল দড়ির দাম কত দিতে হবে বলত।"

মহেশ। (হাসিয়া) পাঁচটা জিনিসের দাম পাঁচ টাকা।

মহিলা। (হাসিয়া) ভাল কাজের জন্য টাকা তুলতে গেলে ঐ রকম করেই তুলতে হয়। আচ্ছা আমি পাঁচটা জিনিসের দাম চারি আনা দিব।

মহেশ। না না, শসা তিনটার জন্ম তিন পয়সা ও দড়ির তাল দুটার জন্ম চারি পয়সা দিবেন।

না না আমার কাছে চারি আনা পয়সাই পাবে বলিয়া ভদ্রমহিলাটি চলিয়া গেলেন। মহেশ শসা দুইটার জন্ম নিজে দুই আনা দিলেন।

এইরূপে গ্রামে অর্থসংগ্রহ হইতে লাগিল; অপরদিকে কলিকাতায় বন্ধুদের নিকট পত্রের উপর পত্র চলিল; সাপ্তাহিক, পাক্ষিক, মাসিক পত্রিকাদি সংগ্রহ হইতে লাগিল। কিছুদিন পরে মহেশ একবার কলিকাতায় গিয়া একটি বড় আলমারি ও কতকগুলি পুস্তক সংগ্রহ করিয়া আনি-

লেন। আত্মোন্নতি সভা বিধিমতে বসিয়া গেল। ইহার দানের কার্য্যটা গ্রামবাসীদের দৃষ্টিকে আকর্ষণ করিতে লাগিল। ভদ্রবংশের বিধবা, অনাথা নারীদিগকে যুবকসভ্যেরা বাড়ীতে গিয়া যথাসাধ্য অর্থসাহায্য করিয়া আসিতে লাগিল; কিন্তু নিম্নশ্রেণীর নারীগণ বৈকালে মহেশের বাড়ীতে সমবেত হইতে লাগিল। তাহাদিগকে চাউল ও পয়সা বিতরণ করা জগদ্ধাত্রী দেবীর একটি নিত্যকর্ম্মের মধ্যে দাঁড়াইল; তিনি তাহাতে বড় আনন্দ অনুভব করিতে লাগিলেন। বলিতে লাগিলেন "বেঁচে থাক ছেলেরা, এই কাজটা যে করেছে বড় ভাল হয়েছে।" মাকে সুখী দেখে মহেশের মনে আর আনন্দ ধরে না! সকল শ্রম যেন সার্থক বোধ হইল।

আর একটি ঘটনার কথা এইখানেই বলা ভাল। হরিরামপুর গ্রামের পূর্ব্বপাড়ায় মহেশের পিসা শ্রীধরতর্করত্নের বাস। তাঁহার চারিপুত্র ও তিন কন্যা। তন্মধ্যে প্রথম কন্যাটি বিধবা, তার নাম নিস্তারিণী; নিস্তারিণী মহেশের অপেক্ষা এক বৎসরের বড়। তিনি মহেশকে বড় ভালবাসেন ও তাঁর স্বভাবচরিত্রের জন্য বড় শ্রদ্ধা করেন। দুই জনে এমনি মনে মনে মিল, যে মহেশ আপনার মনের যত প্রকার আজগুবি মতলব সব তাঁর কাণে ঢালিতে ভালবাসেন; এবং সেজন্য দুই একদিন অন্তর তাঁহাদের ভবনে গিয়া থাকেন। নিস্তারিণীর শ্বশুরালয়ে শ্বশুর শাশুড়ী প্রভৃতি গত হওয়াতে তিনি আর খুড়শ্বশুরদের আশ্রয়ে না থাকিয়া পিত্রালয়েই অধিকাংশ সময় যাপন করেন; মধ্যে মধ্যে সেখানে যান। পিত্রালয়েও তাঁর কাজ নাই। দুই জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার বধূ ও দুই ভগ্নী জননীর কার্য্যের সহায় থাকাতে, তাঁকে ঘরের কাজে থাকিতে হয় না। তিনি মহেশের প্ররোচনায় পাড়ার মধ্যে রোগীর সেবা, বিপন্নের বিপদুদ্ধার, দীনহীনদিগের সাহায্য প্রভৃতি কার্য্যে আপনাকে দিয়া থাকেন।

পূর্ব্বোক্ত ঘটনার কিছুদিন পরেই এইরূপ একটা কাজের অবসর উপস্থিত হইল। হরকান্ত তর্কভূষণ নামে সেই পাড়ার একটি সাধু মহাশয় পণ্ডিত গুরুতর পীড়ায় আক্রান্ত হইলেন। তাঁহার পত্নী ও একমাত্র বিধবা কন্যা, তাঁর সেবিকা। একটী চাষার ছেলেকে মাসে কিছু দেওয়া হয়, সে আসিয়া গোয়াল পরিষ্কার করে ও গরুটা চরায়। ঘরে গোবর দেওয়া, বাসনমাজা, ঘর দোর পরিষ্কার রাখা প্রভৃতি সমুদয় কাজ মাতা ও কন্যাকে করিতে হয়। তর্কভূষণ মহাশয় চাকর ছেলেটিকে সঙ্গে করিয়া হাটবাজার করিয়া থাকেন। তিনি পীড়িত হইয়া পড়াতে তাঁহার পত্নী ও কন্যা মহাসংগ্রামের মধ্যে পড়িয়াছেন। সংসারের কাজচালান ও তাঁর সেবা করা কঠিন হইয়া পড়িয়াছে। একজন রোগীর কাছে থাকেন, অপরে সংসারের কাজ চালান। তৎপরে রাত্রে রোগীর পার্শ্বে বসিয়া জাগিতে হয়, ইহা যেন আর পারিয়া উঠেন না। একদিন মহেশ নিস্তারিণীর সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়া এই সংবাদ পাইলেন; পাইবামাত্র তর্কভূষণ মহাশয়ের বাড়ীতে গেলেন। তাঁহাদের সঙ্গে তাঁহার পূর্ব্বেই আলাপ ছিল। তিনি গিয়া তর্কভূষণ মহাশয়ের পদধূলি লইয়া তাঁহার পার্শ্বে বসিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া সাধুপণ্ডিতের মন প্রফুল্ল হইল;—"কি বাবা, তুমি এসেছ, দেখ আমি কি পীড়াতে পড়েছি" বলিয়া তাঁর মাথায় হাত দিলেন। মহেশ নিজের প্রীতি ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিয়া তাঁহাকে আনন্দিত করিয়া তুলিলেন। তৎপরে রন্ধনশালার দিকে গিয়া তাঁর পত্নী ও কন্যার সহিত কথা কহিয়া স্থির করিলেন যে নিস্তারিণী প্রতিদিন প্রাতে ও অপরাহ্ণে আসিয়া রন্ধন করিবেন; সে সময়ে তাঁহারা রোগীর সেবাতে থাকিবেন; তৎপরে তিনি নিজে আর দুইটি ছেলেকে সঙ্গে করিয়া সন্ধ্যার পর আসিয়া রোগীর সেবাতে নিযুক্ত হইবেন; তাঁহাদিগকে

আর রাত্রি জাগরণ করিতে হইবে না। সেই প্রণালীতেই কার্য্য আরম্ভ হইল। নিস্তারিণীকে গিয়া বলিবামাত্র তিনি আনন্দের সহিত পাচিকার কার্য করিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন এবং সেইদিন হইতেই ঐ কাজ আরম্ভ করিলেন। এদিকে মহেশ তাঁর যুবকবন্ধুদের মধ্যে দুইজনকে স্থির করিলেন, একজন কবিরাজের নিকট যাওয়া, ঔষধ আনা প্রভৃতি কাজ করিবেন; অন্যজন সন্ধ্যার সময় গিয়া রোগীর পরিচর্য্যাতে বসিবেন; মহেশ নিজে সন্ধ্যার পর ব্রজসুন্দর দত্ত মহাশয়ের বাড়ী হইতে আসিয়া আহারান্তে সেখানে যাইবেন; প্রথমরাত্রে তিনি ঘুমাইবেন, এবং শেষরাত্রে রোগীর সেবাতে বসিবেন। এই নিয়মানুসারে কার্য্য আরম্ভ হইল; কিন্তু তর্কভূষণ মহাশয় আর রোগশয্যা হইতে উঠিলেন না; কয়েকদিন পরেই তাঁহার মৃত্যু হইল। মহেশ বন্ধুদিগকে ডাকিয়া মৃতদেহ স্কন্ধে করিয়া শ্মশানে লইয়া দাহ করিয়া আসিলেন। তৎপরে শোকার্ত্ত পরিবারের সান্ত্বনা ও পরলোকগত সাধুর শ্রাদ্ধাদির আয়োজন করিবার ভার মহেশের উপর পড়িয়া গেল। তিনি শ্রাদ্ধের ব্যয়-নির্ব্বাহের জন্য দ্বারে দ্বারে ফিরিতে লাগিলেন। তিনি কি ভাবে রোগীর সেবা করিয়াছিলেন, তাহা শুনিতে কাহারও বাকি ছিল না। তিনি যে দ্বারে যান সর্ব্বত্রই লোকের স্নেহাশীর্ব্বাদ ও প্রশংসা পান; এবং যাহার যাহা দিবার আছে, সকলেই তাহা মুক্ত হস্তে প্রদান করে। যথাসময়ে তর্কভূষণ মহাশয়ের শ্রাদ্ধ হইয়া গেল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

ক্ষীরদাকে গৃহধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত করিয়া মহেশের কাঁধের বোঝা যেন কিছু কমিয়া গিয়াছে। ক্ষীরদা দিন দিন পড়িতে লিখিতে অঙ্ক কষিতে শিখিতেছেন। একদিন ক্ষীরদার বিষয়ে জননীর সঙ্গে মহেশের কথা হইল।

মহেশ। মা, গিরিশ আমাকে বলছিল যে ক্ষীরদা যে ঘোমটা দেয় না, এবং আমি যে ক্ষীরদা ক্ষীরদা করে ডাকি, তাই নিয়ে নাকি লোকে হাসাহাসি করে এবং তোমার মনে কষ্ট হয়। আমার মনের কথাটা কি জান, শ্বশুর বাড়ীতে এসে মেয়েরা যেমন ভয়ে ভয়ে সংকোচে সংকোচে থাকে, ও যেন সে রকম না থাকে; নির্ভয়ে, প্রসন্নচিত্তে অসংকোচে বাস করুক, তোমার কোলের আর একটি মেয়ে হয়ে থাক্।

জননী। লোকে প্রথম প্রথম হাসাহাসি করেছিল বটে; আমি বুঝিয়ে বলেছি যে বৌ এই রকম থাকে তা আমার ভাল লাগে। আর আমি দেখ্‌ছি যে একেবারে বাড়ীর মেয়ে হয়ে গিয়েছে। আমায় বলেছে "মা আমাকে পায়ের ধূলো দিন, ও বসে বসে দেখুন আমি কেমন কাজ করি।" বড় ভাল মেয়ে।

মহেশ। মা তোমার মুখে একথা শুনলেও সুখ হয়। ও যেরূপ ঘরের মেয়ে তার মত গুণ পেয়েছে। আমিও ওর চাল-চলন দেখে বড় সুখী হয়েছি।

ওদিকে মেয়ে-স্কুলের ও আত্মোন্নতি সভার কাজ নিয়মমত চলিয়াছে। ক্ষীরদা আসার পর মহেশ আর সপ্তাহে তিন চারদিন দুপুর বেলা সেখানে যাইতে পারেন না। নবীন পাঠক দ্বিতীয় পণ্ডিত ত;আছেন; তদ্ভিন্ন

একটি বয়স্থ যুবককে পণ্ডিত মহাশয়ের সাহায্যের জন্য উপরি খাটুনি খাটিবার ভার দিয়া মহেশ নিজে ছুটি লইয়াছেন। সে ছেলেটী পণ্ডিত মহাশয়ের আদেশ মত খাটে; নবীন পাঠকের সঙ্গে মিলিয়া মেয়েদিগকে গল্প পড়িয়া ও গান গাইয়া শোনায়; এবং স্কুলের জন্য বাড়ী বাড়ী চাঁদা সংগ্রহ করে। মহেশ সপ্তাহে একদিন স্কুলে যান এবং হাস্য পরিহাসাদি দ্বারা মেয়েদিগকে আনন্দিত করিয়া তোলেন।

আত্মোন্নতি সভার কাজ জমিয়া গিয়াছে; মাসিক, পাক্ষিক ও সাপ্তাহিক কয়েকখানি কাগজ আসিতেছে, যাহা যুবকগণ মনোযোগ পূর্ব্বক পড়িতেছে। অনেক পুস্তক সংগৃহীত হইয়া তাহাদের পাঠের বিশেষ সাহায্য হইতেছে; কয়েক মাসের মধ্যেই বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, তাহাদের জ্ঞানস্পৃহা ও স্বদেশপ্রেম উদ্দীপ্ত হইতেছে; তাহাদের কথা-বার্ত্তা চালচলন যেন বদলাইয়া যাইতেছে; ইহা দেখিয়া মহেশ মনে মনে বড়ই আনন্দিত।

এইরূপ করিয়া প্রায় এক বৎসর কাল গত হইলে, একদিন গ্রামের বাঙ্গালা স্কুলের হেডপণ্ডিত মহাশয় মহেশকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। তিনি একজন বিদেশী লোক; বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নব-প্রতিষ্ঠিত নর্ম্মাল স্কুলে পাঠ করিয়া স্কুলসমূহের ইনস্পেক্‌টার সাহেবের আদেশ ক্রমে এই গ্রামে পণ্ডিতী করিতে আসিয়াছেন। তিনি জমিদার বাবুদের কাছারীবাড়ীর পাশের ঘরে থাকেন; এবং একটি ব্রাহ্মণের বাড়ীতে মাসে মাসে কিছু দিয়া দুবেলা আহার করেন। ভদ্রলোকটির নাম রামধন মুখুর্য্যে, বেতন পান মাসে পঁচিশ টাকা। স্কুলের দ্বিতীয় পণ্ডিতটি পার্শ্বের এক গ্রামের লোক। তিনি হঠাৎ পীড়িত হইয়া কাজের বাহির হইয়া পড়িয়াছেন। তাঁহাকে বাধ্য হইয়া স্কুলের কাজ হইতে অবসর লইতে হইতেছে। এই অবস্থায় পড়িয়া হেডপণ্ডিত মহাশয় মহেশকে ডাকিয়া পাঠাইলেন।

তিনি গ্রামের লোকের মুখে মহেশের বিদ্যাবুদ্ধির অনেক প্রশংসা শুনিয়াছেন; কয়েক বার অভ্যোন্নতি সভাগৃহে গিয়া, তাঁহাদের কাজ-কর্ম দেখিয়া আসিয়াছেন; মহেশের সঙ্গে কথাবার্ত্তা কহিয়া শ্রদ্ধা জন্মিয়াছে; তাই দ্বিতীয় পণ্ডিতের পদে তাঁহাকে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারা যায় কি না দেখিবার জন্য তাঁহাকে ডাকিয়াছেন।

কথোপকথনের পর স্থির হইল, যে মহেশ মাসিক পনর টাকা বেতনে দ্বিতীয় পণ্ডিতের কাজ করিবেন; তাঁহাকে তৃতীয় শ্রেণীতে বাঙ্গালা এবং প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীতে ইতিহাস, ভূগোল ও অঙ্ক পড়াইতে হইবে। মহেশ তাহাই স্বীকার করিয়া আসিলেন। দশ বার দিন পরে কাজে বসিতে হইবে। মহেশ বাড়ীতে আসিয়া জননীর পদধূলি মাথায় লইয়া তাহাকে সেই সংবাদ দিলেন। বলিলেন "মা ভগবান তোমার সহায়, তুমি অর্থচিন্তায় বিব্রত হও, তাহা তিনি হইতে দিলেন না; বাঙ্গলা স্কুলের পণ্ডিত মশাই আমাকে ডেকে দ্বিতীয় পণ্ডিতের কাজে বসতে অনুরোধ করেছেন; বেতন মাসিক পনর টাকা; আমি স্বীকার করেছি। তুমি তারার বিয়ের জন্য ব্যস্ত হয়েছ, সে ত খরচের কর্ম্ম, তাই ভগবান তোমার হাতে টাকা দেবেন। মাস গেলে টাকাগুলি এনে আমি তোমার পায়ে রাখব; তুমি যত পার তারার বিয়ের জন্য জমাবে।"

জননী। (মাথায় হাত দিয়া) তুমি বেঁচে থাক।

তারপর সেই দশবার দিন মহেশের বিশ্রাম রহিল না। স্কুলের প্রথম, দ্বিতীয়, ও তৃতীয় শ্রেণীর পাঠ্য পুস্তকগুলি আনাইয়া পাঠে নিমগ্ন হইলেন। ইতিহাসটার জন্যই তাঁর প্রধান ভাবনা; কারণ অগ্রে নিজের পাঠের যে ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, তাহাতে ইতিহাসের দিকে তত মন দেন নাই। এই কয়দিনের মধ্যে যে কেবল বাঙ্গালা ইতিহাসখানা

পড়িলেন তাহা নহে, মার্শম্যান সাহেবের ভারতবর্ষের ইতিহাস এবং এক-খানা ইংরাজী বাঙ্গলার ইতিহাসও পড়িয়া ফেলিলেন। পাঠে সে কি মনোযোগ! বালকেরা পরীক্ষা দিবার জন্তও এত পড়ে না। লোকে দেখিয়া অবাক। পড়িয়া শুনিয়া যখন গিয়া কাজে বসিলেন, তখন কিছু দিনের মধ্যেই অপরাপর শিক্ষকেরা স্বীয় কার্য্যে মহেশের উৎসাহ ও অনুরাগ দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া যাইতে লাগিলেন। শিক্ষকদের মধ্যে যেন একটা নবজীবন আসিল। মহেশ প্রসিদ্ধ শিক্ষকদের জীবন-চরিত আনাইয়া পড়িয়া স্কুলের শিক্ষকদিগকে শুনাইতে লাগিলেন। তাঁহারা এরূপ কথা কখনও শোনেন নাই। শুনিয়া উৎসাহ অগ্নি যেন জ্বলিয়া উঠিতে লাগিল; গ্রামের কি মহৎকার্য্যের ভার তাঁহাদের উপর ন্যস্ত হইয়াছে, তাহা যেন তাঁহারা অনুভব করিতে লাগিলেন। কেবল শিক্ষক কেন, মহেশ প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর বালকদিগকে লইয়া দল বাঁধিয়া, নূতন জ্ঞানের বিষয় জানাইতে ও নূতন খেলা শিখাইতে লাগিলেন। লোকে বলিতে লাগিল "এইবার মহেশ বাঙ্গলা স্কুলটাকে জাগিয়ে তুলেছে; শুভক্ষণে ওকে দ্বিতীয় পণ্ডিত করা হয়েছে।"

এদিকে তারার বিবাহ ব্যাপারটা পাকিয়া উঠিতে লাগিল। জগদ্ধাত্রী দেবী চারিদিকে সংবাদ লইতে লাগিলেন। মহেশের বয়স্তদিগের কাহাকে কাহাকেও পার্শ্বের গ্রাম সকলে পাঠাইতে লাগিলেন। সংবাদ পাইলেন, পাশের গ্রামের ইংরাজী স্কুলের প্রথম শ্রেণীতে একটি ছেলে পড়ে; তার নাম উপেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী। ছেলেটি বড় ভাল; যেমন বুদ্ধি শুদ্ধি, তেমনি স্বভাব চরিত্র। জগদ্ধাত্রী দেবী তাহার পিতার নিকট লোক পাঠাইলেন। তাঁহারা শুনিয়া বলিলেন বিদ্যালঙ্কারের মেয়ে এতে আর কি কথা আছে; তবে মেয়েটি একবার দেখতে হবে।

তাঁহারা দেখিতে আসিলেন। মেয়েটির বয়স তখন নয় কি দশ

বয়সর, সুস্থ ও সবল দেখিতে শুনিতে মন্দ নয়। দেখিয়া তাঁহারা প্রীত হইলেন; পাড়াতে সংবাদ লইলেন, মেয়ে স্কুলের পণ্ডিতের সঙ্গে অগ্রেই আলাপ পরিচয় ছিল, তাঁহারও সহিত কথা হইল। বিবাহ একপ্রকার স্থির হইয়া গেল; কিন্তু হঠাৎ একটা পারিবারিক বিপদ পড়াতে দিন পিছাইয়া যাইতে লাগিল। সে বিপদটা এই; মহেশের পিসা শ্রীধর তর্করত্ন মহাশয় এইসময়ে হঠাৎ গুরুতর পীড়াতে আক্রান্ত হইলেন। পীড়াটা বড় কঠিন বোধ হইতে লাগিল; বন্ধুবান্ধব আত্মীয়স্বজন সকলে চিন্তিত হইতে লাগিলেন। কিছু দিন দেখিয়া মনে হয় যেন সারিয়া উঠিতেছেন, কিন্তু আবার শয্যাশায়ী হন; আবার কঠিন লক্ষণ সকল প্রকাশ পায়। অগ্রেই বলিয়াছি নিস্তারিণীর ভালবাসাতে আবদ্ধ হইয়া মহেশ দুই এক দিন অন্তর পিসা মহাশয়ের বাড়ীতে গিয়া থাকেন। এই পীড়ার মধ্যে নিস্তারিণী চিন্তাতে ভাঙ্গিয়া পড়িতেছেন দেখিয়া মহেশ প্রতিদিন সকালে বিকালে পিসামহাশয়ের শয্যাপার্শ্বে উপস্থিত হইতে লাগিলেন; এবং বয়স্যদিগের মধ্যে একজনকে কবিরাজ ডাকিবার ও ঔষধাদি আনিবার জন্য নিযুক্ত করিয়া দিলেন। পিসা-মহাশয়ের পীড়ার চিন্তা তাঁহার মনকে এমন করিয়া অধিকার করিল, যে তাহার বিবাহের আয়োজনের দিকে আর মন দিতে পারেন না। আর সেই আয়োজন-কর্ত্রীদিগের মধ্যে নিস্তারিণী ত এক প্রধান ব্যক্তি; তাঁহাকে বাদ দিয়াই বা কিরূপে আয়োজন করা যায়। একবার পিসা-মহাশয়কে একটু ভাল দেখিয়া বিবাহের আয়োজনের দিকে মন দেন, আবার পীড়া বৃদ্ধি হইয়া সে চিন্তা মন হইতে দূর করিয়া দেয়। এইরূপে কয়েক মাস কাটিয়া গেল। অবশেষে পিসামহাশয় শয্যা হইতে উঠিলেন, এবং নিস্তারিণী আসিয়া মহেশের বাড়ী আশ্রয় করিলেন। বিবাহের আয়োজন আরম্ভ হইল। প্রথম প্রশ্ন উঠিল বিবাহের ব্যয় কিরূপে নির্ব্বাহ

হইবে ? সে সময় এই শ্রেণীর ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে বিবাহের পণ লইবার প্রথা ছিল না; সুতরাং কন্যাপক্ষীয়েরা কি দিবেন সে কথাই উঠিল না; তাঁহারা চারিগাছা চুড়ি হাতে দিয়া বিবাহ দিলেও বিবাহ হইবে, এইরূপ স্থির হইল। তথাপি বরকন্যাকে উপহার দেওয়া, বন্ধুবান্ধবকে খাওয়ান ইত্যাদির ব্যয় অনিবার্য্য; কে বুঝিবে ভগবানের লীলা! বিবাহের প্রস্তাব যখন উঠিল তখন ব্রজনাথ দত্ত মহাশয় উৎসাহের সহিত এই বিবাহ অনুষ্ঠানের সাহায্য করিবার জন্য অগ্রসর হইলেন। মহেশকে বলিলেন "বিদ্যালঙ্কার মহাশয় বড় সাধুপুরুষ ছিলেন; তুমিও বড় ভাল ছেলে, এ বিয়েটা ভাল করে হওয়া উচিত; যা করবার আমি করবো, আমার উপর ভার দেও।"

মহেশ। ধন্য জগদীশ্বর! এর উপর কি আর কথা আছে; আমি ত বেঁচে গেলাম।

তারপর বাস্তবিক মহেশের স্কন্ধের ভার নামিয়া গেল। ব্রজনাথ দত্ত মহাশয় পরামর্শদাতারূপে পশ্চাতে রহিলেন। মেয়েকে কি কি গহনা দিতে হইবে, কোন দিন কত লোক খাইবে, খাওয়ার আয়োজন কি কি হইবে, এইসকল পরামর্শ দিতে লাগিলেন। আশ্চর্য্য সেই প্রবীণ মানুষের কাজ করিবার শক্তি! তাঁর পরামর্শে সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতম বিষয়-গুলিরও অভাব হইল না; সকল বিষয়ে মন। মেয়ের গহনার বিষয়ে স্থির হইল জগদ্ধাত্রীদেবীর সধবা অবস্থার অলঙ্কারের মধ্যে বাজু, বালা ও কোমরের চন্দ্রহার তারা পাইবে; তাঁর গলার হার পুত্রবধূ ক্ষীরদা পাইবে। দত্তজ মহাশয় নিজে তারার গলায় হার দিবেন; এবং মহেশকে ভগিনীর নাকের নোলক ও কাণের দুল দিতে হইবে। তদনুরূপ আয়োজন হইতে লাগিল। লোকখাওয়ান বিষয়ে স্থির করিলেন যে, বিবাহের রাত্রে ব্রাহ্মণ কায়স্থ প্রভৃতি আড়াই শত লোক খাইবে; এবং

ংপর ৪জন স্বশ্রেণীর ব্রাহ্মণদিগের প্রায় একশত জন আহার করিবে।
াকখাওয়ানর ব্যয় সম্বন্ধে এই স্থির হইল, যে তিনি নিজে আপাততঃ
ুদয় ব্যয়ভার বহন করিবেন, পরে মহেশ সে ঋণ শোধ করিবেন।

দত্তজ মহাশয়ের কার্য্য এখানে শেষ হইল না। তিনি মহেশের বয়স্ক
বকদিগকে কাছে ডাকিয়া কে কে লুচি ভাজিবে, কোন্ কোন্ আত্মীয়া
ধবাকে তরকারী-রন্ধনের জন্য ডাকা হইবে, কোন্ গোয়ালাকে দধি
ভৃতির জন্য বায়না দিতে হইবে, কোন্ ময়রার দোকানে সন্দেশ লওয়া
হইবে, প্রভৃতির সমুদয় ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। তাঁহার কর্তৃত্বাধীনে
বিবাহের আয়োজনটা কলের কাজের মত চলিতে লাগিল।

একদিকে যেমন ব্রজনাথ দত্ত মহাশয় সাহায্য করিবার জন্য উন্মুখ
হইলেন, অপরদিকে মহেশের মাতুল অবসর বুঝিয়া ভগিনীর অভিমান
ভাঙাইবার জন্য প্রতিজ্ঞারূঢ় হইলেন। বিবাহের প্রস্তাব তাঁহার কর্ণগোচর
হইবামাত্র তিনি বিবাহের পূর্ব্বদিন হরিরামপুরে আসিয়া উপস্থিত
হইলেন এবং জ্যেষ্ঠা সহোদরার পদধূলি লইয়া প্রণত হইলেন। জগদ্ধাত্রী-
দেবী তাঁহাকে দেখিয়া প্রথমে গম্ভীরমূর্ত্তি ধারণ করিলেন বটে, কিন্তু
অধিকক্ষণ তাহা রহিল না। কৈলাশবাবু তাঁহার চরণে মাথা রাখিয়া
বলিলেন "দিদি, আমাকে মাপ কর, মহেশের উপর রাগ করে আমি
তোমাকে কষ্ট দিয়েছি; তুমি আমার টাকা ফিরিয়ে দিয়েছ, আমি
সেজন্য রাগ করিনি; আমি তোমার কাছে আসব আসব ভাবছিলাম,
ইতিমধ্যে শুনলাম তারার বিয়ে হবে। তোমরা ত খবর দিলে না; তা
যদি দিতে সকলকে নিয়ে আসতাম; তা হোলো না। যা হোক, আমি
ভাবলাম, খবর দাও না দাও আমি আসবই ও তারার বিয়ে দেখে যাব।
তাই এলাম।" শুনিতে শুনিতে জগদ্ধাত্রীদেবীর চক্ষে জলধারা বহিতে
লাগিল; রাগ উষ্মা কোথায় গেল; ভ্রাতৃপ্রেম মনে জাগিয়া উঠিল।

তিনি ভ্রাতাকে বাড়ীর কুশল জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন; ভ্রাতৃজায়া, ভ্রাতৃকন্যা ভ্রাতুষ্পুত্রদিগের বিশেষ সংবাদ লইতে প্রবৃত্ত হইলেন। সেই-দিন সন্ধ্যার পর মহেশের সহিত একত্র বসিয়া স্থির হইল, যে মহেশের যে যে গহনা দিবার কথা তাহা কৈলাসবাবু দিবেন; এবং অপরাপর ব্যয়ের সাহায্যার্থ তিনি এককালীন একশত টাকা দিবেন। মহেশের মাথার বোঝা যেন নামিয়া গেল। তিনি সদাশয় মানুষ, মামা যে বাড়ী হইতে তাড়াইয়া দিয়াছিলেন, সেজন্য তাঁহার মনে অভিমান ছিল না। তিনি মামার পুরাতন স্নেহের আবির্ভাব দেখিয়া পুলকিত হইতে লাগিলেন। ক্ষীরদা যখন ঘোমটা দিয়া আসিয়া তাঁহার পদে প্রণত হইলেন, তখন কৈলাস চক্রবর্ত্তী মহাশয় ভগিনীকে বলিলেন "ওমা, বৌ এখানে! তবে তোমার সেবা করবার লোক রয়েছে!"

জগদ্ধাত্রী। সে কথা আর কেন বল। ঐ ভদ্রলোকের মেয়ে আমাকে বাঁচিয়ে রেখেছে; হাতের কাজ সব কেড়ে নিয়েছে! ঠাট্টা, আমোদ, আহ্লাদে ঘর পূর্ণ করে তোলে। তুমি মামা-শ্বশুর কিনা তাই ঘোমটা দিয়ে আছে; আমাদের কাছে ঘোমটা-টোমটা দেয় না, যেন বাড়ীর মেয়ে। তুমি যদি মুখখানা দেখতে, তা হলে মুগ্ধ হয়ে যেতে।

কৈলাস। হই না কেন মামাশ্বশুর, আজকাল নিয়মের বাঁধাবাঁধি নেই; বলে, কয়ে, বকে কি করবো, কেউ ত নিয়ম রাখছে না। (ক্ষীরদার প্রতি) মুখখোলা মা, মুখ খোলো, একবার দেখি।

জগদ্ধাত্রীদেবী ক্ষীরদার ঘোমটা খুলিয়া দিলেন; ক্ষীরদা দুই চক্ষু মুদিয়া রহিলেন। বড় বড় চোখ দুটি মুদ্রিত অবস্থাতেও সুন্দর দেখাই-তেছে। কৈলাস চক্রবর্ত্তী মহাশয় সুন্দর মুখখানি দেখিয়া পুলকিত হইয়া উঠিলেন;—বলিলেন "বাঃ বাঃ, কি সুন্দর মেয়ে! দিদি, তোমার ঘর আলো করেছে।"

জগদ্ধাত্রী। শুধু কি ঘর আলো করেছে; তিনি চলে যাওয়ার পর সবাই ম্লান হয়ে পড়েছিলাম; আমার প্রাণের ভার যেন কমিয়ে দিয়েছে।

কৈলাস। আচ্ছা, বেঁচে থাক, বেঁচে থাক (বলিয়া নিজ পকেট হইতে পনর টাকার নোট বাহির করিয়া বৌকে দর্শনী দিলেন)। গৃহিনীকে বলিলেন "বৌকে আমার বাড়ীতে কিন্তু একবার নিয়ে যাব।"

জগদ্ধাত্রী। সে এখন ত নয়, পরে দেখা যাবে। ইহার পরে মহেশ ও ক্ষীরদা মাতুলের সেবার জন্য কোমর বাঁধিয়া লাগিয়া গেলেন; সেদিন রাত্রে তিনি কি খাইবেন, কোথায় থাকিবেন, সেই ব্যবস্থাতে প্রবৃত্ত হইলেন।

বিবাহান্তে মহেশ যখন দত্তজ মহাশয়কে বিবাহের ব্যয়ের বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন, তখন তিনি হাসিয়া বলিলেন, "তুমি দেখছ কি? তুমি বুঝি মনে করেছ আমাকেই সব ব্যয় দিতে হয়েছে? তা নয়, বিদ্যালঙ্কার মশাইকে গ্রামের লোকেরা কি ভক্তির চক্ষে দেখে তা তুমি সব জান না। তাঁর একমাত্র কন্যার বিবাহ উপস্থিত; যার যা দেবার লোকে দিয়েছে। কেউ পাঁচ টাকা, কেউ সাত টাকা, কেউ দশ টাকা। হিসাব করে দেখব তোমাকে ত টাকা দিতেই হবে না, বোধহয় কিছু পাবে।

হিসাব পরিষ্কার হইলে মহেশকে তিনি ত্রিশ টাকা দিলেন। ঐ ত্রিশ টাকা ও কৈলাস চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের প্রদত্ত একশত টাকা পাইয়া ব্যয় এক প্রকারে নির্ব্বাহ হইয়া গেল। যে দশ বিশ টাকা অধিক লাগিল, তাহা জগদ্ধাত্রী দেবী নিজের সঞ্চিত অর্থ হইতে দিলেন।

তারার বিবাহের অল্প দিন পরেই গিরিশের এন্ট্রান্স পরীক্ষা উপস্থিত হইল। গিরিশের পাঠে বড় মনোযোগ, সকালে বিকালে বাড়ীতে

পদার্পণ করিলেই লোকে দেখিতে পাইত যে, গিরিশ পাঠে নিমগ্ন। পাড়ার ছেলেরা যে সকল আমোদে সময় নষ্ট করিত, তাহার ভিতরে গিরিশ প্রায় থাকিত না। মহেশ মধ্যে মধ্যে বলিতেন "গিরিশ, যা যা, একটু বাহিরে যা, ছেলেদের সঙ্গে একটু খেলে আয়; কেবল ঘাড় গুঁজে পড়বি, তাতে শরীর ভাল থাক্‌বে কেন?" গিরিশ সে কথায় কর্ণপাত করিত না, কেবল পড়া, পড়া, পড়া। তাহার ফল পরীক্ষাতে দেখা গেল; গিরিশ প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হইয়া স্কুলের মুখ উজ্জ্বল করিল; এবং অল্পদিনের মধ্যেই জানা গেল যে সে একটী বৃত্তি পাইয়াছে।

এই সংবাদে গিরিশের মামা পুলকিত হইয়া উঠিলেন এবং তাহাকে কলিকাতায় নিজের বাসায় লইয়া গেলেন। কলিকাতায় লইয়া গিয়া তাহাকে প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্ত্তি করিয়া দিলেন। এই সঙ্গে আর একটি ব্যাপার উপস্থিত হইল। কলিকাতার দক্ষিণ উপনগর ভবানীপুরে কৈলাস চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের একটী স্বজাতীয় বন্ধু ছিলেন; দুজনে গাঢ় মিত্রতা; উভয়ে যৌবন-সুহৃৎ এবং এক আফিসে কর্ম্ম করেন। তাঁহারা অনেক পৈতৃক সম্পত্তি পাইয়াছেন, অবস্থা ভাল; সুখেই বাস করেন, চাকুরী না করিলেও চলে; কেবল আলস্যে দিন যাপন না করিয়া কাজ করা ভাল বলিয়া কর্ম্মটী লইয়াছেন। কার্য্যালয়ে চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের সহিত গিরিশের বিষয়ে তাঁহার কথা হইত। মাতুলের মুখে গিরিশের প্রশংসা ধরিত না। বলিতেন "আমার বোন ভাগ্যবতী যে এমন ছেলে পেটে ধরেছে।" ইত্যাদি। বন্ধু কৃষ্ণধনের একটী আট বৎসর বয়স্কা কন্যা আছে। তিনি মনে করিয়াছিলেন যে তাকে আর দুই বৎসর পরে বিবাহ দিবেন। কিন্তু গিরিশের কথা শুনিতে শুনিতে মনে হইল যে শীঘ্র এই ছেলের সঙ্গে বিবাহ দিলে হয়। এই ভাবিয়া তিনি কৈলাস চক্রবর্ত্তী মহাশয়কে ধরিয়া বসিলেন। তিনি ইতস্ততঃ

[illegible]তে লাগিলেন—"সবে এণ্ট্রান্স পাশ করে এসেছে, এখন পড়া [illegible]নাতে যেতে গিয়েছে, বিবাহের প্রস্তাব কি তার ভাল লাগবে? [illegible]পর মহেশ পিছনে আছে, তার মত ত অন্য ছেলের মত নয়; [illegible]বিদ্যাসাগরের শিষ্য, সে কি মত দেবে? আর, তার কথা অগ্রাহ্য [illegible] আমার বোন কি বিয়ে দিতে রাজি হবে?" এই সকল চিন্তা তাঁহার [illegible] উদয় হইতে লাগিল। কিন্তু বন্ধুর ব্যগ্রতা ও জেদ তাঁহাকে [illegible]র করিয়া তুলিতে লাগিল। অবশেষে তিনি গোপনে ভগিনীর [illegible]ট লোক পাঠাইলেন। সে ব্যক্তি হরিরামপুরে পার্শ্বের বাড়ীতে [illegible]সিয়া, জগদ্ধাত্রীদেবীকে ডাকাইয়া লইয়া, সমুদয় কথা ভাঙ্গিয়া বলিল; [illegible]প ঘরের মেয়ে, কিরূপ গহনাপত্র দিবে, গিরিশ কিরূপ সাহায্য [illegible]বে—ইত্যাদি সকল বিষয় ব্যক্ত করিল। ছেলেটী একটা আশ্রয় [illegible]বে এই ভাবিয়া জগদ্ধাত্রীদেবীর মন সেই দিকে ঝুঁকিয়া পড়িল। [illegible]নি বাড়ীতে আসিয়া সেই বৈকালেই মহেশের নিকট সকল কথা [illegible]ঙ্গিয়া বলিলেন; এবং গিরিশের বিবাহের প্রস্তাব উপস্থিত করিলেন।

মহেশ। ওমা বল কি? গিরিশের বয়স যে সতর আঠার বৎসরের [illegible]ধিক হবে না; পরীক্ষাটা পাশ করে সবে উৎসাহের সঙ্গে কলেজে [illegible]তে বসেছে, এর মধ্যে বিবাহ! তার যে সকল দিকে ক্ষতি হবে।

জননী। সে ত আর এখনি বৌ নিয়ে ঘর করতে যাচ্ছে না; [illegible]বার গিয়ে বিয়েটা করে আসবে, তারপর পড়ুক না।

মহেশ। মা, আমি বাল্যবিবাহের পক্ষ নই। গিরিশের বয়স [illegible]র আঠার বৎসর; এই বয়সে ও এই পড়াশোনার মধ্যে তার কোলে [illegible] একটি আট বছরের মেয়ে দেওয়া উচিত?

জননী। তোমার সকল দিকেই বাড়াবাড়ি! কোলে মেয়ে দেওয়া [illegible] রকম? মেয়ের বয়েস ত আট বছর; সে বার তের বছরের হতে না

হতে গিরিশের পড়া শোনা সাঙ্গ হবে। তারপর আসল কথাটা এই—এই বাড়ীতে বিয়ে করলে গিরিশের চিরদিনের জন্যে একটা সহায় সম্বল থাকবে। আমাদের মাথার একটা বোঝা নেমে যাবে।

মহেশ। মা, তুমি ত গৃহের কর্ত্রী, তারার বিবাহের সময় তুমি যা স্থির করেছ তাই হয়েছে, এ বিবাহও তোমার ইচ্ছামত দেও। আমি আর কি বলবো? তোমার যেরূপ ইচ্ছা তাই কর। গিরিশ যদি আপত্তি না করে, বিবাহ করুক। মামা চিঠি লিখেছেন যে, বিবাহের পর মামীমা, দুই মেয়ে, গিরিশ ও বৌকে নিয়ে বৌ-ভাতের জন্য এখানে আসবেন। বৌভাতের ব্যয় মামা দেবেন।

জগদ্ধাত্রী। আচ্ছা তাই হোক্; আমাদের "না" বলা ভাল দেখায় না; কৈলাসের মন ফিরেচে দেখচি।

ইহার পর যথাসময়ে গিরিশের বিবাহ হইল। মহেশের মনে যে ইতস্ততঃ হইতেছিল, গিরিশের মনে তাহার কিছুই দেখা গেল না; বরং ব্যগ্রতা ও উৎসাহই দেখা গেল। কন্যাপক্ষীয়দিগের অবস্থার বিষয় জানিয়া শুনিয়া এবং তাহারা গিরিশকে একটা সোনার টেঁকঘড়ি ও কয়েক হাজার টাকা উপহার দিবেন সংবাদ পাইয়া গিরিশের মন সেই দিকে ঝুঁকিয়া পড়িল। যথাসময়ে মহেশ বয়স্য যুবকদিগের সঙ্গে বরযাত্র হইয়া কলিকাতায় মাতুল-ভবনে গেলেন; মাতুল মহাশয় সদলে মহা আড়ম্বর ও বাদ্যবাজনা করিয়া ভবানীপুরে বন্ধুভবনে বিবাহসভায় উপস্থিত হইলেন; এবং গিরিশের বিবাহ দিয়া আসিলেন।

বিবাহের পর কৈলাসচন্দ্রের পত্নী মহামায়া, নিজের কন্যাদ্বয়, গিরিশ, নববধূ ও তাহার সঙ্গিনী এক নারীকে লইয়া হরিরামপুরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহাদের পদার্পণে জগদ্ধাত্রীদেবীর আনন্দের সীমা রহিল না। তিনি ভ্রাতৃজায়াকে কোথায় রাখিবেন, কি

খাওয়াইবেন, সেই চিন্তায় ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। মহামায়া বলিলেন,—"ঠাকুরঝি! তুমি ব্যস্ত হও কেন? তোমার কাজের ভারটা নিজের কাঁধে নেব বলেই ত এসেছি।" এই বলিয়া বৌভাতের ব্যাপারটা ভাল করিয়া করিবার জন্য কোমর বাঁধিলেন। এ-পাড়ার ও-পাড়ার মেয়েদিগকে নিমন্ত্রণ করা হইল; মহেশের যুবক-বন্ধুদিগের মধ্যে অনেকে কোমর বাঁধিয়া ফাই-ফরমাস খাটা, এটা ওটা আনিয়া দেওয়া, রাঁধিবার আয়োজন করিয়া দেওয়া প্রভৃতি কাজে লাগিয়া গেল। যথাসময়ে রন্ধনকার্য্যের জন্য কয়েকটী সম্পর্কীয় মেয়ে কোমর বাঁধিয়া আসিয়া রন্ধনশালায় অবতীর্ণ হইলেন; নিস্তারিণী তাহার মধ্যে একজন; মহামায়াও কোমর বাঁধিয়া তত্ত্বাবধান-কার্য্যে লাগিয়া গেলেন। কোথা দিয়া কাজ হইয়া গেল, জগদ্ধাত্রী বা মহেশ যেন তাহা বুঝিতেও পারিলেন না। প্রায় সাড়ে তিনশত চারিশত মেয়ে আহার করিল। জগদ্ধাত্রীদেবী বসিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিলেন, "মানুষে যে এত করে সে সব সেই সাধু-পুরুষেরই জন্য"—এই ভাবিয়া সকল কাজের মধ্যে বিদ্যালঙ্কার মহাশয়ের স্মৃতি হৃদয়ে ধারণ করিতে লাগিলেন; এবং মনে মনে তাঁহার চরণে প্রণত হইতে লাগিলেন। বৌভাতের পর মহামায়া আবার গিরিশ, বৌ ও নিজের কন্যাদ্বয় লইয়া কলিকাতায় নিজভবনে প্রস্থান করিলেন। সেখান হইতে বৌ নিজ পিতৃভবনে গেল; গিরিশ উৎসাহের সহিত কলেজের পড়াতে মগ্ন হইলেন।

এদিকে গিরিশের বিবাহের কয়েক মাস পরেই তারার শ্বশুর-কুলের লোকেরা আসিয়া তারাকে লইয়া গেল। প্রচলিত প্রথা-অনুসারে জগদ্ধাত্রীদেবী আশা করিয়াছিলেন, যে তারা অন্ততঃ আর এক বৎসর তাঁহার নিকট থাকিবে। কিন্তু তাহার শশ্রূঠাকুরাণীর হঠাৎ গুরুতর পীড়া হওয়াতে তাহারা বাধ্য হইয়া তারাকে লইতে আসিল। শাশুড়ী

বৌকে কাছে দেখিতে চাহিয়াছেন; অগত্যা মাতা ও ভ্রাতাকে তাহাকে পাঠাইতে বাধ্য হইতে হইল। তারা নয় দশ বৎসরের মেয়ে; জন্মাবধি মা ও ভাই ভিন্ন আর কাহাকেও জানে না; ওদিকে মেয়ে স্কুলে ভর্ত্তি হওয়া পর্য্যন্ত পড়াশোনাতে তার মন বসিয়াছে; উৎসাহের সহিত লেখাপড়া শিখিতেছে; ক্ষীরদা আসার পর হইতে একজন সঙ্গের সঙ্গিনী, উৎসাহদায়িনী ভগিনী পাইয়াছে। এই সকলের ভিতর হইতে ভিন্ন স্থানে, ভিন্ন গ্রামে, নীত হওয়া তার পক্ষে ঘোর পরীক্ষা হইয়া দাঁড়াইল। যাত্রার পূর্ব্বে কয়েক দিন চক্ষের জলে ভাসিতে লাগিল; আহার নিদ্রা বর্জ্জিত হইল; ঘুমের মধ্যে চমকিয়া চমকিয়া উঠিতে লাগিল। মা কত বুঝাইলেন; ক্ষীরদা কত বুঝাইলেন; বলিলেন—"দেখ দেখি, আমি এসে কেমন আছি; আমি কি তোমার মত কাঁদি? আমার ত পরের বাড়ী মনে হয় না; আমি ত বেশ সুখেই আছি। তুমি কাঁদ কেন? যাও, গেলে কিছু দিন পরে নিজের বাড়ী হয়ে যাবে।" তারা উত্তর করিল—"আমাদের বাড়ী যে তোমার নিজের বাড়ী হয়েছে, সে মা ও দাদার গুণে; তাঁরা তোমাকে পরের বাড়ী বুঝতে দেন নি; এমন লোক কি সেথানে পাব? জানত বৌ, মেয়েদের পক্ষে শ্বশুর বাড়ী কিরূপ!

ক্ষীরদা। আচ্ছা গিয়েই দেখনা কেন? সে গ্রাম ত দূরে নয়, এ গ্রামের পাশেই; মন খারাপ হলেই মধ্যে মধ্যে এখানে আসবে।

তারা মৌনী হইল; কিন্তু বাড়ী ছাড়িয়া যাইতে তার হৃদয় ভাঙ্গিয়া যাইতে লাগিল। যাইবার দিন প্রাতে তারার জন্য ডুলি আসিল। তাহাকে গিয়া ডুলিতে বসিতে হইল; কিন্তু বসিলে কি হয়, তাহার ক্রন্দন-ধ্বনিতে পাড়া কাঁপিয়া যাইতে লাগিল! পাড়ার মেয়েরা ছুটিয়া আসিলেন; কত বুঝাইতে লাগিলেন;—"ওরে যা যা, আমরা সকলেই

শ্বশুরবাড়ী আসবার সময় কেঁদেছিলাম। কাঁদলে কি হবে? মেয়ে হয়ে যখন জন্মেছিস্, কপালে দুঃখু আছে।" তারা কাঁদিতে কাঁদিতে শ্বশুর-বাড়ী যাত্রা করিল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

তারা শ্বশুরবাড়ী যাওয়ার পর বাড়ী একেবারে খালি হইয়া গেল। ক্ষীরদা বেচারির একজন সঙ্গের সঙ্গিনী যাওয়াতে বড়ই খালি খালি লাগিতে লাগিল। তিনি দুপর বেলা মহেশের কাছে পড়িতেন, মহেশ স্কুলে কর্ম্ম লওয়া হইতে তাহা বন্ধ হইয়াছে। এখন মহেশ সন্ধ্যার পর ব্রজনাথ দত্ত মহাশয়ের বাড়ী হইতে আসিয়া, আহারান্তে তাঁহাকে প্রায় রাত্রি দশটা পর্য্যন্ত পড়ান; তার পর তিনি শ্বশ্রূর ঘরে গিয়া শয়ন করেন। একদিন মহেশ রাত্রে পড়াইবার পর ক্ষীরদাকে বলিলেন—"ক্ষীরদা, তারা চলে যাওয়াতে তোমার বড় খালি খালি মনে হচ্চে; তাকে জড়িয়ে শুতে! এখন একলা শোয়া কেমন কেমন লাগে! কি বল, তোমাকে কি কাছে নেব? মা বোধ হয় তাই ইচ্ছে করছেন।"

ক্ষীরদা। আচ্ছা আরও দিনকত এমনি যাক্ না; বেশত আছি, পড়ছি শুনছি, ঘরের কাজ করছি, ঠাক্রুণের সেবা করছি।

মহেশ। (হাসিয়া) আচ্ছা, আমার কাছে শুতে আরম্ভ করলে বুঝি আর পড়াশোনা থাকবে না, শাশুড়ীর সেবা করবে না, তোমার মনের ভাবটা কি?

ক্ষীরদা। মনের ভাবটা এই, তারা চলে যাওয়াতে ঠাক্রুণের প্রাণে ব্যথা লেগেছে; মুখে কিছু বলেন না, আমি দেখলেই বুঝতে পারি। তা

আমি রাত্রে কাছে থাকাতে একজন সঙ্গী পান, এটা ওটা করে দি, রাত্রে উঠলে দীপটা জ্বেলে দি, তাতে ঠাকরুন সুখী থাকেন। এখন তোমার কাছে এলে তিনি একেবারে একলা পড়বেন। থাক্, আরও কিছুদিন যাক্।

মহেশ। কি লক্ষ্মী মেয়ে! সাধে তোমাকে মা এত ভাল বাসেন। আচ্ছা তাই হোক।

এই কথোপকথনের একমাস পরেই সংবাদ আসিল, জগদ্ধাত্রীদেবীর বিধবা ভগিনী হঠাৎ কলেরা রোগে মারা গিয়াছেন। তাঁহার শ্বশুরবাড়ী কাঞ্চনপুরে, হরিরামপুর হইতে পাঁচ ক্রোশের মধ্যে। আরও শোনা গেল যে, তাঁর সর্ব্বকনিষ্ঠা কন্যা কৃপাময়ীর বয়স ছয় সাত বৎসরের অধিক হইবে না, তাহাকে দেখিবার কেহ নাই। জগদ্ধাত্রীদেবী দুপুরবেলা আহার করিয়া উঠিয়াছেন, এমন সময় এই সংবাদ আসিল। তিনি শোকে অভিভূত হইয়া সেই যে গিয়া শয়ন করিলেন, আর উঠিলেন না। তাঁহার প্রকৃতি ধীর স্থির; চীৎকার করিলেন না; বুক চাপড়াইলেন না; হাহাকার করিলেন না; কেবল বালিশে মুখ গুঁজিয়া পড়িয়া রহিলেন; চক্ষের জলে বালিশ ভিজিয়া যাইতে লাগিল। মহেশ ও ক্ষীরদা যেন ভয়ে ভয়ে সে ঘরে প্রবেশ করিতে পারেন না; পাড়ার দুই একটি মেয়ে আসিয়া বুঝাইতে লাগিলেন। সন্ধ্যা অতীত হইয়া গেল; মহেশ অনেক ডাকাডাকি করাতে জননী উঠিয়া বসিলেন; মৌনী হইয়া একধারে বসিয়া নাম জপ করিতে লাগিলেন। সায়ংকালে সামান্য যে দুগ্ধ পান করিতেন, তাহা আর করিলেন না; সে রাত্রি শোকে কাটিয়া গেল।

প্রাতে মাতাকে বাহিরে আসিতে দেখিয়া মহেশ গিয়া পদতলে মাথা রাখিয়া, পদধূলি লইয়া বলিলেন—"মা, আমি কাঞ্চনপুরে যাই; দেখে আসি এ বিপদে তাঁরা কি করছেন। আর কৃপাকে নিয়ে আসি;

তাকে দেখবার ত কেউ নেই, তোমার কোলে এনে দি, তুমি মানুষ কর। কি বল?

জননী। কৃপাকে দেখবার কেউ নাই; তাকে আন্‌তে পারলে ত ভাল হয়; কিন্তু চালাবে কি করে? সবে আয় ত কুড়ি টাকা।

মহেশ। মা, ভগবানের প্রসাদে ও তোমার আশীর্ব্বাদে চলে যাবে। মেয়েটা কি ভেসে যাবে? তারা ত বাড়ী ছেড়ে গেছে, কৃপা এসে তারার স্থানে বসুক।

জননী। তুমি সাধুপুরুষ; তোমার উপর আমি আর কি কথা কব; যা ভাল বোধ হয় কর।

মহেশ। আচ্ছা, তবে আজ স্কুলের পর কাঞ্চনপুরে যাব; কাল প্রাতে কৃপাকে নিয়ে আস্‌ব।

অতঃপর বৈকালে মহেশ কাঞ্চনপুরে গেলেন, এবং তৎপর দিন প্রাতে কৃপাকে লইয়া আসিলেন। কৃপা জগদ্ধাত্রী দেবীর পক্ষপুটের মধ্যে আশ্রয় পাইল; তাঁহার হৃদয়ের ভার অনেকটা কমিয়া গেল। ভিতরকার কথাটা এই, কৃপা তারার অভাব পূর্ণ করিতে লাগিল।

ইহার কয়েকদিন পরেই মহেশের এক নূতন কাজ আসিল। গভর্ণমেণ্টের জমির নূতন খাজনা ধার্য্য করিবার উদ্দেশে এবং অপরাপর কোন কোন কাজের জন্য মাধবচন্দ্র মিত্র নামক একজন সুপ্রসিদ্ধ ডেপুটি কলেক্টর হরিরামপুরে আসিয়া উপস্থিত। মানুষটি বড় অমায়িক, স্বদেশ-প্রেমিক ও জ্ঞানানুরাগী, তিনি আসিয়া গ্রামের জমিদারবাবুদের এক বাগান বাড়ীতে এক বৎসরের জন্য প্রতিষ্ঠিত হইলেন। সঙ্গে সঙ্গে অপরাপর জিনিসের মধ্যে একটী লাইব্রেরী আসিয়া উপস্থিত; কি পাঠে মন! মহা কাজকর্ম্মের মধ্যে একটু সময় করিতে পারিলেই পাঠে মগ্ন হন। লোকজন দেখা করিতে আসিলেই নানা দেশ-হিতকর বিষয়ে এবং

জ্ঞানালোচনা বিষয়ে প্রসঙ্গ উপস্থিত করেন। কাহারও জ্ঞানে অনুরাগ দেখিলে তাহাকে যেন বুক দিয়া ধরেন, এবং বিধিমতে তাহার সাহায্য করেন। তিনি আসিয়া স্বীয় স্থানে প্রতিষ্ঠিত হইলে, গ্রামস্থ ভদ্রলোক-দিগের মধ্যে অনেকে দেখা করিতে গেলেন। তিনি সকলকেই সদ্ভাব ও সমাদরের দ্বারা আপ্যায়িত করিলেন; ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণ আসিলে তাঁহাদের পায়ে টাকা রাখিয়া প্রণাম করিলেন; এবং তাঁহাদের সঙ্গে শাস্ত্রালোচনা করিয়া আনন্দ লাভ করিলেন।

তিনি আসার দুই চারিদিন পরেই একদিন মহেশ স্কুলের হেড্-পণ্ডিত মহাশয়ের সঙ্গে মিত্রজ মহাশয়ের সহিত দেখা করিতে গেলেন। মহেশের সঙ্গে কথা হইতে হইতে তাঁর জ্ঞানস্পৃহা, স্বদেশ-প্রেম ও ধর্ম্মপরায়ণতার পরিচয় পাইয়া, চুম্বকে যেমন লোহা লাগে, মিত্রজ মহাশয় যেন তেমনি তাঁর গায়ে লাগিয়া গেলেন। মহেশ ইংরাজী কি কি পড়িয়াছেন এবং তখন কি পড়িতেছেন, তাহা শুনিয়া বলিয়া উঠিলেন— "ওমা, একি! তুমি এমন শিক্ষিত লোক, বাঙ্গলা স্কুলের দ্বিতীয় পণ্ডিতী করছ! আমি তোমাকে একখানা বই দিচ্ছি; তুমি যে বিষয়ে পড়েছ বললে, তাতে সে বিষয়ে অনেক নূতন কথা পাবে।" এই বলিয়া উঠিয়া গিয়া একখানা ইংরাজী বই আনিয়া মহেশকে পড়িতে দিলেন।

ইহার পর মহেশ প্রতিদিন স্কুলের ছুটির পর প্রায় একঘণ্টা কাল মিত্রজ মহাশয়ের নিকট গিয়া বসিতেন এবং নানাপ্রকার সদালোচনাতে প্রবৃত্ত হইতেন।

ক্রমে মিত্রজ মহাশয় মহেশকে পরীক্ষা করিতে লাগিলেন; মহেশ তাহা বুঝিতে পারিলেন না। একদিন নিজে খাটে শুইয়া মহেশের হাতে একখানা ইংরাজী পুস্তক দিয়া বলিলেন—"পড়ে শোনাও ত।" মহেশ পড়িয়া শুনাইতে লাগিলেন, মিত্রজ মহাশয় মনে মনে বলিতে লাগিলেন—

"বাঃ, বেশ ইংরাজী পড়ে ত!" তখন জানিতেন না, যে আত্মোন্নতি সভার পুস্তকালয়ে প্রতিদিন রাত্রে ইংরাজী বলিয়া ও ইংরাজী শুনিয়া মহেশের ইংরাজী বলার অভ্যাস হইয়াছে। একদিন মিত্রজ মহাশয় বলিলেন—"মহেশ, ঐ যে হিসাবটা আমার দেখবার জন্ম টেবলের উপর রেখেছে, মিলিয়ে দেখ ত ঠিক হয়েছে কি না; মহেশ চারি মিনিটের মধ্যে প্রকাণ্ড হিসাবটা মিলাইয়া বলিলেন—"ঠিক হয়েছে।" মিত্রজ মহাশয় পরে মহেশের কৃত হিসাব পরীক্ষা করিয়া দেখেন, তাঁর হিসাব প্রণালী অতি চমৎকার। একদিন নিজে শয্যাতে শুইয়া একখানা ইংরাজী পত্র মুখে মুখে বলিতে লাগিলেন, এবং মহেশকে লিখিতে আদেশ করিলেন। পরে মহেশের লেখা দেখিয়া মনে মনে বলিলেন—"বাঃ, সুন্দর ইংরাজী লেখেত!" আর একদিন মহেশের হাতে গবর্ণমেণ্টের তরফ হইতে প্রাপ্ত একখানা পত্র দিয়া বলিলেন—"আমি বড় ব্যস্ত, এটার একটা উত্তর লিখে এনত।" এই বলিয়া সে উত্তরে কি কি থাকিবে তাহা বলিয়া দিলেন। পরদিন প্রাতে মহেশ যখন উত্তরটি লিখিয়া আনিলেন, তাহা দেখিয়া মিত্রজ মহাশয় চমৎকৃত হইয়া গেলেন, বলিলেন—"বাঃ, তুমিত বেশ ইংরিজী লেখ!"

অবশেষে মিত্রজ মহাশয় মহেশের নিকট আসল প্রস্তাব উপস্থিত করিলেন; বলিলেন—"মহেশ, তোমাকে আমার অধীনে সাহায্য করবার কাজে একবৎসরের জন্ম নিযুক্ত করতে চাই। আপাততঃ এক বৎসর মাসে ৪০৲ টাকা মাহিনা দিব; পরে আবার দেখা যাবে। স্কুলে পনর টাকা বেতন পাচ্চ, তাতে সব অভাব দূর হয় না; চল্লিশ টাকা পেলে তবু একটু সুখে থাকতে পার্ব্বে"।

মহেশ সেদিন উত্তর দিলেন না; মনে মনে ভাবিলেন, ব্রজনাথ দত্ত মহাশয়কে ও মাতৃদেবীকে জিজ্ঞাসা করতে হবে। বাড়ী ফিরিবার সময়

পথে ব্রজনাথ দত্তের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। দত্তজ মহাশয় শুনিয়াই আনন্দিত হইলেন—"এখনি যাও, এখনি গিয়ে কাজটা গ্রহণ কর।" মাতৃদেবীও শুনিবামাত্র আনন্দিত হইয়া উঠিলেন—"কৃপাকে এনে অবধি চিন্তিত ছিলাম, আজ ভগবান আমার চিন্তা দূর করলেন; নেও কাজটা নেও, বাবুটী তোমাকে বড় ভালবাসেন; তাঁর কাছে কাজ করে সুখী হবে।"

মহেশ তৎপর দিন আসিয়া কাজটী লইলেন; এবং সেই দিনই স্কুলের কর্ম্মত্যাগ করিয়া পত্র লিখিলেন। স্কুলের দ্বিতীয় শিক্ষক কাজে বসিতে কয়েক দিন বিলম্ব হইল। মহেশ আপনার এক যুবক বন্ধুকে সে কাজে বসাইয়া দিলেন এবং নিজে মিত্রজ মহাশয়ের কাজে বসিলেন। মিত্রজ মহাশয় দেখিতে লাগিলেন—মহেশ সকল দিকেই দক্ষ। একদিকে যেমন নিজে সাধু সদাশয়, অপর দিকে তেমনি লোকের দুষ্টামি বেশ বুঝিতে পারে; লোকে ঠকাইতে পারে না; যে কাজে যায় মন দিয়া করে, শ্রমকে শ্রম জ্ঞান করে না, কাজ শেষ না করিয়া বিশ্রাম করিতে জানে না; হিসাব পত্র নিমেষের মধ্যে ঠিক করিয়া দেয়; চিঠি পত্র ত্বরিত লিখিয়া দেয়;—তাঁহার সকলদিকেই সাহায্য হইতে লাগিল।

কয়েকদিন পরেই মিত্রজ মহাশয় মহেশকে বলিলেন—"ওহে, তুমি কি ঘোড়া চড়তে পার?"

মহেশ। সে কথা কেন বলেন? কলকেতার স্কুলের ছুটীর সময় ঘরে এসে পাড়ার ছেলেদের সঙ্গে ডাংপিটেম করে বেড়াতাম; অপরাপর খেলার মধ্যে ষাঁড়চড়া একটা খেলা ছিল! ষাঁড়ের পিঠে বসলেই ছেলেরা লেজ মলে দিত; ষাঁড় উর্দ্ধশ্বাসে ছুটত; এরূপ অবস্থায় প্রায় সকল ছেলেই পড়ে যেত, কিন্তু আমি পড়তাম না। একবার একজন ব্যবসায়ী লোক কলকেতায় জিনিসপত্র নে যাবার জন্যে একটা ঘোড়া

আনলো। আর কোথায় যায়! আমরা তাকে কিছু কিছু দিয়ে ঘোড়ায় চড়বার বন্দোবস্ত করলাম। সকলের চেয়ে আমি ভাল ঘোড়া চড়তাম। এইরূপে ঘোড়াচড়া অভ্যাস হয়েছে!

মিত্রজ মহাশয়। (হাসিয়া) তোমার সবই অদ্ভুত! এর মধ্যে ঘোড়া চড়া অভ্যাসও করে রেখেছ! আর এই ষাঁড়চড়া ব্যাপারটা শুনে হাসি পাচ্চে; এ বুদ্ধি কে যুগিয়েছিল?

মহেশ। (সলজ্জ ভাবে) আজ্ঞে, তাও আমার কর্ম্ম। একদিন এক আম বাগানে আমরা আম পাড়তে গিয়েছিলাম, সেখানে একটা প্রকাণ্ড ধর্ম্মের ষাঁড় দেখতে পেলাম। ছেলেরা বললে—"দেখ, কেমন সুন্দর ষাঁড়টা!" আমি বললাম—"বেশ হয়েছে! এস না, সকলে মহাদেব হই; শিব ষাঁড় চড়তেন, এসনা আমরাও ষাঁড় চড়ি!" অমনি সকলের উৎসাহ লেগে গেল, ষাঁড়চড়া আরম্ভ হলো!

মিত্রজ মহাশয়। তাহলে বাস্তবিকই তুমি খুব ডাংপিটে ছেলে ছিলে?

মহেশ। তা ছিলাম বৈ কি? কলকেতার ছুটীর সময় বাড়ীতে এসে মাকে অস্থির করে তুলতাম! একদল ছেলে সঙ্গে নিয়ে গাছে চড়া, পাখীর বাসা হতে বাচ্চা চুরি করা, ফল পাকুড় পাড়া, বিরোধী লোকের বাড়ীর পাশে রাত্রে নানা রকম জানোয়ারের ডাক ডেকে ভয় দেখান—এই সকল কাজে থাকতাম।

মিত্রজ মহাশয়। বটে, সে ডাংপিটেম গেল কি করে?

মহেশ। আজ্ঞে, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কাছে বসে। তাঁর এক ভাইএর সঙ্গে এক ক্লাসে পড়তাম; তার সঙ্গে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কাছে যেতাম; কি কথাই শুনতাম! কি দৃষ্টান্তই দেখতাম! ভাল কাজে কি উৎসাহই পেতাম! তিনি আমার মনকে ফিরিয়ে দিলেন। আমি

স্কুল ছেড়ে বাড়ীতে এসে মনে করলাম, সঙ্গের ছেলেদের নিয়ে দলবেঁধে ভাল কাজে লাগতে হবে। সেই অবধি পড়াশোনা আরম্ভ করলাম।

মিত্রজ মহাশয়। আমি শুনেছি গ্রামের অশেষ উপকার তোমরা করেছ। মেয়ে স্কুল তোমাদের করা, আত্মোন্নতি-সভা তোমাদের করা, বিধবা ফণ্ড তোমাদের করা ;—তোমরা গরীবদুঃখীর মাবাপ।

মহেশ। (সলজ্জ ভাবে) যত শোনেন তত নয় ; আপনি আমাকে ভালবাসেন বলে লোকে আপনার কাছে বাড়িয়ে বলে।

মিত্রজ মহাশয়। সে যা হোক, যে জন্যে ঘোড়া চড়ার কথাটা তুলেছি তা এই—অমুক অমুক জায়গায় গবর্ণমেণ্টের রাস্তা মেরামত হচ্চে ; অনেক দূর হেঁটে যাওয়া আসা কঠিন ; তোমাকে যদি একটা ঘোড়া দেওয়া যায়, তুমি গিয়ে তদারক করে আসতে পার ?

মহেশ। আচ্ছা দিন, আমি গিয়ে তদারক করে আসবো।

অতঃপর মহেশের জন্য একটা ঘোড়া আসিল ; মহেশ তাহাতে চড়িয়া নানা স্থানে ভ্রমণ করিতে আরম্ভ করিলেন ; বেচারার আর এক সংগ্রাম আরম্ভ হইল ; তাঁহাকে ডেপুটিবাবুর প্রিয়লোক জানিয়া, অনেক লোক গোপনে ঘুষ দিবার চেষ্টা করিতে লাগিল ; মহেশ ক্রুদ্ধ হইয়া সে-সকল প্রত্যাখ্যান করিতে লাগিলেন ; লোকে বুঝিয়া লইল মানুষটা কি রকম ; সে প্রলোভন চলিয়া গেল।

মহেশ প্রথম মাসের কর্ম্মের পরেই একদিন চল্লিশ টাকা বেতন লইয়া মাতৃসন্নিধানে আসিয়া মাতার চরণ বন্দনাপূর্ব্বক নিজের অবলম্বিত রীতি-অনুসারে তাঁহার চরণে সেই টাকা রাখিলেন। জননী ইতিপূর্ব্বেই, পনর টাকা বেতনের সময়, মহেশকে বাঁচাইবার জন্য পাড়ার এক জন হীনজাতীয় মানুষকে মাসিক দুই টাকা দিয়া নিযুক্ত করিয়াছিলেন ; সে প্রাতে আসিয়া গোয়াল পরিষ্কার করিয়া, ও উঠানটা ঝাড়দিয়া,

খড় কাটিয়া রাখিয়া যাইত; এবং একজন স্ত্রীলোককে মাসে একটাকা করিয়া দিতেন, সে আসিয়া ঘর গোবর দিয়া, বাসন মাজিয়া দিয়া যাইত। মহেশের নূতন বেতন চল্লিশ টাকা ও ব্রজনাথ দত্তের প্রদত্ত পাঁচ টাকা —এই পঁয়তাল্লিশ টাকা তাঁর হাতে আসাতে, তিনি নিশ্চিন্ত হইলেন। খাওয়া, পরা ও মাসিক তিন টাকা বেতনে একজন চাকর রাখিলেন; গোয়াল দেখা, গরু রাখা, উঠান, ঘর প্রভৃতি ঝাড়ু দেওয়া, উনান ধরাণ, দুধ জ্বাল দেওয়া, বাজার করা, ফাই-ফরমাজ খাটা প্রভৃতি তার কাজ হইল। মহেশ একেবারে গৃহকর্ম্ম হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিলেন। সকাল বিকাল কাজে বাহির হইতে হইত; অধিকাংশ দিন ঘোড়া চড়িয়া মিত্রজ মহাশয়ের কাজকর্ম্ম পরিদর্শন করিতে যাইতে হইত। যেদিন সেরূপ কোন কাজ না থাকিত, সেদিন মিত্রজ মহাশয়ের আফিসে বসিয়া হিসাব দেখা, খাতা পত্র ঠিক রাখা, চিঠি পত্র কাপি করা ও লেখা —এই সকল কাজ করিতে হইত। বৈকালে গিয়া মিত্রজ মহাশয়কে আবশ্যক মত আইন টাইন পড়িয়া শুনাইতেন; কাজকর্ম্মের বিষয়ে পরামর্শ করিতেন। মিত্রজ মহাশয় অনুভব করিতে লাগিলেন, মহেশ যেন তাঁর দক্ষিণহস্তের ন্যায়।

এদিকে মহেশের জীবনে আর এক পরিবর্ত্তন উপস্থিত। ক্ষীরদা আর দূরে নয়; মহেশ কৃপাকে রাত্রিকালে জননীর ক্রোড়ে দিয়া, ক্ষীরদাকে নিজের নিকটে লইয়াছেন। তিনি সকাল বিকাল আফিসের কাজে যান, দুপুর বেলা ঘরে থাকেন; সুতরাং সন্ধ্যার পর যে ক্ষীরদাকে পড়াইতেন, সেটা রহিত করিয়া দুপুর বেলা আহারের পর পড়াইতে আরম্ভ করিয়াছেন; রাত্রিটা নিজের পাঠের জন্য রাখিয়াছেন। দুপুর বেলা আহারের পর মহেশ একটু বিশ্রাম করেন; তখন ক্ষীরদা সেই ঘরে আসিয়া খাতাপত্র লইয়া অঙ্ক কষিতে ও পড়িতে বসিয়া যান।

মহেশ উঠিলে তাঁহার কাছে কিয়ৎক্ষণ পড়েন; তৎপরে শ্বাশুড়ী বিশ্রাম করিয়া উঠিবামাত্র তাঁর ঘরে গিয়া তাঁহাকে রামায়ণ মহাভারত প্রভৃতি পড়িয়া শোনান; তৎপরে বৈকালে গৃহকার্য্যে প্রবৃত্ত হন; এইরূপে তাঁর ও মহেশের জীবন ঘড়ির কাঁটার মত বাঁধা হইয়া চলিতে লাগিল। মিত্রজ মহাশয় জ্ঞানানুরাগী মানুষ, তাঁহার সংশ্রবে আসাতে মহেশের জ্ঞানানুরাগ অতিশয় বাড়িয়া গেল। রাত্রে পাঠে বসিলে এক একদিন এমন তন্ময় হইয়া যান যে, ঘণ্টার পর ঘণ্টা কোথা দিয়া যায় যেন টের পান না। অনেকদিন ক্ষীরদা উঠিয়া বাতি নিভাইয়া দেন; এবং তাহা লইয়া দুইজনে ঝগড়া হয়।

এত কাজের মধ্যেও কৃপার প্রতি মহেশের কি মনোযোগ তাহা দেখিলে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। তাহাকে ত মেয়ে-স্কুলে দিয়াছেন, সেখানে সে কিরূপ পড়িতেছে, তার প্রতি ত দৃষ্টি আছেই; তারপর সে মেয়েটা কাঁদুনে: মাতার মৃত্যুর পর মাসীর ক্রোড়ে আসিয়া আদর যত্ন সকলি পাইতেছে, কিন্তু তথাপি লুকাইয়া লুকাইয়া কাঁদে। ক্ষীরদা তার পাছে পাছে সর্ব্বদাই আছেন; সেই কান্না ক্ষীরদার চোখে পড়ে। মহেশ সেই কথা শুনিয়া কৃপার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখেন। পাল পার্ব্বণে তাকে ও ধুনিয়াকে সঙ্গে লইয়া বাজারে যান; বৈকালে তাহাকে সঙ্গে করিয়া বন্ধুবান্ধবদের বাড়ীতে বেড়াইতে যান; কোনও একটা আমোদ আহ্লাদের ব্যাপার হইলেই সেখানে লইয়া যান; এটা ওটা খাইতে দেন; এবং সন্ধ্যার পর বাড়ীতে আসিয়া তাহাকে ও ক্ষীরদাকে লইয়া হাস্য, পরিহাস ও গল্প প্রভৃতি করেন। কৃপা ক্রমে প্রসন্ন হইয়া উঠিতেছে; বড়দার উপরে ভক্তি ও ভালবাসা বাড়িতেছে।

সংসারের কাজকর্ম্ম এক প্রকার চলিতেছে, ইতিমধ্যে সংবাদ আসিল যে, ক্ষীরদার পিতা মধুসূদন ন্যায়রত্ন মহাশয় গুরুতর পীড়িত; ভ্রাতারা

কলিকাতায় গিয়া তাঁহাকে গোবিন্দপুরে আনিয়াছেন। ক্ষীরদাকে লইবার জন্য লোক আনিয়া উপস্থিত; তাঁহাকে এক মাসের জন্য লইয়া যাইবে। এই সংবাদে মহাসমস্যা উপস্থিত হইল;—ক্ষীরদা গেলে সংসার চলে কিরূপে? মহেশ মহাচিন্তার মধ্যে পড়িলেন;—মাকে কে দেখে, কৃপাকে কে দেখে, সংসার কে চালায়? অথচ, ক্ষীরদার যে অবিলম্বে যাত্রা করা উচিত সে বিষয়েও সন্দেহ নাই। ক্ষীরদারও প্রাণে সংগ্রাম উপস্থিত :—শাশুড়ীর প্রতি তাঁর গভীর শ্রদ্ধা ও ভালবাসা তাঁহাকে ছাড়িয়া যাইতে ইচ্ছা করে না; মহেশ ও কৃপাকে কে দেখিবে, সেও একটা ভাবনার বিষয়; অথচ, পিতাকে দেখিতে না গেলেও নয়। যাইতে হইবে এই চিন্তাতে এক ঘণ্টার মধ্যে ক্ষীরদার মুখ শুকাইয়া গেল! যেদিন প্রাতে এই সংবাদ আসিল, সেই দুপুর বেলা শাশুড়ীর ঘরে রামায়ণ পড়িতে গিয়া ক্ষীরদা তাঁহাকে বলিলেন—"মা, কি করি বলুন ত; আপনাকে ছেড়ে আমার যেতে ইচ্ছে করছে না; তারপর উনি কাজে এত ব্যস্ত, ওঁকেই বা কে দেখে?"

শাশুড়ী। বল কি বৌ, ন্যায়রত্ন মশায়ের ব্যারামটা বড় কঠিন মনে হচ্চে; তাঁকে কলকেতা থেকে নিয়ে এসেছে, এমন সময় তুমি যাবে না তা কি হয়! যাও, এক মাসের জন্যে যাও; দুবছরের বেশী হলো এসেছ; একবার যাবার সময়ও ত হয়েছে। আমাদের জন্যে ভেব না, কৃপাকে নিয়ে আমি চালিয়ে নেব।

তারপর শাশুড়ী বৌ কথাবার্ত্তা হইয়া স্থির হইল, যে ক্ষীরদা তৎপর দিন প্রাতে আহারান্তে এক মাসের জন্য যাত্রা করিবেন। ক্ষীরদা মহেশকে সেই সংবাদ দিলেন। মহেশ পূর্ব্ব হইতেই মহাচিন্তিত ছিলেন; মনে মনে একটা উপায় স্থির করিয়াছেন, তাহার কি হইতে পারে তাহা দেখিবার জন্য বাহির হইলেন। সে উপায়টা এই :—ক্ষীরদার পিতৃগৃহে

যাওয়া অনিবার্য্য দেখিয়া, মহেশ মনে মনে ভাবিলেন—"একবার নিস্তারিণী দিদীর সঙ্গে পরামর্শ করি।" এই ভাবিয়া সেই দিন মিত্রজ মহাশয়ের ভবনে যাইবার পূর্ব্বে নিস্তারিণীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলেন। তিনি গিয়া পিসা মহাশয় ও পিসীমাকে ক্ষীরদার পিতার পীড়ার কথা শুনাইলেন; এবং তৎপরে নিস্তারিণীদিদীকে নিজেদের ভবনে আনিয়া রাখিবার প্রস্তাব করিলেন। প্রস্তাব শুনিয়া তাঁহার পিসী জগত্তারিণী দেবী বলিয়া উঠিলেন—"সে ত বেশ, নিস্তারিণীর ত এখানে তেমন কিছু কাজ নেই; যাক না তোমাদের বাড়ী; তোমার মার সেবা করুক।" তর্করত্ন মহাশয়ও সেই প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। নিস্তারিণীর ত কথাই নাই; তিনি মহেশের গোঁড়া, ও তাঁর ভাবাপন্ন; মহেশের কাছে থাকিতে পাইবেন, এই প্রস্তাবে তাঁর মন নাচিয়া উঠিল। তিনি তৎক্ষণাৎ একমাসের জন্য মাতুলালয়ে গিয়া থাকিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন; বলিলেন—"চল, চল, এখনি তোমার সঙ্গে যাই।"

মহেশ। না, এত তাড়াতাড়ির প্রয়োজন কি? ক্ষীরদা কাল প্রাতে আহারের পর যাইবে। তুমি আজকার রাতটা থাক; পিসীমার সঙ্গে পরামর্শ কর; আমি কাল ভোরে এসে নিয়ে যাব। আমি বাড়ীতে কিছু বলবো না; মাকেও জানতে দেব না; তুমি ফুট করে গিয়ে উপস্থিত হবে; তাই নিয়ে হাসাহাসি ও আনন্দ হবে, সেই বেশ।

নিস্তারিণী। আচ্ছা, তাই ভাল।

তারপর নিস্তারিণী নিজের মায়ের সঙ্গে পরামর্শ করিলেন। জগত্তারিণীদেবী স্বর্গগত বিদ্যালঙ্কার মহাশয়ের একমাত্র কনিষ্ঠা ভগিনী; জগদ্ধাত্রীদেবীর প্রতি তাঁর অকপট শ্রদ্ধা ও ভালবাসা; তিনি বলিলেন,—"দাদা চলে যাওয়ার পর হতে বৌদিদী একেবারে কাজের

বার হয়ে গিয়েছে ; চির বিষাদের মধ্যে পড়েছে ; তুই গিয়ে তার মনের ভাবটা দূর করবার চেষ্টা কর ; এক মাস থেকে আয়।"

পরদিন প্রত্যূষে মহেশ আসিয়া উপস্থিত। আসিয়া দেখেন নিস্তারিণী যেন পা বাড়াইয়া রহিয়াছেন। মহেশ পিসীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া, তাঁর পদধূলি লইয়া, নিস্তারিণীর সহিত স্বীয় ভবনাভিমুখে যাত্রা করিলেন। নিজেদের বাড়ীর দ্বারে গিয়া নিস্তারিণীকে বলিলেন—"তুমি একটু দাঁড়াও, তুমি যে আসবে সে কথা আমি কারুকে বলি নি, আমি গিয়ে একটু মজা করি, তারপর এসে তোমাকে নিয়ে যাব ; একটা হাসাহাসি পড়ে যাবে।" এই বলিয়া নিস্তারিণীকে একটু অন্তরালে রাখিয়া, বাড়ীর মধ্যে গিয়া দেখিলেন, মাতা ও ক্ষীরদা দুই জনে একত্রে কি কাজ করিতেছেন ; দেখিয়া জননীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—"দেখলে ত মা, পরের মেয়ে ঘরে এনে আপনার করে রাখা কত কঠিন, একদিন ছেড়ে দিতেই হয়।"

ক্ষীরদা। বাঃ, আমি ত যেতে চাচ্ছিলাম না, তোমরাই ত পাঠাচ্ছ।

মহেশ। দেখ মা ক্ষীরদা যাবে বলে আমি ম্লান হয়ে পড়ে পড়ে ভাবছিলাম ; এমন সময় এক দেবী এসে বললেন—তুমি ভাবছ কি ? আমি তোমাদের বাড়ীতে থাক্‌ব, তোমার মাকে দেখ্‌ব।

জননী। (হাসিয়া) সে কোন দেবী ?

ক্ষীরদা। তুমি ত দেবী যেথায় সেথায় দেখ ! এ দেবী কি বৈকুণ্ঠ-বাসিনী না ভবধামবাসিনী ?

মহেশ। দেখলেই জানতে পারবে।

এই বলিয়া দ্বার হইতে নিস্তারিণীকে সঙ্গে করিয়া বাড়ীর মধ্যে আসিলেন ; অমনি হাসাহাসি পড়িয়া গেল।

জননী। ওমা এযে দেখি নিস্তারিণী! যেমন নাম তেমনি কাজ; আমাদের নিস্তারের জন্য বুঝি এসেছ? দেবীই ত বটে! ও কি একমাস এখানে থাকৃতে পারবে?

নিস্তারিণী। হাঁ মামীমা, একমাসের জন্যই এসেছি; ক্ষীরদা বাপের বাড়ী থেকে না ফেরা পর্য্যন্ত থাকব; বাড়ীতে আমার ত কাজ কর্ম্ম নাই, তবু একটা কাজে থাক্‌ব।

জগদ্ধাত্রী। আচ্ছা তবে থাক, আমার মাথার বোঝা নেমে গেল।

ক্ষীরদা মনে মনে ভাবলেন, নিস্তারিণী দেবীই বটে; কি সুন্দর মেয়ে! যেমন গৌরবর্ণ, তেমনি শ্রী! কি সুন্দর মুখ, কি সুন্দর দুটি বড় বড় চোখ! এমন মেয়ে বালবিধবা হয়ে রয়েছে, কি দুঃখের বিষয়! উনি যে বিধবাবিবাহের এত পক্ষ তা বোধ হয় এঁকে দেখে।

নিস্তারিণী মাতুলালয়ে প্রতিষ্ঠিত হইলেন; মামীকে রান্নাঘর হইতে বাহির করিয়া দিলেন; এবং নিজে রন্ধনকার্য্যে ব্যাপৃত হইলেন। মহেশ কর্ম্মস্থান হইতে আসিয়া দেখেন নিস্তারিণী কোমর বাঁধিয়া রন্ধন কার্য্যে নিযুক্ত আছেন। তিনি গিয়া রান্নাঘরের দ্বারে দাঁড়াইলেন;—"কি নিস্তারিণী দিদি! তুমি যে এসেই কোমর বেঁধেছ; দেখ তোমাকে কি কাজের মধ্যে ফেললাম।"

নিস্তারিণী। (হাসিয়া) ভারি ত কাজ, দু তিন জনের জন্য রাঁধা! মামীমা ঠাকুর দেবতার নাম করুন, আর কি করতে হবে আমাকে বলে দিন, সেই ত ভাল; তুমি আমাকে এনে বড় ভাল কাজ করেছ; আমি ভারি খুসী হয়েছি; আমি তোমার কাছে পড়বো; আমাকে পড়াবে ত?

মহেশ। পড়বে বৈ কি? ক্ষীরদা দুপর বেলা আমার কাছে

পড়তেন, সেই দুপর বেলা তুমি পড়বে। তুমি ত গোপনে গোপনে পড়তে শিখেছ; মাকে কিন্তু রামায়ণ পড়ে শোনাতে হবে।

নিস্তারিণী। বেশ, তা পড়ে শোনাব।

এদিকে ক্ষীরদা তাড়াতাড়ি খাইয়া পিতৃগৃহে যাত্রা করিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন; এবং বাপের বাড়ী হইতে যে লোক আসিয়াছিল তাহাকে খাওয়াইয়া লইলেন। ক্রমে যাত্রা করিবার সময় আসিল। ডুলি প্রস্তুত; ক্ষীরদা গলবস্ত্রে শ্বশ্রূদেবীর পদধূলি লইয়া কাঁদিতে লাগিলেন :—"মা আপনাকে ফেলে যাচ্ছি, মন সরচে না।"

জগদ্ধাত্রী। কেঁদনা মা, আর ভাবনা কি, নিস্তারিণী আছে। ভগবান করুন, তুমি গিয়ে ন্যায়রত্ন মশাইকে ভাল দেখ।

নিস্তারিণী রান্নাঘর হইতে বাহির হইয়া ডুলির কাছে দাঁড়াইয়াছেন; ক্ষীরদা ডুলিতে প্রবেশের পূর্ব্বে তাঁর কণ্ঠালিঙ্গন পূর্ব্বক তাঁর বুকে মাথা রাখিয়া বলিলেন,—"ঠাকুরঝি, তুমি কি ভাল! আমাকে নির্ভাবনা করবার জন্য এলে; তোমার হাতে ঠাক্‌রুণকে আর ওঁকে রেখে চললাম; আবার একমাস পরে আস্‌ব।"

নিস্তারিণী। ভগবান করুন, তুমি গিয়ে তোমার বাপকে ভাল দেখ; তুমি ভেব না; একমাস আমি এখানে রইলাম।

তৎপরে ক্ষীরদা ডুলিতে উঠিয়া যাত্রা করিলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

ক্ষীরদা একমাসের মধ্যে আসিবেন বলিয়া গিয়াছিলেন, কিন্তু আসিতে পারিলেন না; ন্যায়রত্ন মহাশয় কি জ্বর লইয়া কলিকাতা হইতে আসিয়াছেন, তাহা ছাড়িয়াও ছাড়ে না। ম্যালেরিয়া জ্বর, কি পিত্ত-বিকার-জনিত জ্বর, তাহা বোঝা যাইতেছে না। তিনি ডাক্তারি ঔষধ খান না, সুতরাং কবিরাজীতে যতদূর হয় করা হইতেছে। আসিবার সময় কলিকাতার একজন প্রসিদ্ধ কবিরাজ দেখিয়া ঔষধ ও পথ্যের ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন; গ্রামের কবিরাজ তদনুসারে চিকিৎসা করিতেছেন; কিছুতেই কিছু হইতেছে না; সুতরাং ভ্রাতৃগণ ও পুত্র-কন্যারা সকলে আবদ্ধ আছেন।

ক্ষীরদার মন হরিরামপুরে পড়িয়া রহিয়াছে। থাকিলে কি হয়, পিতাকে এ অবস্থাতে ফেলিয়া কিরূপে আসেন? তাই প্রায় দুইমাস অতীত হইল, ক্ষীরদার আসিবার নাম নাই। এদিকে নিস্তারিণী এক-মাসের জন্য আসিয়া যেন শিকড় গাড়িয়া বসিয়া গিয়াছেন। মুখে বলিয়াছেন,—"থাক্‌, আমি না হয় আর কিছুদিন থাক্‌লাম, তার আর কি? ক্ষীরদা আসুক, তারপর আমি যাব।" কিন্তু ভিতরকার কথাটা এই—তিনি মামার বাড়ীতে যে আদর যত্ন ও কাজ করিবার সুবিধা পাইয়া-ছেন, তাহা পিত্রালয়ে পান না; সুতরাং তাঁর এখান হইতে যাইতে ইচ্ছা হয় না। তার উপর মহেশের নিকট বাস করা, সেও একটা কথা। মহেশ তাঁকে দুপর বেলা পড়ান; এটা ওটা আনিয়া দেন; এবং অবাধে তাঁর কাণে আপনার খেয়াল সব ঢালেন। সন্ধ্যার পর মাতুলানী শয়ন করিলে

নিস্তারিণী রূপাকে লইয়া মহেশের ঘরে আসিয়া বসেন, তাঁহার গল্প গাছা শোনেন, এবং প্রাণ ভরিয়া হাসেন; এ সকল ত তাঁর পিত্রালয়ে হয় না। মহেশ প্রতিদিন যা কাজ করেন, যা কিছু দেখেন বা শোনেন, তাহা নিস্তারিণীর কাণে ঢালেন; সেও একটা আনন্দের বিষয়। অতএব নিস্তারিণী ক্ষীরদার ফেরা পর্য্যন্ত থাকিবেন এইরূপ স্থির রহিল। নিস্তারিণীর মাতা জগত্তারিণীদেবীও ইহাতে সম্মতি দিলেন।

ক্রমে তিন চারিমাস অতীত হইয়া গেল; ন্যায়রত্ন মহাশয় আর শয্যা হইতে উঠেন না; ক্ষীরদারও দেখা নাই। ইতিমধ্যে আর এক ঘটনা উপস্থিত। মহেশের মনীব মিত্রজ মহাশয়ের প্রতি উপর হইতে আদেশ আসিল, যে তাঁহাকে ত্বরায় গিয়া যশোর জেলার উত্তরভাগের এক গ্রামে বসিতে হইবে। তিনি মহেশকে সহায় করিয়া নিরুদ্বেগে কাজ চালাইতেছিলেন, এখন তাঁর সহায় কে হয়? তিনি মহেশকে মাসে পঁচাত্তর টাকা বেতন ও নিজ ভবনে বাস ও থাওয়া দিতে প্রতিশ্রুত হইয়া তাঁহার সঙ্গে যাইবার জন্য অনুরোধ করিলেন। মহেশের পক্ষে উভয় সংকট উপস্থিত। একদিকে মিত্রজ মহাশয়ের সঙ্গ ত্যাগ করিতে ইচ্ছা হয় না; পঁচাত্তর টাকা বেতনটা কিছুই নহে; সেই জ্ঞানানুরাগী, আত্মোন্নতি-পরায়ণ মানুষের সঙ্গে থাকাই পরম লাভ। অপরদিকে পরিবার পরিজনকে দেখে কে? তিনি যে সকল দেশহিতকর কার্য্যের সৃষ্টিকর্ত্তা সে-সকল চালায় কে? তিনি প্রথমদিনে মিত্রজ মহাশয়ের কথার উত্তর দিলেন না; সন্ধ্যার সময় ব্রজনাথ দত্ত মহাশয়ের নিকট গিয়া সেই প্রসঙ্গ উপস্থিত করিলেন। তিনি শুনিবামাত্র বলিলেন— "যাও, এই তোমার ভবিষ্যৎ উন্নতির পথ খোলা হচ্চে। তোমাদের মেয়ে-স্কুলের পণ্ডিতকে সন্ধ্যার সময় আমার কাছে এসে সংস্কৃত পড়বার জন্য দিয়ে যাও; আমি তাকে মাসে পাঁচ টাকা করে দেব; সে বেচারার

কিছু আয় বাড়বে। মেয়ে-স্কুল ও আত্মোন্নতি সভা ত আমার বাড়ীতেই রইল, আমি এ দুটি দেখব; তোমার বন্ধুদের সাহায্যে কাজ চালাব। তারপর তোমার একটি বন্ধুকে তোমাদের চণ্ডীমণ্ডপের পাশের ঘরে শোবার জন্য অনুরোধ করে বসিয়ে দিয়ে যাও। তোমার পিস্‌তুত ভগিনী যে তোমার মাকে দেখছেন, তাঁকে আরও কিছুদিনের জন্য রেখে যাও; তোমার স্ত্রী পিত্রালয় হতে এলে তিনি যাবেন।"

ব্রজনাথ দত্ত যেন মন্ত্রদাতা গুরু; তিনি সর্ব্বদা পরামর্শ দিতেছেন; এবং মহেশের কাঁধের বোঝা নিজের কাঁধে লইতেছেন। তিনি যাহা উপদেশ দিলেন, তাহাই শিরোধার্য্য করিয়া মহেশ তদনুরূপ বন্দোবস্ত করিবার জন্য বাড়ীতে আসিলেন। রাত্রে নিস্তারিণীর সহিত অনেকক্ষণ কথা হইল; তিনিও ব্রজনাথ দত্ত মহাশয়ের পরামর্শ অনুসারে কাজ করা কর্ত্তব্য মনে করিলেন; বলিলেন—"যাও, তুমি যাও, মাসিক পঁচাত্তর টাকার কর্ম্মটা ছেড় না। আমার মার কাছে ত বিশেষ কোনও কাজ নাই, আমি মামীমার কাছেই থাকব। এখন এই ব্যবস্থা ত চলুক, ক্ষীরদা এলে যা ভাল বোধ হয় করা যাবে। আর তোমাদের পাড়ার ওই নগেন ছেলেটি তোমাকে বড় ভালবাসে; মামীমাকে ভক্তি শ্রদ্ধা করে; সে রাত্রে এসে বাহিরের ঘরে শুতে পারে; তাকে বলে যাও; ছেলেটি খুব ভাল; আমাদের উপর খুব ভালবাসা আছে; তার বাড়ীতেও জায়গার টানাটানি; শোবার একটা জায়গা পায় না; পেলে তারও বড় ভাল লাগবে; পড়ে বাঁচবে।"

মহেশ। দেখ নিস্তারিণীদিদি! নগেনকে আমাদের চণ্ডীমণ্ডপের পাশের ঘরে শুতে দেবার কথা যে আগে আমার মনে যোগায় নি, সেজন্য লজ্জিত হচ্ছি। ছেলেটা বড় ভাল, পড়াশোনায় বিশেষ অনুরাগ, সে যদি আমাদের ঘরে থাকৃত, পড়ে ও ঘুমিয়ে বাঁচত। যা হোক্, বেটা

আগে হয়নি সেটা এখন হোক্; সে ত তোমার ছোট ভাইএর মত; তোমার ডান হাতের দোয়ার হয়ে থাক্‌বে; এটা-ওটা করে তোমার —সাহায্য করবে।

সেদিন শয্যাতে শয়ন করিবার পূর্ব্বে গৃহস্থালীর সমুদয় বিষয় স্থির হইল। বলিতে গেলে নিস্তারিণী কিছুদিনের জন্য মহেশের ও ক্ষীরদার অভিভাবিকা হইয়া পরিবার চালাইবার ভার লইলেন।

তৎপরদিন জননী নিদ্রা হইতে উঠিলেই মহেশ তাঁর চরণ বন্দনা করিয়া তাঁকে পঁচাত্তর টাকা বেতনের ও দেশত্যাগের সমাচার দিলেন। পঁচাত্তর টাকা বেতনের নামে তাঁর আনন্দ হইল বটে, কিন্তু প্রিয় পুত্রের সহিত বিচ্ছেদ ঘটিবে ইহা তাঁহার প্রাণে অসহ্য বোধ হইতে লাগিল; বলিলেন—"মহেশ, তুমি কাছে না থাকলে আমি কি করে থাক্‌ব ?"

মহেশ। মা, বেটা-ছেলে কি সর্ব্বদা ঘরে থাকে ? কাজকর্ম্মের জন্য ত দূরে যায়; এইত গিরিশ গিয়েছে, তুমি ত সয়ে আছ।

জননী। গিরিশের যাওয়া এক কথা, আর তোমার যাওয়া আর এক কথা। তুমি যে আমার অন্ধের নড়ি। এই বলিয়া বস্ত্রাঞ্চলে চক্ষু মুছিতে লাগিলেন।

মহেশ। মা, সর্ব্বদা চিঠিপত্র পাবে; মাঝে মাঝে এসে দেখে যাব; তারপর নিস্তারিণীদিদী রইলেন; উনি ত তোমাকে মেয়ের মত সেবা করেন।

জননী। সে কথা আর বলো না; মেয়েতে মায়ের এত সেবা করে না; ও বেঁচে থাক; ও ছিল বলে দুঃখকষ্টকে দুঃখকষ্ট বলে মনেই হচ্চে না।

ইহার পরে মহেশ মিত্রজ মহাশয়ের নিকট যাইবার পথে ব্রজনাথ দত্তকে এই সংবাদ দিলেন; এবং মিত্রজ মহাশয়ের নিকট গিয়া নূতন

মহেশের যাওয়া স্থির হইলে কাজ বাড়িয়া গেল। তিনি গোলাতে প্রবেশ করিয়া দেখিতে লাগিলেন চাল, ডাল, ঘি, তেল, নুন, প্রভৃতি কতদিনের আছে। দেখিলেন পৈত্রিক জমি হইতে প্রাপ্ত যে ধান আছে, তাহাতে ৫।৬ মাস চলিবার কথা। নিস্তারিণী বলিলেন—"তুমি ভেব না, আমরা ঐ ধান ভেনে নেব।" মহেশ দেখিলেন, ডালও প্রায় ৪।৫ মাসের মত আছে; তারপর ঘি, তেল, প্রভৃতি কিনিয়া আনিলেন; আনিয়া গোলাতে পূরিলেন। গোয়ালঘরের পাশে ধান ভানিবার একটা চালা আছে; তাহার এক পাশে রাশীকৃত কাঠ আনিয়া সঞ্চয় করা হইল। বাহিরবাড়ী চণ্ডীমণ্ডপের পাশের একটি চালাঘরে চাকর ক্ষুদিরাম শয়ন করে; তাহার উপরে বাড়ী ঘর দোর ঠিক রাখিবার ভার দেওয়া হইল। তৎপরে মহেশ পাড়ার নগেন নামক ছেলেটীর বাড়ীতে গিয়া, তার পিতামাতার সহিত কথাবার্ত্তা কহিয়া, চণ্ডীমণ্ডপের পাশের ঘরে তার রাত্রে শুইবার ব্যবস্থা করিলেন; এবং তার পড়িবার আলোর ব্যয় নিজে দিবেন এই ব্যবস্থা করিলেন। মহেশকে গ্রামের ছেলেরা বড় ভালবাসে; নগেন এই প্রস্তাবে আনন্দের সহিত সম্মত হইল। তৎ-পরে মহেশ তাহাকে ডাকিয়া আনিয়া মাতাঠাকুরাণী ও নিস্তারিণীদিদীর সমক্ষে সেই কথা স্থির করিলেন। নিস্তারিণী নগেনকে বলিলেন—"দেখ ভাই নগেন, তুমি বড় ভাল ছেলে; তুমি আমাদের ভার নিয়ে থাকবে, বড় আনন্দের কথা; তুমি লাজ সরম করবে না; নিজের লোকের মত আমাদের সঙ্গে থাক্‌বে।" সর্ব্বশেষে মহেশ পিসীমাতা জগত্তারিণীর নিকট গেলেন; তাঁহাদের পদধূলি লইয়া বিদায় লইলেন; এবং নিস্তারিণী ক্ষীরদার ফেরা পর্য্যন্ত থাকিবেন এইরূপ বন্দোবস্ত করিয়া আসিলেন।

ক্রমে মহেশের যাত্রার দিন নিকটে আসিল। যাত্রার দিন যতই সন্নিকট হইতে লাগিল, ততই জননীর চিন্তাতে মহেশের প্রাণ বিষণ্ণ হইতে

লাগিল ; ভাবিতে লাগিলেন মাকে কি করিয়া ছাড়িয়া যান। পিতার মৃত্যুর পর জননী যেন স্বাবলম্বনের শক্তি হারাইয়াছেন, কেবল ধর্ম্ম কর্ম্ম লইয়া আছেন। তাঁহার অনুপস্থিতিকালে মা কিরূপে চালাইবেন ? অবশ্য প্রধান অবলম্বন নিস্তারিণীদিদী ; ঈশ্বরকৃপায় মাকে দেখিবার একজন লোক পাওয়া গিয়াছে, এই একটা আশার কথা। তৎপরে কৃপাও মার অঞ্চলের নিধি। মহেশ কৃপাকে নির্জ্জনে ডাকিয়া অনেক উপদেশ দিলেন ; বলিলেন—"দেখ কৃপা ! তারা চলে যাওয়াতে ও মাসীমার মৃত্যু হওয়াতে মার কোলে থাকবার জন্য তোমাকে এনেছি ; তোমার ত মা বাপ নাই ; আমার মাই তোমার মা। লক্ষী বোন ! মার দিকে চোখ রাখবে ; যখনি যা করতে বলবেন তখনি তা করবে ; মার খাওয়া দাওয়া দেখবে ; মার হাতের কাজ করে দেবে ; তুমি ক্রমে বড় হলে খুব ভালো মেয়ে হবে ; জান ত আমি তোমাকে খুব ভালবাসি ; আরও ভালবাসব ; তোমার জন্য কত ভাল ভাল জিনিষ আনব বুঝলে ত ?" তিনি ছাড়িয়া যাইতেছেন বলিয়া কৃপা মুখ ফিরাইয়া কাঁদিতে লাগিল। মহেশ কৃপাকে ধরিয়া কোলে বসাইলেন ; তার গলা জড়াইয়া বলিতে লাগিলেন, "কৃপা ! বোন ! লক্ষী মেয়ে ! তোমার চক্ষের জল কি যাবে না ! আমার মাই তোমার মা ; আমি তোমার দাদা ; তোমাকে কি দুদিনের জন্য এনেছি ! তুমি চিরদিনের জন্য আমাদের কাছে এসেছ। এখন আমি একা বিদেশে যাচ্ছি, ক্রমে আমার বড় কর্ম্ম হবে, তখন মাকে ও ক্ষীরদাকে নিয়ে যাব ; তখন তুমিও আমাদের সঙ্গে যাবে ; মাকে ভালবাস ; মার সেবা কর ; মনের সুখে থাক।"

এই বলিয়া কৃপার নিকট বিদায় লইয়া, জননীর চরণ বন্দনা করিয়া, মহেশ নিস্তারিণীর হাতে ধরিয়া দুই চারি কথা বলিতে গিয়া আর

বলিতে পারিলেন না; "দিদি, দিদি, আমি চললাম" এই বলিয়া চক্ষের জলে ভাসিয়া বিদায় লইলেন। যাইবার সময় শুনিয়া গেলেন শ্বশুর-বাড়ীর লোকেরা মনে করিতেছে, ক্ষীরদা সসত্ত্বা। সেই চিন্তাটা প্রাণে লইয়া যাত্রা করিলেন।

কর্ম্মস্থানে গিয়া মহেশ মহাকাজের মধ্যে পড়িলেন। নদীয়া জেলার উত্তর হইতে যশোর জেলার উত্তরপ্রান্ত পর্য্যন্ত গবর্ণমেণ্টের একটি রাস্তা প্রস্তুত হইবার আয়োজন হইতেছিল। জমি সকল দেখা, মাপা, নদ নদী পরিদর্শন করা, কৃষক ও প্রজাদের সহিত জমির দাম ও খাজনা প্রভৃতি নির্দ্ধারণ করা, বিবাদ বিসম্বাদ ঘটিলে ঘোড়াতে চড়িয়া বিবাদস্থানে গিয়া বিবাদের মীমাংসা করিবার চেষ্টা করা প্রভৃতি কাজ পড়িয়া গেল। মহেশ প্রাতে অশ্বারোহণে বাহির হইতেন; দ্বিপ্রহর অতীত হইলে ঘরে ফিরিয়া স্নানাহার করিতেন; কিয়ৎক্ষণ বিশ্রামের পর আবার অশ্বারোহণে বাহির হইতেন; সন্ধ্যার সময় ফিরিতেন। এইরূপে কার্য্য চলিল। সেই সুদীর্ঘ রাস্তাটি প্রস্তুত করিতে যতগুলি মজুরের প্রয়োজন হইত, সে প্রদেশে তাহা মিলিত না; এজন্য মজুর-সংগ্রহের জন্য নানাস্থানে ভ্রমণ করিতে হইত। তৎপর রাত্রে আসিয়া মিত্রজ মহাশয়ের কাছে বসিয়া তাঁহার আদেশমত চিঠিপত্র লিখিতে হইত।

এইরূপে প্রায় তিনমাস কাজ চলিতেছে, এমন সময় একদিন প্রাতে ঐ বিভাগের কমিশনার সাহেব হঠাৎ আসিয়া উপস্থিত। সেদিন মিত্রজ মহাশয় কোনও একটি বিশেষ কাজের জন্য বাহিরে গিয়াছেন। সাহেব বোধ হয় কাজটা কিরূপ চলিতেছে দেখিবার জন্য আসিবার পূর্ব্বে সংবাদ দেন নাই। তিনি ঘোড়া চড়িয়া আসিয়াছেন; সেদিন মহেশ বাড়ীতে আছেন। কমিশনার সাহেবের ঘোড়া আসিয়া বাড়ীর

সম্মুখে দাঁড়াইলেই মহেশ গিয়া সাহেবকে সেলাম করিয়া বলিলেন যে, মিত্রজ মহাশয় কাজে বাহির হইয়াছেন; আফিসের কোন কাজের বিষয় যদি কিছু জানিবার ইচ্ছা থাকে, তিনি তাহা জানাইতে পারেন। সাহেব ঘোড়া হইতে নামিয়া আফিস ঘরে গিয়া বসিলেন; এবং এটা-ওটা জিজ্ঞাসা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। মহেশ সমুদয় সংবাদ দিতে লাগিলেন; এবং খাতাপত্র দেখাইতে লাগিলেন। সাহেব মহেশের লেখা চিঠিপত্র দেখিয়া ও তাঁহার ইংরাজী শুনিয়া বড়ই প্রীত হইলেন; জিজ্ঞাসা করিলেন—"বাবু, তুমি কত বেতনে এই কাজ করিতেছ?" মহেশ সমুদয় ভাঙ্গিয়া বলিলেন। তৎপরে সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন—"তুমি কি ঘোড়া চড়িতে জান?"

মহেশ। হাঁ জানি।

সাহেব। তবে ঘোড়া চড়ে আমার সঙ্গে চল; আমি কাজগুলো দেখতে চাই।

অশ্বারোহণে দুই জনে বাহির হইলেন। পরে তৎতৎ প্রদেশের কৃষিকার্য্য, প্রজাদের অবস্থা, বিবাদ বিসম্বাদ প্রভৃতি বিষয়ে অনেক কথা হইতে লাগিল। যে যে স্থানে কাজ চলিতেছে সেই সেই স্থানে গিয়া সাহেব বুঝিতে পারিলেন কিরূপ দক্ষতার সহিত কাজ চলিতেছে; তাঁহার মন অতিশয় প্রীত হইল। তাঁহারা ফিরিয়া আসিয়া দেখেন মিত্রজ মহাশয় বাড়ীতে ফিরিয়াছেন। সাহেব তাঁহাকে নির্জ্জনে ডাকিয়া বলিলেন;—"তোমার সহকারী ঐ মানুষটি বড় কাজের লোক; ওর চিঠি-পত্র দেখে আশ্চর্য্যবোধ হয়েছে; ইংরাজী কি সুন্দর লেখে! যে যে জায়গায় কাজ চল্‌ছে গিয়ে দেখলাম অতি সুন্দর কাজের ব্যবস্থা! কি সুন্দর ঘোড়া চড়বার রীতি! এ মানুষটাকে আমি একটা কাজের জন্ত চাই। নদীয়া জেলার উত্তরে, জরমানের জন্ত একজন ইন্‌কমট্যাক্সের

এসেসরের প্রয়োজন; ছয়মাসের জন্য তাকে চুয়াডাঙ্গাতে থাকতে হবে; দেড়শ টাকা মাহিনা, দুজন চাকর ও থাকবার একটা বাড়ী পাবে তুমি কি বল? এলোক কি সে কাজ করতে পারবে?"

মিত্রজ মহাশয় শুনিয়া আনন্দিত হইলেন; বলিলেন—খুব পারবে; এ বড় কাজের লোক; ওর আয়বৃদ্ধি হয়, তাহাতে আমার আনন্দ।

সাহেব তাহাই স্থির করিয়া গেলেন; এবং তৎপরদিনই নিয়োগপত্র প্রেরণ করিলেন। মহেশ ছয়মাসের জন্য চুয়াডাঙ্গাতে ইন্‌কমট্যাক্সের এসেসর হইয়া গেলেন। তাঁহার অতি কঠিন শ্রম আরম্ভ হইল। একদিকে গবর্ণমেণ্টের অধিকার রক্ষা করা, অপরদিকে প্রজাদিগের প্রকৃত অবস্থা অবগত হওয়া, কাহারও প্রতি কোনও অন্যায় অবিচার না হয় তাহা দেখা,—তিনি মহা সঙ্কটের মধ্যে পড়িয়া গেলেন। অপর এসেসরেরা যাহা কখনও করেন না, তাহা করিতে লাগিলেন; গ্রামে গ্রামে যাওয়া, লোকদিগকে বুঝাইবার চেষ্টা করা, সাক্ষীদিগকে ভাল করিয়া পরীক্ষা করা, পাড়াপড়্‌সীর নিকট লোকের প্রকৃত অবস্থা বিষয়ে সংবাদ লওয়া, প্রভৃতি চলিল। ইহার উপর প্রতি পদে পদে লোকের ঘুষ দিবার প্রবৃত্তিকে বাধা দিয়া চলিতে হইল। ক্রমে লোক বুঝিতে পারিল যে, ঘুষ দিবার চেষ্টা করিলে, তিনি তাহাদিগকে অধিক সন্দেহের চক্ষে দেখিবেন; তাহাদের উক্তির প্রতি সর্ব্বদা সন্দেহ করিবেন; তাহাদের কাগজপত্র তন্ন তন্ন করিয়া পরীক্ষা করিবেন; তাহাদিগকে অস্থির করিয়া তুলিবেন। এই সকল কারণে অল্প দিনের মধ্যে লোকের ঘুষ দিবার প্রবৃত্তি রহিত হইয়া গেল।

ওদিকে আর একটা কাজ আসিয়া উপস্থিত হইল। চুয়াডাঙ্গার কয়েক ক্রোশের মধ্যেই নীলকর সাহেবদের এক কুঠী আছে। সেখান হইতে সংবাদ আসিল যে, সাহেবরা জোর করিয়া প্রজাদিগকে নীল

বুনাইতেছেন; জোর করিয়া খাটাইতেছেন; নামমাত্র মজুরি দিতেছেন; অবাধ্য হইলে ধরিয়া কয়েদ করিতেছেন। শুনিয়া মহেশের মন অস্থির হইয়া উঠিল। তিনি সংবাদ সংগ্রহ করিবার জন্ত গোপনে গোপনে দুইটি যুবক সংগ্রহ করিলেন; তাহাদিগকে গোপনে ঐ সকল গ্রামে পাঠাইয়া সংবাদ সংগ্রহ করিতে লাগিলেন; নিজেও দুই এক বার আপনার কাজে বাহির হইয়া সংবাদ জানিয়া আসিলেন। পরে বিদ্যা-সাগর মহাশয়ের দ্বারা কলিকাতার হিন্দু পেট্রিয়ট কাগজের সম্পাদককে হস্তগত করিয়া, প্রবন্ধ সকল লিখিয়া পাঠাইতে লাগিলেন। এই সকল প্রবন্ধ বাহির হইতে আরম্ভ হইলে চারিদিকে হুলস্থূল পড়িয়া গেল; 'কে লেখে কে লেখে' করিয়া অনুসন্ধান আরম্ভ হইল। পূর্ব্বোক্ত দুইটি যুবকের একজনের অসাবধানতাবশতঃ আসল কথাটা চুয়াডাঙ্গাতে বাহির হইয়া পড়িল। "কি প্রেমিক হৃদয়, কি সুন্দর ইংরাজী লেখা, মানুষটাত সামান্য মানুষ নয়!" এই বলিয়া শিক্ষিত ব্যক্তিদের মধ্যে আলোচনা আরম্ভ হইল।

এইরূপে দুই মাসের মধ্যেই চুয়াডাঙ্গার চতুষ্পার্শ্বে মহেশের নাম বাহির হইয়া গেল। একদিকে স্বীয় কার্য্যে তাঁর দৃঢ়-নিষ্ঠতা, পরিশ্রম, ন্যায়পরতা, সত্যবাদিতা, প্রজাদের প্রতি দৃষ্টি, দরিদ্রের প্রতি দয়া, দেখিয়া লোকে চমৎকৃত হইতে লাগিল; অপর দিকে তাঁর দীনে দয়া নির্ভীকতা, ও সুন্দর ইংরাজী লিখিবার শক্তির কথা শুনিয়া লোকে চমৎকৃত হইতে লাগিল। ক্রমে তাঁর প্রতি নীলকর সাহেবদের দৃষ্টি পড়িল। তাঁরা গোপনে কমিশনার সাহেবের নিকট তাঁর নামে লিখিতে লাগিলেন; কিন্তু কমিশনার সাহেব বলিলেন—"লোকটা ছয়মাস পরেই যাইবে।" তাই আর কিছু করা হইল না।

সেই সময় চুয়াডাঙ্গাতে একজন ডেপুটিম্যাজিষ্ট্রেট বাস করিতে

ছিলেন; তিনি বড় জ্ঞানানুরাগী মানুষ; প্রায় প্রতিদিন সন্ধ্যার সময় তাঁহার ভবনে স্থানীয় ভদ্রলোকদের সমাগম হইত; তাঁহারা সদালাপ, সদালোচনা, উৎকৃষ্ট গ্রন্থাদি পাঠে কাল কাটাইতেন। ক্রমে তাঁহাদের সঙ্গে মহেশের পরিচয় হইল; মহেশ সন্ধ্যাকালে সেখানে গতায়াত করিতে লাগিলেন; এবং তাঁহাদের নিকট হইতে ভাল ভাল বই আনিয়া পড়িতে লাগিলেন।

সেই ডেপুটি বাবুর ভবনে বাবু গোপাললাল নামে একটি সম্ভ্রান্ত লোকের সঙ্গে তাঁহার আলাপ হইল। সর্ব্বসাধারণে তাঁহাকে বাবু গোপাললাল বলিয়া ডাকিত। তিনি বহরমপুর হইতে কোনও বিষয়-কর্ম্ম উপলক্ষে চুয়াডাঙ্গাতে আসিয়া বাস করিতেছিলেন। মহেশের কাজকর্ম্ম বোধ হয় তাঁর গোচর হইয়াছিল; কারণ আলাপ পরিচয়ের সময় হইতেই তিনি মহেশের প্রতি বিশেষ সম্ভ্রম প্রদর্শন করিতে লাগিলেন; এবং মধ্যে মধ্যে তাঁহার বাসাতে আসিয়া নানা বিষয়ে কথা বার্ত্তা কহিতে লাগিলেন। দুই জনে বেশ মিত্রতা জন্মিয়া গেল। এইরূপে মহেশের ছয়মাস কাজের মধ্যে পঞ্চম মাস উপস্থিত হইল। ওদিকে বাড়ী হইতে সংবাদ আসিল যে ক্ষীরদার একটি কন্যাসন্তান জন্মিয়াছে; নিস্তারিণী তাহার সবিশেষ বিবরণ লিখিয়াছেন;—প্রসূতির বিশেষ কষ্ট হয় নাই, কন্যাটিও ভাল আছে। এই সংবাদে মহেশের বাড়ী যাইবার জন্য মন ব্যস্ত হইল; কিন্তু মাস শেষ না হইলে ছুটী পাইবেন না, কাজেই বাধ্য হইয়া কাজে আবদ্ধ থাকিতে হইল। উড়ু উড়ু মন লইয়া কাজ করিতেছেন, এমন সময়ে একদিন বাবু গোপাললাল দেখা করিতে আসিলেন। উভয়ে যে কথা বার্ত্তা হইল তাহা এই;—

বাবু গোপাললাল। দেখুন, আমি একটা কথার জন্য এসেছি। বহরমপুরে আমার এক ভাগিনার জমিদারী আছে; অনেক লাখ টাকা বছরে

আয়; সে নিজে কোনও কাজের লোক নয়; বয়স আঠার উনিশ বছর; সে দুইশ' টাকা দিয়ে একজন ম্যানেজার রেখেছিল; সে ম্যানেজার বাবুর দোষে কাজ কর্ম্ম খারাপ হয়ে গিয়েছে; অনেক টাকা দেনা হয়েছে। আপনাকে এখানে দেখা পর্য্যন্ত তার সঙ্গে আমার চিঠিপত্রে কথাবার্ত্তা চলছিল; গত মাসে সেই ম্যানেজার বাবুকে জবাব দেওয়া হয়েছে; আর দুমাস তিনি আছেন; তারপর আপনি কি সে কর্ম্মটা নিতে পারবেন? আপনার কাজকর্ম্ম দেখে আমার আশা হয়েছে, আপনি ম্যানেজার হলে সকল দিকে ভাল; দেনা শোধ হবে; বিষয়ের উন্নতি হবে; আর আমরা আপনাকে কাছে পাব। আপনি ভেবে দেখুন; মাসে বেতন আড়াই শ' টাকা পাবেন; গঙ্গার পূর্ব্ব ধারে বাগানের মধ্যে একখানা বড় বাড়ী পাবেন; এবং তিন জন চাকর পাবেন। আপনি যদি কাজটা নিতে চান, বলুন, আমি সব স্থির করি।

মহেশ। (হাসিয়া) আমি যখন চাকুরী করতে বসেছি, তখন নূতন কাজ নেব না কেন? বিশেষতঃ কমিশনার সাহেব আমাকে এখানে এনেছেন; শুনলাম আমি নীলকরদের বিরুদ্ধে লিখেছি সে কথাটা তিনি কেমন করে টের পেয়েছেন; সেজন্য নাকি আমার উপর চটেছেন; ছয়মাসের জন্য এখানে এসেছি বলে আমাকে কিছু বলছেন না; যেরূপ দেখছি তাতে গবর্ণমেণ্টের কাজ করা আর আমার পোষাবে না; আপনাদের কাজটা পেলে আমার পক্ষে ভাল; কিন্তু আপনি ত সব জানেন, আমাকেও দেখচেন, আমার দ্বারা কি সে কাজ হবে?

বাবু গোপাললাল। তা না হলে আপনাকে অনুরোধ করব কেন? আপনার মত বিচক্ষণ, বুদ্ধিমান, ন্যায়পরায়ণ ও কার্য্যকুশল মানুষ কয়জন পাওয়া যায়?

মহেশ। (হাসিয়া) ওটা আপনার ভালবাসার কথা! কিন্তু ভাববার মত আরও কিছু কথা আছে; সেগুলো আপনি বিবেচনা করুন; এবং ভেবে আমাকে সব বলুন। প্রথম কথা, আপনি বলছেন, আপনার ভাগিনার বয়স ১৮।১৯ বৎসরের অধিক নয়; এবং ইতিমধ্যেই জমিদারিটা দেনার মধ্যে পড়েছে। আপনার ভাগিনা কি খরচপত্র বিষয়ে আমার সঙ্গে পরামর্শ করে কাজ করবেন? আমার প্রস্তাব এই, তাঁদের বাড়ীর খরচ ও নিজের খরচাদি বিষয়ে আপনার সঙ্গে পরামর্শ করে তিনি যাহা স্থির করবেন, তাহা আমাকে জানাবেন; আমি তাহা মাসে মাসে দেব। অতিরিক্ত কিছু খরচ করতে হলে, তাঁহাকে আমার সঙ্গে পরামর্শ করে স্থির করতে হবে। যদিচ্ছা খরচ পত্র করলে আমি দেনা শোধের ভার নিতে পারব না। আপনারা ভেবে দেখুন; আপনার ভাগিনাকে উক্ত কয়েকটি কথা জানতে দিন; সব দেখে শুনে যদি আমাকেই কাজটা দেওয়া স্থির করেন, আমার বাড়ীতে নিয়োগপত্রখানা পাঠাবেন। আর কয়েক দিন পরেই ত আমি দেশে যাব; আমি ঠিকানা দিয়ে যাব।

বাবু গোপাললাল। আচ্ছা তাই হবে।

অতঃপর মহেশের চুয়াডাঙ্গার কাজ শেষ হইলে তিনি বাসগ্রামে ফিরিয়া গেলেন; গিয়া ক্ষীরদার ক্রোড়ে নবজাত কন্যা দেখিলেন। কন্যাটি দেখিতে বড় সুন্দর হইয়াছে; চোখ দুটি বড় বড়, মাথায় একমাথা চুল, উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ, মুখখানি সুস্থ ও প্রসন্ন, দেখিলেই বুকে ধরিতে ইচ্ছা হয়। মহেশ গিয়া জননীর চরণে প্রণত হইয়া পদধূলি লইয়া দাঁড়াইবা মাত্র ক্ষীরদা ও নিস্তারিণী আসিয়া কাছে দাঁড়াইলেন; মহেশ ক্ষীরদাকে দেখিয়া বলিলেন—"এ কি, তুমি কি রোগা হয়ে গিয়েছ!" নিস্তারিণী বলিলেন—"এ কি নূতন কথা, ছেলে গর্ভে ধারণ

করা ও প্রসব করা কি স্ত্রীলোকের পক্ষে সামান্য ব্যাপার!" এই বলিয়া কন্যাটিকে আনিয়া তাঁহার ক্রোড়ে দিলেন; তিনি দুই হাত পাতিয়া কন্যাটিকে লইলেন; এবং জননীর মুখের দিকে চাহিয়া হাসিয়া বলিলেন—"মা! তুমি বোধ হয় ইচ্ছা করেছিলে নাতি হোক্, দেখ নাত্‌নী এসেছে।" জননী বলিলেন—"ভগবান যা দেন তাই ভাল; ওই আমার নাতি।" মহেশ কন্যাটির মুখে বার বার চুম্বন করিতে লাগিলেন; দেখিয়া ক্ষীরদা ও নিস্তারিণীর মন প্রফুল্ল হইয়া উঠিল।

ইহার পরে মহেশ দেখিলেন, তিনি যাইবার সময় সংসারের যেরূপ বিধিব্যবস্থা করিয়া গিয়াছিলেন, নিস্তারিণী প্রায় তাহাই রাখিয়াছেন। তিনি তদবধি আর বাপের বাড়ী যান নাই; ক্ষীরদাকে বলিয়াছেন—"তুমি আর দুদিন পরে ছেলের মা হবে, তুমি খেট না; তুমি পিছনে থাক, আমি খাটি।" এই বলিয়া নিজের উপরে সংসারের সকল ভার লইয়া নগেনের সাহায্যে সুন্দররূপে সংসার চালাইতেছেন। মহেশ দেখিয়া বড়ই প্রীত হইলেন। বলিলেন—"নিস্তারিণী দিদি! কি শুভক্ষণেই তুমি আমাদের বাড়ীতে এসেছিলে, তাই মাকে দেখবার ও সংসার চালাবার ভার তোমার উপর দিয়ে এতদিন নিশ্চিন্ত ছিলাম। আবার কোথায় যাই তার ঠিক্‌কি? তখন এসব ভার ক্ষীরদার উপরেই পড়বে।" নিস্তারিণী হাসিয়া বলিলেন,—"তুমি বুঝি মনে কর কয়েকদিনের জন্য এসেছি, তুমি না তাড়ালে আমি তোমাকে এ জীবনে ছাড়ব না।" ইহার পর সংসারের কাজকর্ম্ম পূর্ব্বের ন্যায় চলিল; এবং নগেন বাহিরের ঘরেই রহিল।

ইহার পর মহেশ বাড়ী বাড়ী ঘুরিয়া গ্রামবাসীদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে লাগিলেন; এবং ব্রজনাথ দত্ত মহাশয়ের ভবনে প্রায় প্রতিদিন সন্ধ্যার সময় গিয়া আত্মোন্নতি সভার কাজ পরিদর্শন করিতে লাগিলেন। তাঁহার বয়স্ক যুবকগণ তাঁহাকে হারাইয়া যেন চালক-

বিহীন মেষযূথের ন্যায় বাস করিতেছিল; তাঁহাকে পাইয়া তাহাদিগের উৎসাহ ও আনন্দ যেন বাড়িয়া গেল। তাহারা তাঁহার অনুপস্থিতিকালে যে যে ভাল কাজে হাত দিয়াছিল এবং কোন্ বিভাগে কি করিয়াছিল সব জানাইল; তিনি শুনিয়া আনন্দিত হইলেন। তিনি লাইব্রেরীর জন্য মাসে মাসে টাকা পাঠাইতেছিলেন; লাইব্রেরীতে গিয়া দেখিলেন অনেক ভাল ভাল নূতন বৈ আসিয়াছে। একটা বিষয় দেখিয়া তাঁহার বড়ই আনন্দ হইল। তিনি দেখিতে পাইলেন, যে লাইব্রেরীটা হাতে থাকাতে যুবকদের অনেকের পাঠে রুচি ও জ্ঞানে অনুরাগ বাড়িয়াছে; তাহাদের প্রকৃতিতে চিন্তাশীলতা ও গাম্ভীর্য্য আসিয়াছে; তাহারা জগতের অগ্রসর জাতিদিগের কাজকর্ম্মের প্রতি অধিক মনোযোগ দিতে শিখিয়াছে; এবং দেশের যে বিভাগে যে ভাল কাজ হইতেছে তাহার সংবাদ রাখিতেছে। এই সকল যুবক তাঁহাকে ঘিরিয়া ফেলিল; এবং প্রতিদিন প্রাতে ও সন্ধ্যাতে তাঁহার ভবনে আসিতে লাগিল।

তাঁহার শয়নঘরের দাবাতে বসিয়াই তাহাদের সকল কথা হইত। সে সকল কথার এমনি আকর্ষণ যে ক্ষীরদা ও নিস্তারিণী অবসর পাইলেই দাবার অপর পার্শ্বে আসিয়া বসেন এবং সেই কথা শুনিতে থাকেন।

এতদ্ভিন্ন যে সকল বিধবা আত্মোন্নতি সভা হইতে সাহায্য পাইতেছেন, মহেশ তাঁহাদের অনেকের বাড়ীতে বাড়ীতে গিয়া দেখা করিলেন; এবং তাঁহারা কেমন আছেন সে সংবাদ লইলেন। তাঁহাকে দেখিয়া, বিধবাগণ মুক্তকণ্ঠে আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন,—"বাবা, তুমি বেঁচে থাক! তোমার গুণেই আমরা খেতে পাচ্ছি"। শুনিয়া তাঁর প্রাণ আনন্দে উচ্ছ্বসিত হইতে লাগিল। এইরূপ বাড়ী বাড়ী ঘুরিতে ঘুরিতে একটি বিশেষ ঘটনা ঘটিল। নিস্তারিণী তাঁহাদের বাড়ীতে থাকিলেও মহেশ তাঁর পিসীমা জগত্তারিণীদেবীর কাছে মধ্যে মধ্যে গিয়া থাকেন। এক-

দিন তাঁর কাছে গেলে উাহার একটি ব্রতের কথা উপস্থিত হইল। তিনি হাসিয়া বলিলেন,—"পিসীমা, তোমরা এত উপোষ কর কি করে? তুমি ত সধবা হয়েও বিধবার বাড়া! ব্রতের উপর ব্রত, উপোষের উপর উপোষ! এ ব্রতটা আবার কতদিনের জন্য নিয়েছ?"

জগত্তারিণী। এটা পনর দিনের জন্য; কিন্তু এ ব্রতের সঙ্গে সঙ্গে আর একটা করতে পারলে ভাল হোতো, তা আর হোলো না।

মহেশ। সেটা কি?

জগত্তারিণী। এই ব্রতের সঙ্গে কথকতা শোনবার ইচ্ছা ছিল; তার পয়সা বা কোথায়, জোগাড় বা করে কে? তোমার পিসামশাই ত পীড়িত, কাজের নাম করলে বিরক্ত হন।

মহেশ। এত পয়সা কি লাগবে! কথক ত অনেক পাবেন, অল্পেই আসতে রাজী হবেন।

জগত্তারিণী। পনর দিনে আমাদের ত্রিশ টাকা ত লাগবে; তার উপর কোথায় কথক, কে দেখে, কে বন্দোবস্ত করে, কে জায়গা টায়গা ঠিক করে? তাই সে ইচ্ছে দমন করেছি।

মহেশ। সে কি পিসীমা! তবে আমরা আছি কি করতে? তুমি আমাকে ডেকে বলনি কেন? আচ্ছা, আমি যে টাকা লাগে দেব, এবং আমার সঙ্গী ছেলেদের দিয়ে সব কাজ করিয়ে দেব। কথকতা হলে তোমারি যে আনন্দ হবে তা নয়; কথকতা বড় ভাল, সাধারণ লোক কথকতা শুনে ধর্ম্মের অনেক কথা শেখে। আচ্ছা, রোসো, আমি ভাল কথক খুঁজছি।

জগত্তারিণী। সাধে তোমায় সকলে এত ভালবাসে? তুমি কি ভাল ছেলে! ত্রিশটে টাকা দেওয়া কি তোমার পক্ষে সহজ? আমি তোমাকে কথাটা বলেছি বলে লজ্জা হচ্ছে।

মহেশ। সে কি পিসীমা! যদি এ সামান্য সাহায্য না কর্ব্বো, তবে এ অর্থোপার্জ্জনের ফল কি? তোমার বাড়ীর চাকর হয়ে খাটলেও যথেষ্ট হয় না; তোমরা সাধু মানুষ, তোমাদের সাহায্য করতে পারা সৌভাগ্য।

তার পর মহেশ আসিয়া কলিকাতায় লোক পাঠাইয়া একজন প্রসিদ্ধ কথককে আনাইলেন; তাঁহাকে পনর দিনের জন্য ত্রিশ টাকা দিতে হইল; অপরাপর ব্যয়ে আরো দশবারো টাকা গেল; মহেশের তাহা সামান্য ব্যয় মনে হইল। নিস্তারিণী সে কয়দিনের জন্য পিত্রালয়ে গেলেন। মহেশ প্রতিদিন বৈকালে জননীকে সঙ্গে করিয়া যাইতে লাগিলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

পিসীমার বাড়ীতে কথকতা চলিতেছে, ইতিমধ্যে বহরমপুর হইতে নিয়োগপত্র আসিয়া উপস্থিত। বাবু গোপাললাল লিখিয়াছেন, যে সকল কথা তাঁহার ভাগিনা দেবীপ্রসাদকে বলিবার জন্য বলিয়াছিলেন, তাহা বলা হইয়াছে; দেবীপ্রসাদ সকলদিক দেখিয়া, ভাবিয়া চিন্তিয়া, তাঁহাকেই নিযুক্ত করা স্থির করিয়াছেন; মহেশ মাসে আড়াই শত টাকা বেতন পাইবেন; গঙ্গার ধারে থাকিবার জন্য একটি বাড়ী পাইবেন; একজন দ্বারবান ও দুই জন চাকরের বেতন পাইবেন। নিয়োগপত্রখানি পাইয়া মহেশের মন আনন্দে নাচিয়া উঠিল। কমিশনার সাহেব নীলকরদের পশ্চাতে আছেন জানা অবধি, তিনি চুয়াডাঙ্গাতে তিন চারিমাস ভয়ে ভয়ে বাস করিতেছিলেন; গবর্ণমেণ্টের চাকুরী আর পোষাইবে কি না ভাবিতেছিলেন; এখন ভয়ভাবনা চলিয়া গেল; জমিদারের ম্যানেজারি কাজটা নির্ভয়ে করিতে পারিবেন ভাবিয়া আনন্দ হইতে লাগিল। তিনি নিয়োগপত্রখানি লইয়া জননীর কাছে গিয়া তাঁর পদধূলি লইয়া, পত্রখানি তাঁর চরণে রাখিয়া সমুদয় কথা জানাইলেন। জননী তাঁর মস্তকে হাত দিয়া বলিলেন—"তুমি সৎছেলে, ধার্ম্মিক ছেলে, তাই ভগবান তোমার সহায়!" নিস্তারিণী সেদিন এবাড়ীতে ছিলেন; তিনি শুনিয়া আনন্দে ক্ষীরদার কন্যাকে বুকে জড়াইয়া বলিতে লাগিলেন,—"ওরে শোন্‌ রে শোন্‌, তোর পয়া কেমন! তুই পেটে আসার পর হতেই উন্নতির পর উন্নতি হচ্ছে। জগদ্ধাত্রীদেবী শুনিয়া হাসিয়া বলিলেন—"তা বটে, ও পেটে আসতেই পঁচাত্তর টাকার কাজে মহেশ গেল; তারপর

পদে পদে বেতন বাড়ছে। বেঁচে থাক্, বেঁচে থাক্, ও আমাদের আর কষ্টের মুখ দেখতে দেবে না।"

মহেশ নিয়োগপত্রের উত্তরে বাবু গোপাললালকে লিখিলেন যে, তিনি সপরিবারে বিশে চৈত্র নাগাদ বহরমপুরে পৌছিবেন; চৈত্র মাসের দশ দিন পুরাতন ম্যানেজারের নিকট কাজকর্ম্ম বুঝিয়া লইবেন; তৎপরে ১লা বৈশাখ হইতে নিজের কাজে বসিবেন: তাঁহার জন্য যেন বাড়ী প্রস্তুত থাকে।

অতঃপর কবে যাইবেন, কি ব্যবস্থা করিয়া যাইবেন, সকলকে সঙ্গে লইবেন কি রাখিয়া যাইবেন,—এই সকল পরামর্শ চলিল। অনেক পরামর্শের পর স্থির হইল যে, নগেন ও তার বিধবা পিসীকে বাড়ীতে রাখিয়া, তাঁহারা সকলে বহরমপুরে যাইবেন। জননী প্রথমে পতির বাসভবন ত্যাগ করিয়া যাইতে অস্বীকৃত হইয়াছিলেন; কিন্তু যখন শুনিলেন, মহেশ যে বাড়ীতে থাকিবেন তাহা গঙ্গার ধারে, তিনি নিত্য গঙ্গাস্নান করিতে পাইবেন, নিকটে একটি দেবমন্দির আছে, সেখানে গিয়া প্রতিদিন দেবার্চ্চনা করিতে পাইবেন, তখন যাইতে প্রস্তুত হইলেন। ইহার পর মহেশ তারাকে আনিবার জন্য তার শ্বশুরবাড়ীতে লোক পাঠাইলেন; কারণ, বহুদিনের জন্য জননীকে লইয়া যাইবার পূর্ব্বে তারাকে একবার আনিয়া মায়ের কাছে রাখা উচিত। তারা যথাসময়ে আসিল এবং মায়ের ক্রোড়ে আশ্রয় লইল। তৎপরে প্রশ্ন আসিল নিস্তারিণী কি করেন। নিস্তারিণী ত অগ্রেই বলিয়াছেন, তিনি আর জীবনে মহেশকে ছাড়িবেন না। কিন্তু মুখে বলিলে কি হয়, পিতা মাতাকে পরিত্যাগ করিয়া যাওয়া কি সহজ কথা! নিস্তারিণী পিতৃগৃহে গিয়া পিতা মাতার চরণে পড়িয়া স্বামীর সঙ্গে যাইবার অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। তাঁহারা জানিতেন নিস্তারিণীর তাঁহাদের সংসারে কাজ নাই; মহেশের

বাড়ীতে সে সুখেই থাকে; মামীর সেবা করিতেছে, সে ভালই; সুতরাং তাঁহারা সম্মতি দিলেন। মহেশ গিয়া সেই কথা উপস্থিত করিলে, পিসীমা বলিলেন—"দেখ বাবা, তোমার মত নিস্তারিণীকে কেউ ভাল বাসে না; ওর এখানে কাজ নাই; তোমাদের সেবা করে সুখী হয়; তাই হোক্, তুমি ওকে নিয়ে যাও; ওর ভার তোমার উপরেই দিলাম; ওকে আর আমাদের এখানে পাঠাতে হবে না; তোমার হাতে ওকে দিয়ে আমরা নিশ্চিন্ত রইলাম।

ক্রমে যাত্রার দিন নিকটে আসিল। মহেশ ব্রজনাথ দত্তের নিকট গিয়া বিদায় লইলেন; এবং তাঁহার যুবক বন্ধুগণের সঙ্গে দুই দিন বালিকাবিদ্যালয় কিরূপে চলিবে, আত্মোন্নতি সভার কার্য্যের কিরূপ ব্যবস্থা হইবে, এই সব আলোচনাতে যাপন করিলেন। তিনি বিদেশ হইতে ফিরিয়া আসিবার সময়, আত্মোন্নতি সভার পুস্তকালয়ের জন্য ২৫৲ টাকার পুস্তক কিনিয়া আনিয়াছিলেন; এবং ছয়মাস মাসে মাসে বালিকাবিদ্যালয়ের জন্য তিন টাকা ও আত্মোন্নতি সভার জন্য তিন টাকা দিয়া আসিতেছিলেন। এখন ব্রজনাথ দত্তের নিকট প্রতিশ্রুত হইয়া আসিলেন, যে উক্ত দুই কার্য্যের সাহায্যের জন্য মাসে দশ টাকা করিয়া দিবেন। তিনি বলিলেন—"তুমি কি মানুষ, এমন মানুষ দু-দশ জন গ্রামে থাক্‌লে গ্রামের অবস্থা ফিরে যায়! তুমি গেলে জানিনা কিরূপে কাজ চল্‌বে!"

তারপর মহেশ বালিকা বিদ্যালয়ের ও আত্মোন্নতি সভার পরিচালক যুবকবন্ধুদের এবং গ্রামবাসী ভদ্রলোকদের নিকট বিদায় লইয়া, নগেন ও তার পিসীমাকে স্বীয় ভবনে স্থাপন করিয়া কলিকাতাযাত্রার জন্য প্রস্তুত হইলেন। কিন্তু মহেশ ভাবিতে লাগিলেন, ধুনিয়া-কুকুর ও রূপী-বিড়ালকে ফেলিয়া যান কিরূপে? তাহা-

দিগকে সঙ্গে লইবার জন্ম তাঁহার বড়ই ইচ্ছা হইতে লাগিল; গোপনে ক্ষীরদা ও নিস্তারিণীকে সেই ইচ্ছা জানাইলেন। নিস্তারিণী বলিলেন—"তার আর কি? কৃপা না হয় রূপীকে কোলে করে নেবে; আমি ধুনিয়ার গলায় দড়ি দিয়ে, দড়ি ধরে সঙ্গে নেব।" কুকুর বিড়াল লইবার পরামর্শ হইতেছে শুনিয়া জগদ্ধাত্রী দেবী বড় রাগ করিতে লাগিলেন; সুতরাং সে প্রস্তাব পরিত্যক্ত হইল। মহেশ নগেনকে বিশেষ করিয়া বলিয়া তাহার উপরে ধুনিয়ার ও রূপীর ভার দিলেন; গরুটাও তাঁহাদের হাতে রহিল; সে জন্ম এই বন্দোবস্ত করিলেন যে, পৈত্রিক জমি হইতে বৎসর বৎসর যে তিন চারি মাসের আহারের ধান আসে, তাহা নগেনরা লইবেন; এবং তাহা হইতে ঘর দোর রক্ষা ও গরুর ব্যয় চালাইবেন।

এই সকল ব্যবস্থা করিয়া তাঁহারা কলিকাতা যাত্রা করিলেন; এবং কলিকাতায় গিয়া মাতুলের ভবনে উঠিলেন। যে দুই চারিদিন সেখানে থাকিলেন, আনন্দেই দিন কাটিতে লাগিল। জগদ্ধাত্রীদেবী বহুদিনের পর গিরিশকে ও তাহার স্ত্রীকে পাইয়া সুখী হইলেন। এই কয়দিনের মধ্যে একদিন মাতাকে লইয়া মহেশ কালীঘাটের মন্দির দেখাইয়া আনিলেন; দুইদিন গঙ্গাস্নান করাইলেন; এবং একদিন মিউজিয়ম ও রাজেন্দ্র মল্লিকের বাড়ীর পশুশালা দেখাইয়া আনিলেন। তিনি সকল কাজের মধ্যে একদিন নিস্তারিণী, ক্ষীরদা ও কৃপাকে সঙ্গে করিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সহিত দেখা করিতে গেলেন। ক্ষীরদা পায়ে প্রণত হইলে তাঁহার মস্তকে হাত দিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয় বলিলেন—"বৌটী ত বেশ, বেঁচে থাক মা!" নিস্তারিণীর মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন—"এ মেয়েটি কার?" তাঁর পরিচয় পাইয়া যখন শুনিলেন তিনি ছয় সাত বৎসর বয়স হইতে বিধবা, তখন চক্ষের জল রাখিতে পারিলেন না! কৃপা তাঁর পদে প্রণত হইলে আশীর্ব্বাদ করিতে গিয়া বলিলেন—"মা তুমি বেঁচে থাক!

তোমার বিয়ে হোক; তুমি বিধবা হও; আবার তোমায় বিয়ে দিই।” বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জননী ভগবতীদেবী তখন কলিকাতায় তাঁহার কাছে রহিয়াছিলেন; তিনি সেই ক্ষেত্রে উপস্থিত; তিনি শুনিয়া হাসিয়া বলিলেন,—“ঈশ্বর! এ তোমার কি রকম আশীর্ব্বাদ করা?” বিদ্যাসাগর মহাশয় হাসিয়া বলিলেন—“বুঝলে না মা, আমার বন্দুবান্ধবদের ঘরের মেয়েরা যদি বিধবা না হয়, তবে আমি বিবাহ দেব কার?” ইহা লইয়া খুব হাসাহাসি পড়িয়া গেল। অবশেষে ভগবতীদেবী সকলকে কাছে বসাইয়া জল খাওয়াইলেন; নিজ হস্তে সিন্দুর লইয়া ক্ষীরদার শিঁথীতে সেই সিন্দুর দিয়া বলিলেন—“মা তুমি জন্ম-এয়োস্ত্রী হও।” এবং তৎপরে আসিবার সময় তাঁহার আশীর্ব্বাদের চিহ্নস্বরূপ তিনজনকে তিনখানি কাপড় দিয়া বিদায় করিলেন। নিস্তারিণী ও ক্ষীরদা গাড়ি করিয়া বাড়ী ফিরিবার সময় সমস্ত পথ কেবল বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মাতার কথা বলিতে বলিতে আসিলেন। তাঁহারা সকল কথা জানিতেন না; মহেশ বলিতে লাগিলেন—“দেখছ কি? বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বিধবা-বিবাহে উৎসাহ মায়ের কাছে পাওয়া।” এই বলিয়া মায়ের কথায় কিরূপে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মনে বিধবা-বিবাহের ভাব উঠিয়াছিল, সেই গল্প শুনাইলেন।

ইহার পরে আর একটা কাজ আসিল। সে সময় সহরে মহেশের এক বাল্যবন্ধু ফটোগ্রাফারের কাজ করিতেছিলেন; তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ হইলে মহেশ তাঁর কারখানা একদিন দেখিতে গেলেন। ফটোগ্রাফার ধরিয়া বসিলেন—“তোমার পরিবারের সকলকে একদিন নিয়ে এস; এখানে কেহ থাকিবে না; আমি তাঁদের ফটোগ্রাফ তুলব।” তদনুসারে মহেশ একদিন গাড়ি করিয়া সকলকে লইয়া গেলেন। সকলে একত্র একখানা এবং নিজের ও মাতার স্বতন্ত্র এক এক খানা ফটো তোলা হইল। বন্ধুটী তাহার মূল্য কিছুই লইতে চাহিলেন না।

অতঃপর তাঁহারা বোটে করিয়া বহরমপুর যাত্রা করিলেন। বোটখানি বড়, দুটি কামরাবিশিষ্ট; জননী, নিস্তারিণী ও কৃপা, তিন জনে এক কামরা আশ্রয় করিলেন; অপর কামরাটিতে মহেশ, ক্ষীরদা ও খুকীকে লইয়া, বাস করিতে লাগিলেন। বোটে যাত্রা করিবার প্রধান কারণ, জননীকে গঙ্গার দুই ধার দেখাইয়া লইয়া যাওয়া এবং প্রতিদিন তাঁর গঙ্গস্নানের সুবিধা করিয়া দেওয়া। যে নিয়মে তাঁহারা অগ্রসর হইতে লাগিলেন তাহা এই;—প্রতিদিন প্রাতে উঠিয়া দুই ঘণ্টা পরে নৌকা তীরে লাগান হয়; জগদ্ধাত্রী দেবী উঠিয়া গঙ্গা স্নান করেন এবং নিকটে দেবমন্দির থাকিলে দেখিয়া আসেন; আসিয়া, কামরায় বসিয়া, কিয়ৎক্ষণ শিবপূজা, ভজন সাধন, মালাজপ প্রভৃতিতে যাপন করেন; ইত্যবসরে ক্ষীরদা ও নিস্তারিণী উঠিয়া, বাসন মাজিয়া, জায়গা পরিষ্কার করিয়া, রন্ধনাদির আয়োজন করিতে থাকেন; ততক্ষণ কৃপা খুকীকে লইয়া থাকে; রন্ধনের আয়োজন সমাধা হইলে জননী রন্ধন কার্য্যে ব্যাপৃত হন; ইত্যবসরে ক্ষীরদা স্নান করিয়া খুকীকে লইয়া, কৃপাকে ছুটী দেন; কৃপা, নিস্তারিণী ও মহেশ, নিকটে বাগান থাকিলে, বাগানে বেড়াইতে যান; নতুবা গঙ্গা তীরবর্ত্তী স্থানটা পরিদর্শন করিয়া আসেন; আসিয়া স্নানান্তে মহেশ পাঠে গভীররূপে নিমগ্ন হন; আহারের সময় পর্য্যন্ত সেই পাঠ চলিতে থাকে; রন্ধনাদি প্রস্তুত হইলে সকলে স্নানান্তে গঙ্গাতীরে বসিয়াই আহার করেন; আহারান্তে আবার নৌকা ছাড়া হয়; কিয়ৎকাল বিশ্রামের পর মহেশ আবার পাঠ ও চিন্তাতে নিমগ্ন হন; সায়ংকালে নিস্তারিণী নৌকাতেই লুচি ভাজেন; এবং নিকটের কোনও গ্রাম হইতে দুগ্ধাদি আনান হয়; রাত্রে কিয়ৎক্ষণ নৌকা বাহিয়া মাঝিরা শয়ন করে; তখন সকলে নিদ্রিত হন। নৌকা এইরূপে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে লাগিল।

মহেশ যে আশা করিয়া নৌযাত্রা করিয়াছিলেন তাহা পূর্ণ হইতে লাগিল। পতিবিয়োগের পর হইতে জগদ্ধাত্রীদেবীর মুখে বিষাদের ছায়া পড়িয়াছিল; কেহ তাঁহাকে প্রায় হাসিতে দেখিত না। মহেশ এই আশা করিয়া নৌকাতে বাহির হইয়াছিলেন, যে, প্রকৃতির সৌন্দর্য্য দেখিয়া, ধর্ম্মসাধনের অবসর পাইয়া, এবং নিরুপদ্রবে আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে বাস করিয়া, জননীর মনের বিষাদ কিয়ৎপরিমাণে দূর হইতে পারে; তাহাই ঘটিল। নৌকাতে যাত্রা করার দুই চারিদিনের মধ্যেই চারিদিকের সৌন্দর্য্য দেখিয়া, এবং প্রিয়জনদিগকে সর্ব্বদা কাছে পাইয়া, জগদ্ধাত্রী দেবীর বিষাদের ছায়া যেন কিয়ৎপরিমাণে অন্তর্হিত হইতে লাগিল। তিনি খুকীকে বুকে লইয়া নাচাইতে ও আদর করিতে লাগিলেন; নিজের কোলে বসাইয়া, নিজের হাতে খাওয়াইতে লাগিলেন; এবং সন্ধ্যার পর, নিদ্রার সময় পর্য্যন্ত ক্ষীরদা ও নিস্তারিণীর সহিত নানাপ্রকার গল্প করিতে লাগিলেন। রাত্রে শয়ন করিয়া জলের কুলু কুলু ধ্বনি শুনিয়া হাসিয়া রূপাকে বলেন—"শোন, শোন, নদী খল খল করে হাসচে!" দিনের বেলায় গঙ্গা-জলের মৃদুমন্দ গতি দেখিয়া পুলকিত হন; দেখিবার মত কিছু একটা দেখিলেই সকলকে ডাকিয়া দেখান; দুই পার্শ্বের বৃক্ষরাজির প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বলেন—"আঃ, চোক যেন জুড়িয়ে গেল!" ইত্যাদি ইত্যাদি। বলাবাহুল্য যে এই পরিবর্ত্তন দেখিয়া মহেশের মন আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিল; তিনি মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন—"ভাগে৷ নৌকা করে বাহির হয়েছিলাম!"

এখন নৌযাত্রার কয়েকটি ঘটনার কথা বলি। দ্বিতীয় দিন প্রাতে, স্নানান্তে, জগদ্ধাত্রীদেবী দক্ষিণেশ্বরের মন্দির দেখিবার নিমিত্ত উঠিয়াছিলেন; এবং সেখানে অনেকক্ষণ থাকিয়া তাঁহার ধ্যান ধারণা

সমাধা করিয়াছিলেন; তারপর আর কোনও কোনও স্থানে উঠিয়াছিলেন।

এইরূপে তৃতীয় দিনের প্রাতে পূর্ব্ববাঙ্গালা রেলওয়ের শ্যামনগর ষ্টেশনের নিকট আসিয়া প্রভাত হইল। ভোরে মহেশ বলিলেন—"মা, এটা দেখবার মত জায়গা; এখানে কলকেতার ঠাকুর বাবুদের একটা বাগান ও দেবমন্দির আছে; তুমি কি দেখবে? যদি দেখত স্নান করে নেও, আমি অপেক্ষা করছি।" জগদ্ধাত্রী দেবী তাড়াতাড়ি স্নান করিতে গেলেন। তিনি স্নান করিতেছেন, নিস্তারিণী গিয়া দেখেন যে গঙ্গার জলে ছাই, কয়লা প্রভৃতি ভাসিয়া আসিতেছে; জগদ্ধাত্রী দেবীর সেদিকে দৃষ্টি নাই; নিস্তারিণী বলিয়া উঠিলেন—"মামীমা, মামীমা, জল ঢেইয়ে দেও, কয়লা, ছাইটাই ভেসে আসছে।" জগদ্ধাত্রীদেবী জল ঢেওয়াইতে প্রবৃত্ত হইলেন; বলিলেন—"মাগো! ছি, ছি, কি অপরিষ্কার! এ সব কোথা হতে আসে?

মহেশ। ওকথা আর বল কেন! আমরা সভ্যতা সভ্যতা করি, জগতে সভ্যতার সাজা দেখ। নদীর পাশে কলকারখানা করে, নদীর জল ব্যবহারের অযোগ্য করে দিয়েছে; পল্লীগ্রামে লোকে সুখে বাস করত, সেখানে রেল নিয়ে গিয়ে, মাঠে রাস্তা করে, ম্যালেরিয়া এনে দিয়েছে; আগে সমুদ্রটা শান্ত গম্ভীর ছিল, সেখানে কলের জাহাজের দমদমানি ও কোঁস-কোঁসানিতে শান্তি নষ্ট করেছে; এখনও আকাশটা নিস্তব্ধ গম্ভীর আছে;—কে জানে কবে কি হয়? বেলুনে করে সেখানে ত উঠছেই, হয়ত কালে কলের কোঁস-কোঁসানিও দেখা যাবে! অধিক কি মা, মানুষের খাওয়া, শোওয়া, ঘুমান, সব অস্বাভাবিক করে ফেলছে।

জগদ্ধাত্রী। তাইত, গঙ্গার জল যে খাবার উপযুক্ত নেই; গঙ্গাতে স্নান করাই ভার!

ইহার পর মহেশ বোটের একজন দাঁড়িকে দুধ যোগাড় করিতে ও আর একজনকে জিনিস পত্র কিনিবার জন্য পাঠাইয়া, এবং তৃতীয় ব্যক্তিকে রাঁধিবার জন্য কাঠ প্রভৃতির যোগাড় করিতে বলিয়া, মেয়েদিগকে সঙ্গে করিয়া বাগান ও মন্দির দেখিতে বাহির হইলেন। খুকী কৃপার কোলে চলিল। সে কৃপার কোল হইতে মার কোলে যায়; আবার কিয়ৎক্ষণ পরে কৃপার কোলে আসে; সকলের চেয়ে তার আনন্দ অধিক। নিস্তারিণী বাগানে পৌঁছিয়াই একটী ফুল তুলিয়া তার হাতে দিলেন; এবং তার মুখে চুম্বন করিতে লাগিলেন। জননী দেবমন্দিরে গিয়া পূজায় বসিলেন; তখন অপর সকলে বাগানে ঘুরিতে লাগিল।

ইহার পরে তাঁহারা একদিন নদে সহরের নিকট উপস্থিত হইলেন। মহেশ বলিলেন,—"মা, নদের নাম যে শুনেছ এই সেই নদে! এটা বিখ্যাত স্থান; উঠে কি দেখবে?" জগদ্ধাত্রী দেবী সদলে উঠিয়া গঙ্গাস্নান ও পূজার পর সহরের প্রসিদ্ধ স্থানগুলি দেখিয়া নৌকাতে প্রতিনিবৃত্ত হইলেন। তিনি শাক্তধর্ম্মাবলম্বিনী কিন্তু বৈষ্ণবদিগের কীর্ত্তিগুলি তাঁহার নয়ন মন হরণ করিল।

তাঁহারা এইরূপে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। জগদ্ধাত্রীদেবী সকল স্থানে উঠিয়া সহরটা একটু ঘুরিয়া দেখিতেন, অবশেষে গঙ্গাস্নান ও দেবপূজা করিতেন। এইরূপে কিছু বেশীদিন যাইতে লাগিল বটে, কিন্তু সকলে পরমানন্দে কালযাপন করিতে লাগিলেন। মাতার সানন্দভাব ও ধর্ম্মনিষ্ঠা দেখিয়া মহেশের মন প্রীত ও প্রফুল্লিত হইতে লাগিল। তিনি এই কয়দিন পাঠ ও চিন্তাতে যাপন করিতেছেন; কলিকাতা হইতে আসিবার সময় কয়েকখানি সংস্কৃত ও ইংরাজী গ্রন্থ আনিয়াছেন; সংস্কৃত গ্রন্থগুলি পাঠ ও ব্যাখ্যা করিয়া মাতাঠাকুরাণী, ক্ষীরদা

ও নিস্তারিণীকে শোনান; তাঁহারা বড়ই আনন্দিত হন; ইংরাজী গ্রন্থগুলি পাঠে নিজে নিমগ্ন থাকেন। কিন্তু সর্ব্বোপরি, যে কাজে যাইতেছেন তাহার গুরুত্ব ও দায়িত্ব বিষয়ে চিন্তা করেন; কিরূপে সে কাজ করিবেন, কোন্ কোন্ বিষয়ে বিশেষ মন দিতে হইবে, কোন্ কোন্ কার্য্যে বিশেষ দৃঢ়তা অবলম্বন করিতে হইবে,—এই সকল চিন্তাতে বহুক্ষণ যাপন করেন। বলিতে কি, এই জন্য কয়েকদিনের মধ্যে তাঁহার মনে যেন যুগান্তর উপস্থিত হইতে লাগিল: তিনি স্বীয় কার্য্যের দায়িত্ব ও গুরুত্ব এরূপ কখনও অনুভব করেন নাই: বিশেষতঃ জননীর ধর্ম্মভাব অগ্রে তাঁহার চিত্তকে যেন এতদূর চমৎকৃত করে নাই। এই কয়দিনের মধ্যে তিনি মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, বহরমপুরে পৌঁছিয়া, জননীকে সংস্কৃত ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ করিয়া শুনাইবার রীতি প্রবর্ত্তিত রাখিবেন: এবং নিজে ধর্ম্মচিন্তা ও ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠে সময় দিবেন।

তাঁহাদের নৌযাত্রা অপরদিকে যে অতীব সুখকর হইল, তাহা বলা বাহুল্য মাত্র। তাঁহারা চৈত্রের প্রথম সপ্তাহে কলিকাতা হইতে যাত্রা করিয়াছেন; ঝড় ঝটিকার উপদ্রব নাই; নব বসন্ত সমাগমে গঙ্গার উভয় পার্শ্বস্থ উদ্যানসকল সুললিত হরিদ্বর্ণে ও নবজাত তৃণাদিতে সুশোভিত; তাঁহারা কোন কোনও বাগানে উঠিয়া দেখিতে লাগিলেন, চক্ষু যেন জুড়াইয়া যাইতে লাগিল! নদীর দুই পার্শে পিককুলের কুহুধ্বনি উঠিতেছে; নদীর মধ্য পর্য্যন্ত সেই ধ্বনি আসিয়া কর্ণে স্বর-সুধা বর্ষণ করিতেছে; জননী বার বার বলিতেছেন—"মহেশ, কি ভাল সময়েই বাহির হয়েছ, কাণ জুড়িয়ে গেল!" নিস্তারিণী কিছু ভাবুক মেয়ে, তাঁর মন প্রাণ আনন্দে প্লাবিত; কয়দিনে তাঁর চেহারা যেন বদলাইয়া যাইতেছে! তাঁর মুখ যেন বসন্তের ফুলের ন্যায় ফুটিয়া উঠিতেছে! কৃপা খুকীকে লইয়াই

ব্যস্ত; তাকে বুকে ধরা, তাকে নাচান, তাকে গরু বাছুর দেখান, তাকে বুকে ধরে গঙ্গাতীরে বেড়ান,—এই তার প্রধান কাজ; সে প্রবাহিত নদীর জলরাশির প্রতি দৃষ্টিপাত করেই বা কখন, গাছ পালাই বা দেখে কখন! ক্ষীরদা খুকীর পরিচর্য্যা ও শাশুড়ীর কাজের সাহায্য লইয়াই ব্যস্ত; জগদ্ধাত্রীদেবী স্নানান্তে রাঁধিতে বসিলে, তাঁর কাপড় কাচিয়া দেওয়া, উনান ধরান, কুট্না কোটা, বাট্না বাটা,—এই সমস্ত লইয়াই বনিয়া যান। নিস্তারিণী হাতের কাজ কাড়িয়া লইতে গেলে কাড়িতে দেন না; বলেন—"আঃ, যাওনা, তুমি ওঁর সঙ্গে একটু বেড়িয়ে এস; আমি ঠাক্‌রুণের কাজটা করি; খুকীকে ফেলে ত যেতে পারি না;" এই বলিয়া তাঁকে তাড়াইয়া দেন; এবং কাজ সারিয়া সত্বর আসিয়া রূপাকে ছুটী দেন। কাজেই নিস্তারিণী, রূপা ও মহেশের সঙ্গে বাগানে ঘোরেন; ফুল ফল সঞ্চয় করেন; "আঃ, কি সুন্দর, কি সুন্দর!" বলেই পাগল!

এইরূপে হাসিতে হাসিতে, আনন্দে ভাসিতে ভাসিতে, তাঁহারা চৈত্রের আঠারই তারিখে বহরমপুরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আসিয়া দেখেন তাঁহাদের জন্য বাড়ী প্রস্তুত। বাড়ীটি দেখিয়াই মহেশের মন চমৎকৃত হইয়া গেল। বাড়ীটি গঙ্গার ধারেই; গঙ্গাতে নামিবার বাঁধাঘাট আছে। মধ্যস্থলে বাঙ্গালী ভদ্রলোকের সপরিবারে বাস করিবার উপযুক্ত একটী সুন্দর দোতলা বাড়ী, চারিধারে কয়েক বিঘা জমীতে বাগান। বাড়ীটির উত্তর ও পূর্ব্ব দিকে আম, কাঁটাল, নীচু, জাম প্রভৃতির গাছ; দক্ষিণদিকে একটী সুন্দর ফুলের বাগান; তাহাতে নানা জাতীয় ফুলের গাছ; ঐ বাগানের দুই পার্শ্বে ভাল ভাল আম ও নীচুর গাছ। তাঁহারা গঙ্গার ঘাট হইতে উঠিয়া বাগানের ধারে দাঁড়াইলেন। ফুলের বাগান দেখিয়া নিস্তারিণী প্রথমে সেই

দিকে গেলেন। নিস্তারিণী আনন্দে পুলকিত হইয়া বলিতে লাগিলেন,—"বাঃ, বাঃ, কি সুন্দর বাগান, দেখলে চোক জুড়িয়ে যায়! আমরা প্রতিদিন এখানে এসে বসবো"। তাঁহারা দেখিলেন একটী আমগাছে একটী তক্তার দোলা ঝুলিতেছে; দেখিয়াই কৃপা করতালি দিয়া বলিতে লাগিল—"বাঃ, কেমন দোলা! এই দোলাতে রোজ দোল খাব।" এই সকল আনন্দ উল্লাসের ভিতর হইতে মহেশ তাঁহাদিগকে বাড়ীর দিকে লইয়া গেলেন; গিয়া দেখেন বাড়ীটির উপর নীচে বারটী ঘর, পাশে রান্নাবাড়ী, তার পাশে গোয়ালবাড়ী;—একটী বৃহৎ পরিবার থাকিবার উপযুক্ত। ঘরে ঘরে ঘুরিয়া দেখেন খাট, টেবল, চেয়ার আলমারি, আয়না প্রভৃতিতে সমুদয় ঘর সাজান;—একেবারে নিখুঁত। তাঁহারা বাড়ীতে উঠিয়া দেখেন, দুই জন চাকর করযোড়ে দণ্ডায়মান। চাল, ডাল, তরকারী, জলের জালা, রাঁধিবার হাঁড়ি ও জ্বালানি কাঠ সমুদয় প্রস্তুত। দেখিয়া নিস্তারিণী ও ক্ষীরদা বলিতে লাগিলেন—"মাগো, এরা কি মানুষ গো, গুছিয়ে রাখতে কিছু বাকি রাখে নি!" জননী গিয়া উপরের বারাণ্ডায় দাঁড়াইয়া বলিতে লাগিলেন—"আঃ! এখানে বসে গঙ্গা দেখে চোক জুড়িয়ে যাবে।"

ক্রমে তাঁহারা সংসার পাতিয়া বসিলেন। ক্ষীরদা ও নিস্তারিণীর উৎসাহ দেখে কে! তাঁহারা প্রয়োজনীয় দ্রব্য সামগ্রীতে ভাঁড়ার ঘর পূর্ণ করিয়া ফেলিলেন; মহেশের পরামর্শক্রমে এক পাচক ব্রাহ্মণ আনাইয়া নিজেদের রান্নার ভার তাহার উপর দিলেন; জগদ্ধাত্রীদেবীর জন্য একটী ছোট রান্নাঘরে তাঁর ইচ্ছামত সমুদয় বন্দোবস্ত করিলেন; নিজেরা খুকীর সেবা ও গৃহস্থালী দেখার কাজে নিযুক্ত হইলেন; প্রতিদিন বৈকালে ফুলের বাগানে গিয়া বসিতে লাগিলেন; কৃপা যাহা বলিয়াছিল তাহাই করিতে লাগিল; প্রতিদিন বৈকালে খুকীকে কোলে করিয়া

আমগাছের দোলাতে গিয়া দোল খাইতে লাগিল; নিস্তারিণী তাহাকে দোল দেন; একবার বা নিজে বসেন, রূপা দোল দেয়; বাড়ীর চারিদিকে প্রাচীর, সুতরাং কেহ দেখে না। এইরূপে সুখে দিন যাইতে লাগিল।

এদিকে ঘর গুছাইয়া বসিতে এবং স্থানীয় লোকদিগের সঙ্গে আলাপ পরিচয় করিতে মহেশের দুই দিন গেল। বিশে চৈত্র তিনি জমিদার দেবীপ্রসাদ বাবুর আফিসে গিয়া জমিদারীর অবস্থা বুঝিতে লাগিলেন; এবং স্বীয় কর্ত্তব্য কাজের বিষয়ে পরামর্শ করিতে লাগিলেন। দেবীপ্রসাদ বাবুর নিজেরও পারিবারিক ব্যয়ের জন্য মাসিক কত দিতে হইবে, তাঁহার জননীর ধর্ম্ম কর্ম্মার্থে কত যাইবে, অপরাপর অতিরিক্ত খরচ কি কি আছে, ঋণ কার কাছে কত আছে, মাতা পুত্রের অবস্থা কি দাঁড়াইয়াছে,—এই সকল দেখিতে ও বুঝিতে প্রতিদিন অনেক ঘণ্টা করিয়া যাইতে লাগিল। অবশেষে ১লা বৈশাখের পূর্ব্বেই মহেশ সমুদয় বুঝিয়া লইলেন। সে বিষয়ে বাবু গোপাললাল তাঁহার বিশেষ সাহায্য করিলেন।

একটা সুখের বিষয় এই, তাঁহাকে দেখিয়া ও তাঁহার কথাবার্ত্তা শুনিয়া, বাবু দেবীপ্রসাদের তাঁহার উপর প্রগাঢ় শ্রদ্ধা জন্মিয়া গেল। দেবীপ্রসাদ বাবু গোপাললালকে বলিলেন—"মা মা, এ কি মানুষ এনেছ! এঁর হাতে বিষয় থাক্‌লে দেনা বেশী দিন থাক্‌বে না।" বাবু গোপাললাল বলিলেন—"দেখ্‌লে ত, আমি বলেছিলাম, এ একটা মানষের মত মানুষ!" যাহা হউক, দেবীপ্রসাদের শ্রদ্ধার এই একটা ফল দেখা গেল যে, দুই দিনের মধ্যেই সেই বাড়ীর আস্তাবলে একখানা গাড়ী ও একটা ঘোড়া আসিয়া আশ্রয় করিল; একজন চিঠিপত্র বহিবার জন্ত বেহারাও আসিল। সেই বেহারা আসিয়া

মহেশের হাতে এক পত্র দিল; তাহাতে বাবু গোপাললাল লিখিয়াছেন যে, ঐ গাড়ী ঘোড়া সেই আস্তাবলেই থাকিবে, মহেশের কাজে খাটিবে; তাহার খরচ জমিদারের সরকার হইতেই দেওয়া হইবে; তিনি যে হাঁটিয়া আফিসে যাইবেন তাহা হইবেনা; আর ওই বেহারা তাঁর চিঠিপত্র বহন করিবে। মহেশ দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া গেলেন। কেবল তাহাও নহে, বাড়ীর এক কোণে একটী সুন্দর গোয়ালঘর আছে; একদিন প্রাতে দুইটী গাভী ও দুইটি বাছুর আসিয়া উপস্থিত; বাবু দেবীপ্রসাদ নিজের গোয়াল হইতে পাঠাইয়াছেন।* দেখিয়া জগদ্ধাত্রীদেবীর মন আনন্দে নাচিয়া উঠিল। তাঁহারা সংসার পাতিয়া বসিলেন। সমুদয় বাড়ী পরিষ্কার রাখা, ঘর গুছান, বাজার হাট করা, কাপড় চোপড় কাচা, জগদ্ধাত্রীদেবীর রন্ধনশালায় সাহায্য করা,—এই সকল কাজ পূর্ব্বোক্ত দুইজন চাকরের মধ্যে একজনের উপর পড়িল। বাগান দেখা ও গোয়ালের কাজ করা এবং বাজার হাট করা আর একজনের উপর পড়িল। তদ্ভিন্ন একজন পাচক ব্রাহ্মণ ত রহিল, এবং তাঁহাদের রান্নাঘর পরিষ্কার করা, বাসন কোসন মাজার জন্য একজন ঝীও রাখা হইল। এইরূপে কয়েকদিনের মধ্যেই এক সম্ভ্রান্ত পরিবারের দৈনিক জীবনের সকল আয়োজন হইল।

ইহাতেও নবপ্রতিষ্ঠিত পরিবারটীর সমুদয় ভাব ব্যক্ত হইল না। যাহার যাহা স্বভাব তাহা কোথায় যায়? যথাসময়ে একটী বিলাতী কুকুরের বাচ্চা ও একটী বিড়ালছানা আসিয়া উপস্থিত! তাহারা ধুনিয়া ও রূপীর প্রতিনিধিস্বরূপ হইল। তাহাদিগকে পাইয়া রূপার আনন্দ দেখে কে? সে তাহাদের পরিচর্য্যায় লাগিয়া গেল। রূপা কুকুরটির নাম রাখিল "জহর" এবং বিড়াল ছানাটির নাম রাখিল "মণি"। পাছে জহর মাসীমার রান্নাঘরে প্রবেশ করে, এই ভয়ে তার

গলে লোহার শৃঙ্খল পড়িল; সে নীচের বারাণ্ডায় এক কোণে বাঁধা রহিল। প্রথম প্রথম কয়েকদিন "কেঁউ কেঁউ" করিয়া শৃঙ্খল টানাটানি করিল; পরে নিরুপায় দেখিয়া ধৈর্য্যাবলম্বন করিল। মণির উপরে কোনও শাসন নাই; কেবল জগদ্ধাত্রীদেবীর রান্নাঘরে গিয়া তরকারীতে মুখ দিবার চেষ্টা করিলেই কৃপা মাটিতে মুখ ঠুকিয়া দেয়; এবং সে ঠুকুনি খাইয়া ভদ্র হইতে শিক্ষা করে।

মহেশের সংসারের কাজ কর্ম্ম ও আফিসের কাজ যথারীতি আরম্ভ হইল। প্রাতে ৮টার সময় আফিসে যান, ১১টার পরে আসেন; বৈকালে আবার ৪টার সময়ে যান, এবং রাত্রি ৭॥টার সময়ে আসেন। একদিকে মহেশের আফিসের কাজ কর্ম্ম চলিল; অন্যদিকে গৃহস্থালীর বন্দোবস্তের ভার ক্ষীরদা ও নিস্তারিণীর উপরে রহিল। জননীকে সকল চিন্তা হইতে একেবারে নিষ্কৃতি দেওয়া হইল। তিনি গঙ্গাস্নান, শিবপূজা ও নিজের ধ্যান ধারণাতে মগ্ন হইলেন। মহেশ নীচের একটা ঘর স্বতন্ত্র করিয়া, পূজার আসন, ধূপ, ধূনা প্রভৃতির দ্বারা সাজাইয়া, মাতার পূজার ঘর করিয়া দিলেন; এবং হরচন্দ্র ন্যায়রত্ন নামক সেখানকার কলেজের একজন ভক্ত, সাধু, সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতের সঙ্গে এই বন্দোবস্ত করিলেন যে, প্রতিদিন প্রাতে জগদ্ধাত্রীদেবীর গঙ্গাস্নান ও পূজা শেষ হইলে তিনি আসিবেন, এবং সেই পূজার ঘরে বসিয়া মাতৃদেবীকে ভগবদ্গীতা, শ্রীমদ্ভাগবৎ প্রভৃতি পাঠ করিয়া শুনাইবেন; তৎপরে একঘণ্টাকাল ক্ষীরদা ও নিস্তারিণীকে সংস্কৃত ও বাঙ্গালা পড়াইবেন। ক্ষীরদা ও নিস্তারিণী যাহাতে পাঠে সময় দিতে পারেন এজন্যই একজন পাচক ব্রাহ্মণ রাখা হইয়াছে। জননীর রান্নাঘর স্বতন্ত্র রহিল; সেখানে তিনি নিজের মত চারিটী রাঁধিয়া খাইতে লাগিলেন; কারণ, তিনি পূর্ব্ব হইতেই অপর কাহারও হাতে খাওয়া ত্যাগ করিয়াছিলেন।

ক্ষীরদা ও নিস্তারিণীকে প্রাতে সংস্কৃত ও বাঙ্গালা পড়াইবার বন্দোবস্ত করিয়া মহেশের মন তৃপ্ত হইল না। বৈকালে ৫টা হইতে ৬॥টা পর্য্যন্ত তাঁহাদের দুইজনকে ইংরাজী পড়াইবার জন্য সেখানকার কলেজের একজন মাষ্টারকে নিযুক্ত করিলেন; এবং ন্যায়রত্ন মহাশয়কে মাসে পনর টাকা ও ইংরাজী শিক্ষককে মাসে দশ টাকা করিয়া দিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। ওদিকে কৃপাকে নিকটস্থ মিশনরি মেমদের এক স্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দিলেন। প্রাতে তাঁহাকে আফিস হইতে আনিতে যাইবার সময় গাড়ী কৃপাকে স্কুলে দিয়া যায়; এবং বৈকালে তাঁহাকে আফিসে পৌছাইয়া আসিবার সময় সেই গাড়ী তাহাকে লইয়া আসে। জগদ্ধাত্রী-দেবী পূর্ব্ব হইতেই স্ত্রীশিক্ষার পক্ষপাতিনী হইয়াছিলেন; সুতরাং তিনি মেয়েদের এই পড়াশুনাতে আপত্তি না করিয়া বরং আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। দুপুর বেলা তিনি নিদ্রা হইতে উঠিলে, ক্ষীরদা বা নিস্তারিণী গিয়া তাঁহাকে রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি পড়িয়া শুনাইতে লাগিলেন। এইরূপে দিন সুখে কাটিতে লাগিল।

মহেশের আফিসের কাজে দৃঢ়চিত্ততা, ন্যায়পরায়ণতা ও নিঃস্বার্থতা দেখিয়া, জমিদার বাড়ীর মানুষেরা অবাক হইতে লাগিলেন। এত একাগ্রচিত্তে মানুষ যে কাজ করিতে পারে তাহা যেন তাঁহারা অগ্রে দেখেন নাই। বাস্তবিক তিনি এই আফিসের কাজটাতে সমগ্র মন প্রাণ যেন ঢালিয়া দিলেন। প্রাতে ৮টার সময় আফিসে যাইবার সময় জননীর পদধূলি লইয়া বলেন—"মা, আশীর্ব্বাদ কর যেন পরের কাজটা ভাল করে করতে পারি।" জননী মাথায় হাত দিয়া বলেন—"তুমি ধার্ম্মিক ছেলে, তুমি ত ভাল করে কাজ করবেই।" সায়ংকালে বাড়ীতে আসিয়া আবার মায়ের চরণে প্রণত হন। তাঁহার কাজের প্রণালী দেখিয়া সকল লোক এমন কি জমিদারের প্রজারা পর্য্যন্ত

চমৎকৃত হইয়া যাইতে লাগিল। অধিক কি যাহাদিগকে তিনি সাজা দিতে লাগিলেন, তাহারাও কুপিত না হইয়া বলিতে লাগিল—"উনি ত সাধু পুরুষ, উনি যা করেন তাই ভাল। বাস্তবিক, ও কাজটা করা আমার ভাল হয় নাই।"

মহেশ সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া কাজে বসিয়া, ক্রমে স্থানীয় ভদ্রলোকদিগের সহিত দেখা সাক্ষাৎ করিতে আরম্ভ করিলেন। সে সময়ে রমাপতি ঘোষ নামে একজন শিক্ষিত ভদ্রলোক সেখানে ডেপুটী কালেক্টরের কাজ করিতেন; তাঁহার ভবনে প্রতিদিন সন্ধ্যার সময় পদস্থ শিক্ষিত ভদ্রলোকদের সমাগম হইত। ঘোষজ মহাশয়ের অনুরোধে মহেশ আফিস হইতে ফিরিবার সময় মধ্যে মধ্যে সেখানে যাইতে লাগিলেন। তাহাতে সহরের অনেক পদস্থ ভদ্রলোকের সঙ্গে তাঁর আলাপ পরিচয় ও বন্ধুতা হইল; তাঁহাদের অনেকে তাঁহার ভবনে দেখা করিতে আসিতে লাগিলেন। ইঁহাদের মধ্যে একজন বিশেষ উল্লেখ যোগ্য; তাঁহার নাম রমণীমোহন ভদ্র; ইনি স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট ডিসপেনসারি ও হাসপাতালের ডাক্তার; ইনি মহেশ অপেক্ষা দুই বৎসরের বড়; কলিকাতায় বাসকালে মহেশের ইঁহার সঙ্গে পরিচয় হয় এবং বন্ধুতা জন্মে; তখন ভদ্র মহাশয় মেডিকেল কলেজে পড়িতেন; এখানে আসার পর সেই বন্ধুতা পাকিয়া উঠিল; মহেশ ডাক্তার ভদ্রকে লইয়া মাতার সহিত ও বাড়ীর মেয়েদের সহিত পরিচিত করিয়া দিলেন; মহেশের বাড়ী যেন ডাক্তার ভদ্রের সহোদরের বাড়ীর ন্যায় হইয়া পড়িল; তিনি প্রায় প্রতিদিন সন্ধ্যায় সময় ইঁহাদের বাড়ীতে আসিতে লাগিলেন।

বলা বাহুল্যমাত্র যে, ক্ষীরদা ও নিস্তারিণী তাঁহার প্রধান আকর্ষণের জিনিস হইয়া দাঁড়াইলেন। প্রায় প্রতিদিন সায়ংকালে, আফিস হইতে ঘরে ফিরিয়া, মহেশ দেখিতে পান যে, ডাক্তার ভদ্র খুকীকে কোলে করিয়া

হয় বসিবার ঘরে, না হয় সম্মুখের বারাণ্ডাতে, এক চেয়ারে বসিয়া আছেন; রুপা তাঁর পার্শ্বে দাঁড়াইয়া, তাঁর স্কন্ধে হাত দিয়া আছে; এবং ক্ষীরদা ও নিস্তারিণী সম্মুখে এক চেয়ারে বসিয়া তাঁহার সহিত গল্প করিতেছেন ও প্রাণ খুলিয়া হাসিতেছেন; দেখিয়া তাঁর মন বড়ই আনন্দিত হয়।

ডাক্তার ভদ্রের সাহায্যে গোবিনচাঁদ মিত্র নামক একজন ভদ্রলোকের সহিত মহেশের পরিচয় ও বন্ধুতা হইল। তিনি বড় জ্ঞানানুরাগী মানুষ। লোকে বলে তাঁর লাইব্রেরীর বাতিক আছে; ক্রমাগত নূতন নূতন বই আনাইতেছেন আর লাইব্রেরী পূর্ণ করিতেছেন; এবং বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ন্যায় এক একখানি পুস্তকে কেনার মূল্য অপেক্ষা বাঁধানর মূল্য অধিক দিতেছেন। এই ত মহেশের মনের মত মানুষ! মহেশ তাঁহাকে পাইয়া যেন জড়াইয়া ধরিলেন। দুদিনের আলাপে ভদ্রলোকটীর বুঝিতে বাকি থাকিল না যে, তাঁহার মত আর একটী পড়া-পাগল মানুষ আসিয়াছে। তিনি মহেশের নিকট আপনার লাইব্রেরী একেবারে খুলিয়া দিলেন। মহেশ ভাল ভাল বই আনিয়া নিজের ঘর পূর্ণ করিতে লাগিলেন; এবং কাগজ পত্র দেখিয়া, কলিকাতায় সংবাদ লইয়া, মিত্র মহাশয়কে বই কেনার বিষয়ে পরামর্শ দিতে লাগিলেন।

ডাক্তার ভদ্র একদিন বৈকালে তিনটি যুবককে আনিয়া মহেশের সঙ্গে পরিচিত করিয়া দিলেন। তাহাদের নাম প্রবোধ, প্রকাশ ও প্রসন্ন। তিনজনের নামের অগ্রেই "প্র" এবং তিন জনেই ব্রাহ্মণ-সন্তান,—ইহা লইয়া খুব হাসাহাসি হইল। মহেশ বলিলেন—"তুমি ইহাদিগকে প্রভাতে বা প্রদোষকালে আনিলে না কেন? অথবা সন্ধ্যাতে প্রদীপ জ্বালিলেও আনিতে পারিতে।" যাহা হউক যুবক কয়টীর বয়স আঠার হইতে বিশ বৎসরের মধ্যে। তিনজনেই স্থানীয় কলেজের ছাত্র এবং তিনজনেরই

পাঠে বড় অনুরাগ। তিনজনেই গোবিনচাঁদ মিত্র মহাশয়ের লাইব্রেরী হইতে বই লইয়া পড়িয়া থাকে। দুই চারিদিনের মধ্যে মহেশের সহিত তিনজনের এমনি মনে মনে মিল হইল যে, তিনজনেই তাঁর গোঁড়া ও অনুগত হইয়া পড়িল। মহেশ তাহাদিগকে মেয়েদের সহিত পরিচিত করিয়া দিলেন। জগদ্ধাত্রী দেবী তাহাদিগকে পাইয়া বড়ই প্রীত হইলেন। তাহারা মহেশের অনুপস্থিতি কালেও, সকালে ও বৈকালে আসিয়া মেয়েদের সঙ্গে দেখা করিতে লাগিল; এবং জগদ্ধাত্রীদেবীর ফাই ফরমাজ খাটিয়া আপনাদিগকে ধন্য ও কৃতার্থ মনে করিতে লাগিল। তাহাদের মধ্যে প্রবোধের অবস্থা বড় মন্দ; সে পরাশ্রয়ে আছে; এবং পরের সাহায্যে নিজের সামান্য ব্যয় নির্ব্বাহ করে; মহেশ তাহাকে বৈকালে আসিয়া কৃপাকে পড়াইবার বন্দোবস্ত করিলেন; এবং মাসে পাঁচ টাকা বেতন দিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। তদ্ভিন্ন প্রতি রবিবার বৈকালে তাহাদিগকে লইয়া একঘণ্টাকাল বসিয়া নানা বিষয়ে আলাপ করিবার নিয়ম করিলেন। এই সংবাদে ইহাদের বন্ধু আরও কয়েকটি ছেলে জুটিয়া গেল। রবিবার বৈকালে একটা আলোচনা সভার মত বসিতে আরম্ভ হইল। তাহাতে মহেশ উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট পুস্তক হইতে বিশেষ বিশেষ স্থান পড়িয়া শুনাইতেন; এবং সেই বিষয়ে কথাবার্ত্তা হইত। দেখিতে দেখিতে তাঁহার অনুরাগী ভক্তদল বাড়িয়া যাইতে লাগিল। সহরে যুবকদের মুখে মুখে তাঁহার নাম ছড়াইয়া পড়িল।

ইহার কিছুদিন পরেই মহেশ প্রবোধকে নিজ বাড়ীতে স্থান দিলেন। সে আসিয়া নীচের দক্ষিণদিকের ঘর আশ্রয় করিল; এবং আপনার প্রয়োজন মত সমুদয় গুছাইয়া বসিল। মহেশ তাহার সমুদয় ব্যয়ভার বহন করিতে প্রস্তুত হইলেন। প্রবোধের পূর্ণ নাম প্রবোধচন্দ্র চাটুয্যে, নিবাস নবদ্বীপের নিকটে একগ্রামে; পিতা অকালে গত হইয়াছেন; বিধবা

মাতা মাত্র ভরসা ছিলেন, তিনিও অল্পদিন হইল গত হইয়াছেন। মহেশ তাহার জ্যেষ্ঠের স্থান অধিকার করিলেন। সে মহেশের ন্যায় প্রতিদিন প্রাতে উঠিয়া জগদ্ধাত্রীদেবীর পদধূলি লইতে আরম্ভ করিল; জগদ্ধাত্রীদেবীও তাহাকে স্নেহের চক্ষে দেখিতে আরম্ভ করিলেন। নিস্তারিণী ও ক্ষীরদা একজন ডানহাতের দোয়ার পাইলেন; প্রবোধ মহোৎসাহে ও পরমানন্দে তাঁহাদের ফাই-ফরমাজ খাটা, বাজার করা, লোকজন ডাকা, চাকরবাকর দেখা, ইত্যাদি সমুদয় কাজ করিতে লাগিল। কৃপা প্রাতে ও সন্ধ্যাতে প্রবোধের ঘরে বসিয়া পড়াশুনা আরম্ভ করিল; দেখিতে দেখিতে তাহার পড়াশুনার বিশেষ উন্নতি হইতে লাগিল। ইহা দেখিয়া মহেশ বড়ই প্রীত হইলেন। এদিকে প্রবোধ নিজে সর্ব্বপ্রকার চিন্তা হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া, এবং বাড়ীর লোকের ভালবাসা ও সাহায্য লাভ করিয়া, নিজের পাঠে ও আত্মোন্নতি সাধনে দেহমন নিয়োগ করিল। কলেজে তাহার সুখ্যাতি বাহির হইয়া গেল।

এইরূপে বহুদিনের সংগ্রামের পর, মহেশ, নিশ্চিন্তমনে, প্রসন্নচিত্তে ও আনন্দিত অন্তরে, নূতন স্থানে, নূতন অবস্থার মধ্যে, নূতন কাজে বসিয়া গেলেন। জগদ্ধাত্রী দেবী হাতের কাছে গঙ্গা ও দেবমন্দির পাইয়া নিজের জপ, তপ, আরাধনাতে নিমগ্ন হইলেন; নিস্তারিণী ও ক্ষীরদা মহোৎসাহে গৃহকর্ম্ম ও জ্ঞানালোচনাতে নিমগ্ন হইলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

সংসার গুছাইয়া বসিবার কয়েক মাসের মধ্যেই সহরে মহেশের সুখ্যাতি প্রচার হইয়া গেল। সকলেই বলে—"কি মানুষ! কি মানুষ! যেমন বিদ্বান, তেমনি বুদ্ধিমান, তেমনি কাজের লোক, তেমনি ধার্ম্মিক।" দোকানি-পসারি সকলের মধ্যেই এই কথা রাষ্ট্র হইল। তিনি গাড়ি করিয়া রাস্তায় বাহির হইলেই লোকে আঙ্গুল বাড়াইয়া দেখাইয়া দেয়; তাঁর কোনও কাজ পড়িলে সকল শ্রেণীর লোকে সাহায্য করিবার জন্য ব্যগ্র হয়; দোকানিরা তাঁর কাছে দরদস্তুর করে না; যাহা লইবে একেবারে বলিয়া দেয়; তিনিও দরদস্তুর করা ভাল বাসেন না; যে যাহা চায় তাই দিয়া আসেন; বলেন—"যে লাভ নিয়ে সন্তুষ্ট হও তাই ভেবে আমাকে দাম বল; আমি দর কষাকষি করতে পারব না"। কতবার এমন হইল, দোকানি যাহা চাহিয়াছে, তিনি দিতে যাইতেছেন, তখন দোকানি করযোড় করিয়া বলিল,—"কর্ত্তা, বারআনা কম দিন; আপনি বড় ভাল লোক, আপনার কাছে এত নেওয়া হবে না।" কি আশ্চর্য্য! বাড়ীর চাকরগুলি পর্য্যন্ত এই অল্প দিনের মধ্যে কি দেখিল, কি শুনিল যে, একেবারে বাবুর গোঁড়া হইয়া গেল; তারা তাঁর কথাতে যেন উঠিতে, বসিতে, মরিতে পারে। একদিনকার একটী ঘটনা উল্লেখযোগ্য। একদিন অপর কোনও বাড়ীর দ্বারবান এই বাড়ীর দ্বারবানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছে; দরজাতে দাঁড়াইয়া দুইজনে কথা হইতেছে; সমাগত ব্যক্তি বলিল—"তোমার বাবুর বড় প্রশংসা শুনি, কি রকম মানুষ বলত?" এই কথা শুনিয়া ঐ বাড়ীর দ্বারবান বলিল—"আমাকে ত ওবাড়ীর বাবুরা দিয়েছিলেন;

ভেবেছিলাম, কি রকম মনিবের কাছে যাচ্ছি জানি না; কিন্তু এই ক্রয় মাসে যা দেখচি তা আশ্চর্য্য।” এই বলিয়া মহেশের গুণাবলী কীর্ত্তন করিতে প্রবৃত্ত হইল। কিরূপ ন্যায়পরায়ণ, ধার্ম্মিক, পরোপকারী. চাকর-বাকরের প্রতি কিরূপ ভালবাসা তাহা বলিতে বলিতে সে উৎসাহে পূর্ণ হইয়া উঠিল; এবং আকাশের দিকে দুই হাত তুলিয়া বলিয়া উঠিল—“হে নারায়ণ! নারায়ণ! আমার বাবুকে দীর্ঘজীবী কর।” সেই সময় দুইজন ভদ্রলোক সেখান দিয়া যাইতেছিলেন, তাঁহারা সেইদৃশ্য দেখিয়া চমকিত হইয়া উঠিলেন; এবং বাহিরে গিয়া সেই কথা নিজ নিজ বন্ধুদের গোচর করিলেন। তাহাও মহেশের সুখ্যাতি প্রচার হইবার একটা প্রধান কারণ হইল। ভিতরকার কথাটা এই, মহেশ বাড়ীতে বসিয়াই দ্বার-বানকে ডাকাইয়া বলিলেন, “বাবুরা যদিও তোমাকে পাঠাইয়াছেন, তুমি আমার দ্বারবান, তুমি আমার কাছে বেতন পাবে, আমার হুকুমে চলবে।” তারপর তার বাড়ী কোথায়, পরিবার পরিজনের মধ্যে কে আছে, তাদের কিরূপে চলে ইত্যাদি সমুদয় সংবাদ লইলেন। মাঝে মাঝে তাদের সংবাদ লইয়া থাকেন। মাঝে একবার দ্বারবানের পীড়া হইয়া সে দশদিন শয্যাস্থ ছিল; মহেশ দিনে তিনবার তাহাকে দেখিতেন; তাহার সেবার জন্য নিজব্যয়ে একজন খোট্টাকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন; এবং সহরের একজন খোট্টা কবিরাজ আনাইয়া তার দ্বারা চিকিৎসা করাইয়াছিলেন। সে কয়দিন তাঁহাকে বড়ই চিন্তিত দেখা গিয়াছিল; দ্বারবান যখন উঠিল তখন তাঁহাকে আনন্দিত দেখা গেল। তিনি দ্বারবানকে বলিলেন—“তুমি সেরে উঠলে, নারায়ণকে ধন্যবাদ কর; আমার ভয় হয়েছিল, যদি মারা যাও দেশে তোমার স্ত্রীপুত্রের দশা কি হবে।” এরূপ মানুষকে দ্বারবান ভালবাসিবে তাহা কি আশ্চর্য্যের বিষয়?

যখন বাহিরে এইরূপ আন্দোলন চলিতেছে, তখন বাবু দেবীপ্রসাদের পরিবার মধ্যেও মহেশের গুণাবলীর বিষয় কথাবার্ত্তা চলিতে লাগিল। দেবীপ্রসাদ একদিন বাড়ীর মধ্যে গিয়া জননীকে বলিলেন—"মা! এতদিনের পর আমাকে বাঁচাবার লোক এসেছে ; বাবু সাহেব কি কাজের লোক, কি ধার্ম্মিক মানুষ! আমার জমিদারীর কাজকর্ম্ম যেন জেঁকে উঠেছে।" এই কথা শোনার পর দেবীপ্রসাদের জননী স্থির করিলেন যে, একদিন মহেশকে ডাকাইয়া তাঁহাকে ধন্যবাদ করিবেন; এবং তাঁহার বাড়ীর মেয়েদের আনিবার জন্য অনুরোধ করিবেন;—উদ্দেশ্য, তাঁহাদিগকে খাওয়াইয়া ও মূল্যবান বস্ত্রাদি উপহার দিয়া নিজেদের কৃতজ্ঞতা জানান। তদনুসারে একদিন স্বীয় ভ্রাতা বাবু গোপাললালের সম্মতিক্রমে মহেশকে নিজের নিকট ডাকাইয়া পাঠাইলেন। মহেশ ভিতরবাড়ীর এক নীচের ঘরে গিয়া দেখেন যে বাবু গোপাললাল সেই ঘরে বসিয়া আছেন। তিনি বলিলেন—"আমার ভগ্নী আপনাকে এক অনুরোধ করবেন সেইজন্য ডেকেছেন"। এই কথা বলিতে না বলিতে গৃহিণী ঠাকুরাণী দাসী সঙ্গে আসিয়া উপস্থিত; আপাদ মস্তক গরদের চাদরে আবৃত; ঘোমটায় অর্দ্ধেক মুখ ঢাকা; তাঁহাকে দেখিয়া মহেশ উঠিয়া দাঁড়াইলেন। গৃহিণীঠাকুরাণী তাঁর পদে প্রণতা হইয়া পদধূলি লইলেন। পরে উভয়ে আসন পরিগ্রহ করিলে, গৃহিণী স্বীয় ভ্রাতার দ্বারা যাহা বলিলেন তাহা এই:—"আমার ছেলেকে বাঁচাবার জন্য ভগবান আপনাকে এনেছেন; আপনি কি কাজের মানুষ তা শুনতে পাচ্ছি; এই কয় মাসে কত টাকা ঋণশোধ দিলেন তাই শুনে আশ্চর্য্যান্বিত হয়েছি; আমরা আপনারই ঘরের লোক এই মনে করবেন।" মহেশ ত লজ্জা ও সম্ভ্রমে জড়সড়; বিনীত ভাবে উত্তর করিলেন, "আপনারা যা বলেন তা আপনাদেরই সদাশয়তার জন্য; আপনারা

বড় ভাল লোক; আমি এমন কি করেছি? যা করেছি তাত সকল দেওয়ানেরই করা উচিত; তবে সে কাজটা যে আপনাদের ভাল লাগচে, সে আপনাদের মন ভাল বলে; এটা আমার সৌভাগ্য।"

অবশেষে গৃহিণী ঠাকুরাণী একদিন বাড়ীর মেয়েদিগকে লইয়া আসিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। মহেশ প্রতিশ্রুত হইয়া আসিলেন। তৎপরে একদিন বৈকালে আফিসে যাইবার সময় মেয়েদিগকে লইয়া গেলেন। তাঁহারা গিয়া অন্তঃপুরের প্রাঙ্গণে দাঁড়াইবা মাত্র দেবীপ্রসাদের জননী, বাবু গোপাললালের পত্নী, দেবীপ্রসাদের পত্নী, ও অপর দুইটী নারী আসিয়া গলবস্ত্রে জগদ্ধাত্রী দেবীর চরণে প্রণত হইলেন; এবং ক্ষীরদা, নিস্তারিণী ও রূপার কণ্ঠালিঙ্গন পূর্ব্বক অভ্যর্থনা করিলেন। খুকী কোলে ছিল, তাহাকে সকলে বুকে বুকে লইয়া অনেক আদর করিলেন। ইহার পর মেয়েদিগকে ভিতর বাড়ী দেখাইয়া আনা হইল। গৃহিণী ঠাকুরাণী সংক্ষেপে তাঁহাদের পরিবারের ইতিবৃত্ত বর্ণন করিলেন। তাঁহারা কিরূপে এক সময়ে উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে ছিলেন; কিরূপে বহুশতাব্দী পূর্ব্বে তাঁহাদের পিতৃপুরুষ এদেশে শাসনকর্ত্তা হইয়া আসিয়াছিলেন; কিরূপে সেই অবধি তাঁহারা এদেশে রহিয়া গিয়াছেন;—এই সকল বিস্তৃতরূপে বলিতে লাগিলেন। ইতি মধ্যে রূপার বড় থালাতে করিয়া দুই তিন প্রকার মিষ্টান্ন আসিয়া উপস্থিত হইল। জগদ্ধাত্রী দেবী তাহার ত্রিসীমাতেও গেলেন না; অপরেরা, বিশেষতঃ রূপা, সেগুলির সমাদর রক্ষা করিলেন। তাঁহাদের আহার হইলে তিন জনকে তিনটি পান দেওয়া হইল; এরূপ পান তাঁহারা কখনও খান নাই! পরে জানা গেল, ঐ পানের এক একটির মূল্য এক এক টাকা! তৎপরে আসিবার সময় গৃহিণী ঠাকুরাণী জগদ্ধাত্রী দেবীকে একখানি বহুমূল্য

গরদের থান, নিস্তারিণীকে এক গরদের থান, ক্ষীরদাকে উজ্জ্বল সোনালী রঙের এক রেশমী সাড়ী ও কৃপাকে একপ্রকার দোরঙ্গা সাড়ী উপহার দিলেন। অবশেষে গৃহিণীঠাকুরাণী খুকীকে নিজ ক্রোড়ে লইয়া, তার হাতের বালা খুলিয়া লইয়া, চমৎকার একজোড়া সোণার বালা পরাইয়া দিলেন; এবং গলায় এক হীরকমণ্ডিত সোণার হার পরাইলেন। সকলে দেখিয়া আশ্চর্যান্বিত হইয়া ভাবিতে লাগিলেন—"গোপনে খুকীর হাতের মাপ ক'রে আনাইলেন?" মেয়েরা আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বাড়ী ফিরিলেন। বন্ধু বান্ধবেরা এই সংবাদ পাইয়া বলিতে লাগিলেন— "এটা কি তা বুঝলে না? মহেশ বাবুর কাজে তাঁরা সন্তুষ্ট হয়েছেন, এটা তার পুরস্কার।" মহেশের কর্ম্মের ছয়মাস অতীত হইলে আর এক পুরস্কার আসিয়া উপস্থিত হইল; বাবু গোপাল লাল পত্র লিখিয়া জানাইলেন যে, তাঁহার বেতন পঞ্চাশ টাকা বৃদ্ধি হইল।

একদিন অনুরক্ত যুবকদলের সহিত কথাবার্ত্তা কহিতে কহিতে এই প্রস্তাব উঠিল যে, একটা আত্মোন্নতি-সভা ও তৎসংলগ্ন একটা পাঠাগার স্থাপন করিলে ভাল হয়। মহেশ সেই প্রস্তাবে আত্মসমর্পণ করিলেন। কলেজের যে সকল ছেলে এই আত্মোন্নতি-সভাতে যোগ দিতে ইচ্ছুক, তাঁহাদের নাম সংগৃহীত হইতে লাগিল; অপরদিকে ডাক্তার ভদ্র, শিক্ষিত ভদ্রলোকদিগের বাড়ীতে বাড়ীতে ঘুরিয়া লাইব্রেরীর জন্য অর্থসংগ্রহ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ছেলেরাও কোমর বাঁধিয়া সেই কাজে লাগিয়া গেল। এই আন্দোলনের সংবাদ পাইয়া বাবু গোপাললাল ও দেবীপ্রসাদ বড় হলবিশিষ্ট গঙ্গাতীরবর্ত্তী একটি বৈঠকখানা বাড়ী তাঁহাদের ব্যবহারের জন্য দিলেন; এবং আবশ্যকমত চেয়ার, টেবল, বেঞ্চ প্রভৃতি প্রেরণ করিলেন। সেই হলে এক রবিবার সন্ধ্যার সময় আত্মোন্নতি বিষয়ে মহেশের প্রথম বক্তৃতা হইল; আত্মোন্নতি কাহাকে বলে এবং তাহা

কিরূপে সাধন করিতে হয়, তাহা সেই বক্তৃতাতে তিনি বিশদরূপে বুঝাইয়া দিলেন; উন্নতি ও মহত্ত্ব কি পরিমাণে মানবের নিজের হাতে আছে, উন্নতির দ্বার কি পরিমাণে চারিদিক খোলা আছে, আত্মোন্নতিতে মন দিলে মানবজীবনের ক্ষুদ্র মহৎ প্রলোভন সকল কিরূপে অতিক্রম করা যায়, ইত্যাদি তিনি যখন বিশদ ভাষায় ব্যক্ত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, তখন শ্রোতৃবৃন্দের অন্তরে একপ্রকার অভূতপূর্ব্ব ভাবের উদয় হইল; আত্মোন্নতি স্পৃহা বহু হৃদয়ে উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল; এবং সহরে একটা ভাল পাঠাগার স্থাপনের জন্য অনেকে প্রতিজ্ঞারূঢ় হইলেন। ইহার পরে, একদিন ডাক্তার ভদ্র, ও অপর দুই দিন আরও দুইজন শিক্ষিত ভদ্রলোক ঐ হলে বক্তৃতা দিলেন।

এই সকল বক্তৃতার পরে কয়েক দিনের মধ্যেই চারিদিকে লাইব্রেরীর জন্য চাঁদা উঠিতে লাগিল। গ্রন্থাবলীর তালিকা লইয়া একজন লোক কলিকাতায় গেল; এবং পাঠাগারে বসিয়া পাঠ করিবার এবং আবশ্যক মত পুস্তকাদি লইবার সমুদয় বন্দোবস্ত হইল। মহেশ পরামর্শ-দাতারূপে পশ্চাতে রহিলেন; এবং ডাক্তার ভদ্র সম্মুখে থাকিয়া প্রধান কাজ করিতে লাগিলেন। এই সভা হইতে স্বদেশ বিদেশের অনেকগুলি সাপ্তাহিক, মাসিক, ত্রৈমাসিক পত্রিকা লইবার নিয়ম প্রবর্ত্তিত হইল; এবং তাহার অনেকগুলি বিশেষ নিয়মে বাড়ীতে বাড়ীতে ঘুরিতে লাগিল; কিছু দিনের মধ্যেই স্থানীয় হাওয়াটা যেন বদলাইয়া যাইতে লাগিল; অগ্রে পাঁচজন ভদ্রলোক একসঙ্গে বসিলেই হয় পরনিন্দা, না হয় গবর্ণমেন্টের দোষকীর্ত্তন, না হয় আদালতের মামলা মকর্দ্দমার আলোচনাতেই সময় কাটাইতেন;—এক্ষণে দেশহিতকর বিষয় সকলের আলোচনা আরম্ভ হইল; মহেশ দেখিয়া প্রীত হইতে লাগিলেন।

আত্মোন্নতি-সভার পাঠাগার সাজাইয়া না বসিতে বসিতে আর এক

আন্দোলন উপস্থিত। উড়িষ্যা হইতে সংবাদ আসিল যে, সেখানে ঘোর দুর্ভিক্ষ হইয়া হাজার হাজার মানুষ অনাহারে মরিতেছে; শিশু কোলে মা পথে পড়িয়া মরিয়া আছে, শিশু মৃত মাতার স্তনপানের চেষ্টা করিতেছে, পত্নী পতির হাতের ভাত কাড়িয়া খাইতেছে; সহরের রাস্তা সকলে অনাহারে পীড়িত, রুগ্ন ভগ্ন নরনারী ঠেলিয়া অগ্রসর হওয়া কঠিন ইত্যাদি ইত্যাদি। এই সকল সংবাদে বাঙ্গালা দেশের সকল সহরেরই লোকের চিত্ত চমকিয়া উঠিল; কলিকাতাতে চাঁদা সংগ্রহ আরম্ভ হইল। পরোপকার আত্মোন্নতি-সভার এক উদ্দেশ্যের মধ্যে, সুতরাং মহেশ আত্মোন্নতি-সভাকে সহায় করিয়া চাঁদা সংগ্রহে প্রবৃত্ত হইলেন। এই সময়ে তাঁর বিশেষ অনুগত সেই তিনটী ছেলে ও তাহাদের বন্ধুগণ বড় কাজে আসিল: তাহারা প্রথমে ঢোল বাজাইয়া, হাটে, বাজারে, দোকানে, ভদ্রলোকের দ্বারে, উচ্চৈঃস্বরে উড়িষ্যার দুর্ভিক্ষের অবস্থা জানাইতে লাগিল; এবং কয়েকদিন পরে এক প্রকাশ্য স্থানে সভা হইবে বলিয়া বিজ্ঞাপন দিল। তাহারা যেন সহরটা মাথায় করিয়া তুলিল। নির্দ্দিষ্ট দিনে এক পড়ো মাঠের মধ্যে চাঁদোয়া টাঙ্গাইয়া এক মহা সভা হইল; শিক্ষিত, অশিক্ষিত, দোকানি, পসারি, কেহ আসিতে আর বাকি থাকিল না। ঐ সভাতে মহেশ, ডাক্তার ভদ্র, কলেজের একজন প্রফেসার প্রভৃতি কয়েকজন বক্তৃতা করিলেন। সকলেরই বক্তৃতাতে শ্রোতৃবৃন্দের মন আলোড়িত হইতে লাগিল; চারিদিকে ক্রন্দনধ্বনি উঠিল; সাধারণ প্রজাবৃন্দ "হা ভগবান! হা ভগবান!" বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিল; সভাতেই অনেক টাকা উঠিয়া গেল; কেহ গাত্র হইতে গরদের চাদরখানা, কেহ পকেট হইতে ঘড়িটা দান করিলেন।

তারপর ছেলেরা যখন গর্ত্তকাটা টিনের বাক্স লইয়া দীন ভিখারীর বেশে চাঁদা সংগ্রহ করিতে বাহির হইল, তখন দোকানি, পসারি, কামার,

কুমার, চাষাভূষা, সকলে সেই বাক্সে যাহার যেরূপ ক্ষমতা টাকা আধুলি, সিকি, দুয়ানি প্রভৃতি ফেলিতে লাগিল; এবং বাক্সগুলি দেখিতে দেখিতে টাকা পয়সাতে পূর্ণ হইয়া যাইতে লাগিল। এইরূপ ঝোঁক যখন ধরে, তখন তাহা গৃহস্থের বাড়ীতেও ব্যাপ্ত হয়। ছেলেরা গৃহস্থদের বাড়ীতে বাড়ীতে গিয়া মেয়েদের নিকট যিনি যাহা দিতে পারেন, সংগ্রহ করিতে লাগিল। একটি গরীব বিধবা নিজের হাতে পাকানো কয়েক তাল দড়ি দিলেন; বলিলেন—"বাবা, এগুলি বিক্রয় করে নিয়ো।" আর একজন বিধবা নিজের উঠানের কুমড়ার গাছ দেখাইয়া বলিলেন—"বাবা, ঐ কয়টা কুমড়া নিয়ে যাও, বিক্রী করে নিও।" ছেলেরা কিছুতেই পিছপা নয়! দড়ির তাল লইল, কুমড়া লইল; বিক্রয় করিয়া পয়সা জমা দিল। এইরূপে সে ক্ষেত্রে বহরমপুর হইতে যে টাকা সংগ্রহ হইল, তাহার বিবরণ সংবাদপত্রে বাহির হইলে, লোকে আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া গেল।

তারপর আর একটি কাজ আসিয়া পড়িল। একদিন সন্ধ্যার পর মহেশ আফিস হইতে ফিরিবার সময়, একটা কাজের জন্য, একজন উচ্চপদস্থ শিক্ষিত ভদ্রলোকের বাড়ীতে গেলেন। গিয়া দেখেন, তিনি বোধ হয় মাতাল অবস্থাতে আছেন; তাঁর বাড়ীর লোকেরা তাঁকে লইয়া ব্যস্ত; তাহারা তাঁকে বাড়ীর ভিতরে ধরিয়া রাখিতে চায়, কিন্তু পারিয়া উঠিতেছে না; তিনি তাহাদের হাত ছাড়াইয়া টলিতে টলিতে বাহিরের দিকে আসিতেছেন। ইহা দেখিয়াই মহেশ পলাইয়া আসিলেন; বাড়ীর লোকদিগকে খবর দিলেন না। কিন্তু গৃহে ফিরিয়া তাঁর মন বড়ই খারাপ হইয়া গেল; আসিয়া দেখেন ডাক্তার ভদ্র নিস্তারিণীর সঙ্গে কথা কহিতেছেন; মহেশ তাঁদের কাণে নিজের মনের দুঃখ ঢালিয়া দিলেন।

ডাক্তার ভদ্র। ওঃ, তুমি বুঝি তা জান না! এখানকার অনেক ভদ্রলোক মদ খান; বিশেষতঃ কেরাণীদলের অল্প শিক্ষিত ব্যক্তিদের মধ্যে সুরাপান দিন দিন বাড়ছে; শনিবার রাত্রে এক এক বাড়ীতে যে আড্ডা হয়, তা দেখলে লজ্জা হয়; দেশের সর্ব্বনাশ হতে চলেছে।

মহেশ। আমি ত এত কথা জানতাম না। কলকেতার কথা স্বতন্ত্র কথা; সেখানে শিক্ষিত ভদ্রলোকের ছেলে, বেহুঁস হয়ে রাস্তায় পড়ে আছে দেখেছি; ভদ্রলোকের ছেলেকে ঝোলায় করে পুলিসে নিয়ে যাচ্চে দেখেছি; ভদ্রলোকের ছেলে মদের দোকানে ঢুকে হাতে পয়সা না থাকাতে খবরের কাগজ কোমরে জড়িয়ে কাপড়খানা দিয়ে মদ খাচ্চে শুনেছি; এতদূরে পল্লীগ্রামেও সুরাপান বাড়ছে, দেশের সর্ব্বনাশ হতে বসলো; এখন কি করা যায়?

মহেশের বিষন্ন ভাব দেখিয়া নিস্তারিণী ক্ষীরদাকে সংবাদ দিবার জন্য সে ক্ষেত্র হইতে অপসৃত হইলেন; মহেশ ডাক্তার ভদ্রের পার্শ্বে আসন পরিগ্রহ করিলেন; দুই জনে কথা আরম্ভ হইল।

মহেশ। তাইত রমণী! এ বিষয়ে আমাদের কিছু করবার আছে। একে দেশের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অবস্থা ভাল নয়, কোনও রূপে দু দশ টাকা এনে খাচ্চে; তার উপরে যদি এই সব রোগে ধরে তা হলে ত আর রক্ষা নাই!

ডাক্তার ভদ্র। তুমি এখানকার কথা জান না। এখানে ঐ পূব-পাড়ার একজন লোক একা বাড়ীতে থাকে; তার স্ত্রীপুত্র কাছে নাই; তারা দেশে আছে; প্রতি শনিবার রাত্রে তাদের বাড়ীতে জটলা হয়; বাজার হতে মেয়েমানুষ আনে; নাচ, গান, ঢলাঢলি চলতে থাকে।

মহেশ। (দুই কাণে হাত দিয়া) আর বলো না, আর বলো না! শুনলেও পাপ হয়! এখন উপায় কি?

ডাক্তার ভদ্র। কয়েক জন ভদ্রলোক এ বিষয়ে বড়ই কষ্ট পাচ্ছেন। তাঁদের সঙ্গে আমাদের মাঝে মাঝে কথা হয়; তাঁদের কয়েক জনকে তোমার কাছে ডেকে আন্‌ব।

ইহার পর ডাক্তার ভদ্র চলিয়া গেলেন; এবং পরদিন সন্ধ্যার পর তিনটী ভদ্রলোককে লইয়া আসিলেন। মহেশ আফিস হইতে ফিরিয়া দেখেন তিনটী ভদ্রলোক নীচের ঘরে বসিয়া গল্প করিতেছেন; ডাক্তার ভদ্র উপরের বারাণ্ডায় নিস্তারিণীর কাছে আছেন। বলা বাহুল্য মাত্র এ বাড়ীতে নিস্তারিণীই তাঁর সর্ব্বপ্রধান আকর্ষণ।

মহেশ নীচে ভদ্রলোকদিগের নিকটে বসিয়া আলাপ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন; এবং চাকরের দ্বারা ডাক্তার ভদ্রকে উপর হইতে ডাকাইয়া আনিলেন। কয়জনে পরামর্শ করিয়া স্থির হইল যে, সহরে একটি সুরা-পান-নিবারিণী সভা স্থাপন করা হইবে; দেবীপ্রসাদের প্রদত্ত আমোদ-প্রতি-সভার ভবনে তাহার অধিবেশন হইবে, এবং আফিস থাকিবে। সমাগত তিনজনের মধ্যে একজন হরিনারায়ণ ঘোষ তাহার সম্পাদক হইবেন; এবং ডাক্তার ভদ্র সভাপতির কার্য্য করিবেন। এই সভা-পতির পদ লইয়া ডাক্তার ভদ্রের সহিত মহেশের অনেক তর্কবিতর্ক হইল। ডাক্তার ভদ্রের ইচ্ছা মহেশ সভাপতি হন। মহেশ বলিলেন যে তিনি গুরুতর কাজে মগ্ন, তাঁর সময়াভাব। অবশেষে ডাক্তার ভদ্রেরই সভাপতি হওয়া স্থির হইল।

যথাসময়ে ভদ্রলোকদিগের সভা আহ্বান করিয়া সুরাপান-নিবারিণী সভা স্থাপিত হইল। বাবু হরিনারায়ণ ঘোষ তাহার সম্পাদক হইলেন; এবং ডাক্তার ভদ্রকে তাহার সভাপতি করা হইল। সে সভাতে মহেশ ও ডাক্তার ভদ্র দুইজনেই বক্তৃতা করিলেন। ডাক্তার ভদ্র ডাক্তার মানুষ, তিনি শারীরবিধানের দিক্ দিয়া সুরাপানের অনিষ্টকারিতা অতি বিশদ

রূপে বুঝাইয়া দিলেন। সভাস্থলেই অনেকে সভার সভ্যরূপে নাম দিলেন।

ইহার পরে ডাক্তার ভদ্র ও হরিনারায়ণ ঘোষ মহাশয় কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ প্যারীচরণ সরকার মহাশয়কে ও কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়কে পত্র লিখিয়া সুরাপান নিবারণ সম্বন্ধীয় অনেক স্বদেশী বিদেশী পুস্তক পত্রিকাদি আনাইলেন। সেগুলি স্থানীয় শিক্ষিত ব্যক্তিদের মধ্যে বিতরণ করা হইতে লাগিল।

এই সভা স্থাপনের কিছুদিনের মধ্যেই আর এক কাজ আসিয়া উপস্থিত। একদিন মহেশ সংবাদ পাইলেন যে, বহরমপুরের কয়েক মাইলের মধ্যেই গঙ্গার ধারে ইংরাজদিগের একটা সুতার কল কারখানা আছে; তাহাতে অনেক শত পুরুষ ও মেয়ে কাজ করে; ইহাদের অধিকাংশ দূর দূরান্তর হইতে আসিয়াছে; পুরুষেরা অধিকাংশ স্থলেই নিজ নিজ বাসগ্রামে স্ত্রী পুত্র ফেলিয়া আসিয়াছে; মেয়েগুলির অধিকাংশই বিধবা, তাহারা কলিকাতা প্রভৃতি সহরে চাকরাণীগিরি করিতে না গিয়া, এবং খোলার ঘর ভাড়া করিয়া থাকিয়া উপার্জ্জনের দ্বার না খুলিয়া, এখানে দুইটা উপার্জ্জনের দ্বার খুলিয়াছে; দিনে কলে কাজ করে, রাত্রে যে কোনও পুরুষের সঙ্গে সম্মিলিত হয়; অনেক পুরুষ ও মেয়ে বিবাহিত না হইয়াও পতিপত্নীভাবে বাস করিতেছে; স্বদেশ ও আত্মীয় স্বজন হইতে দূরে থাকাতে এই সকল পুরুষ ও নারীর উপরে কোনও শাসন নাই; তাহাদের মধ্যে পানাসক্তি অতিরিক্ত মাত্রাতে বাড়িতেছে; শনিবার বৈকালে তাহারা সপ্তাহের বেতন পায়; নিকটেই মদের দোকান; তারপর পুরুষ মেয়ে মাতাল হইয়া কে কোথায় পড়ে, তাহার ঠিক নাই; যে পাড়ায় ইহারা থাকে শনিবার সন্ধ্যার পর সেখানে গেলে যে দৃশ্য দেখা যায় তাহা বর্ণনা করিবার নহে; কেহ কাহাকে

জড়ায়, কেহ কাহাকে চুম্বন করিতে যায়; রাস্তার ধারে, খানা খন্দে,-পুরুষ মেয়ে বেহুঁস হইয়া পড়িয়া থাকে।

এই সকল বিবরণ শুনিয়া মহেশের মন বড়ই খারাপ হইয়া গেল। তিনি এক রবিবার প্রাতে কতিপয় অনুগত যুবকের সঙ্গে নৌকা করিয়া ঐ কারখানা দেখিতে গেলেন; গিয়া যাহা দেখিলেন, তাহাতে তাঁহার প্রাণ বিষাদে মগ্ন হইয়া গেল; তিনি গভীর চিন্তার ভিতরে পড়িলেন; সেখানে অনুসন্ধান করিয়া জানিলেন যে, ঐ মানুষের মধ্যে কতকগুলি শ্রমজীবী আছে, যাহারা মদ খায় না; এবং যাহাদের ব্যবহার ভাল; তাহাদের মধ্যে অনেকে বয়সে প্রবীণ এবং তাহাদের ধর্মভয় আছে; তিনি খুঁজিয়া খুঁজিয়া ঐরূপ আট দশ জনের সঙ্গে আলাপ করিলেন; এবং যাতায়াতের নৌকাভাড়া দিবার সংকল্প জানাইয়া তাহাদিগকে পরের রবিবার বৈকালে তাঁহার ভবনে যাইবার জন্য নিমন্ত্রণ করিয়া আসিলেন; তাহারা স্বীকৃত হইল।

পর রবিবার বৈকালে দশজন নৌকা করিয়া আসিল; মহেশ তাহাদিগকে সাদরে আহ্বান করিয়া নিজের এক ঘরে আনিয়া বসাইলেন; অগ্রেই ক্ষীরদা ও নিস্তারিণীর সাহায্যে জলখাবারের বন্দোবস্ত করিয়া রাখিয়াছিলেন; সেই খাদ্যদ্রব্য তাহাদিগকে প্রচুর পরিমাণে খাওয়াইলেন; তৎপরে একান্তে বসিয়া কারখানার বিষয়ে ও শ্রমজীবীদের সমুদয় সংবাদ সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। কথা কহিতে কহিতে শুনিতে পাইলেন, ঐ কলকারখানার ম্যানেজার সাহেবদের মধ্যে একজন সাহেব আছেন, তিনি মানুষ ভাল, শ্রমজীবীদিগকে ভালবাসেন, তাদের অবস্থার বিষয়ে অনুসন্ধান করেন এবং তাদের পানাসক্তি প্রভৃতির জন্য দুঃখিত। তিনি মহেশের সহায় হইতে পারেন। মহেশ সেই ইংরাজ ভদ্রলোকটির নাম লিখিয়া লইলেন; তাঁহার নাম Mr Kilburn (মিষ্টার কিলবরণ)।

মহেশ তাঁহার কার্য্যে সাহায্য করিবার জন্য সেই দশজনকে প্রতিজ্ঞা-বদ্ধ করিয়া তাহাদিগকে বিদায় করিলেন।

তাহার পরে তাঁহার এক পত্র লইয়া সেই ইংরাজ ভদ্রলোকটির নিকট লোক গেল। তিনি সেই পত্রে সাহেবের সঙ্গে দেখা করিতে চাহিয়াছেন; এবং শ্রমজীবীদের অবস্থা সবিশেষ বর্ণনা করিয়া তাহার উপায় বিধান-বিষয়ে তাঁহার সাহায্য চাহিয়াছেন। সাহেব মহেশের বিষয়ে অনুসন্ধান করিয়া জানিলেন যে, তিনি বহরমপুরের একজন প্রধান ব্যক্তি ও একজন সুশিক্ষিত লোক। তিনি পত্রের উত্তরে তাঁহাকে দেখা করিবার জন্য ডাকিলেন এবং সাহায্যের আশা দিলেন। একদিন মধ্যাহ্নে আহারের পর মহেশ গিয়া সাহেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলেন; সাহেব অতি সমাদরে তাঁহাকে গ্রহণ করিলেন; স্থির হইল, কারখানার সন্নিকটস্থ একবাড়ীতে শ্রমজীবীদের সম্মিলনের জন্য একটি ঘর দেওয়া হইবে; মহেশ সেখানে শ্রমজীবীদের অগ্রগণ্য ব্যক্তিদিগকে সমবেত করিয়া মধ্যে মধ্যে সুরাপানের অনিষ্টকারিতাদি বিষয়ে উপদেশ দিবেন; এবং অপরাপর যাহা করিবার তাহা করিবেন।

ইহার পরেই পূর্ব্বোক্ত দশ ব্যক্তির সাহায্যে কার্য্য আরম্ভ হইল। সাহেবের প্রদত্ত ঘরে, শ্রমজীবীদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া, এক এক রবিবার বৈকালে সুরাপানের অনিষ্টকারিতা বিষয়ে উপদেশ আরম্ভ হইল। দুই চারিটি উপদেশ মহেশ নিজে দিলেন; অপরগুলির ভার ডাক্তার ভদ্র প্রভৃতি তাঁহার অন্তরঙ্গ-বন্ধুদের মধ্যে কাহারও উপর দিতে লাগিলেন; তদ্ভিন্ন শ্রমজীবীদের ঘরে ঘরে গিয়া কথা আরম্ভ করিলেন। দেখিতে দেখিতে সেই কারখানাতে আন্দোলন উপস্থিত হইল। "সাবধান রে সাবধান! আমাদের উপরে সাহেবদের চোখ পড়েছে।" এই কথাবার্ত্তা চলিল; তাহার ফলে এই হইল যে, পুরুষ স্ত্রীলোক যে বেহুঁস হইয়া

খানার ধারে, রাস্তায়, পথের পাশে পড়িয়া থাকিত সেটা কমিতে লাগিল। অপর দিকে সাহেবের সঙ্গে মহেশের আলাপপরিচয় বন্ধুতায় পরিণত হইল।

ইহার পরে এই বিষয় ভাবিতে ভাবিতে মহেশের মাথায় অপর দুইটি খেয়াল আসিল। সেই দুইটি খেয়াল মাথায় লইয়া তিনি আর একদিন কিলবরণ সাহেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলেন। তখন যে কথাবার্তা হইল, তাহা শুনিলে সকলেই বুঝিতে পারিবেন সে খেয়াল দুটি কি?

মহেশ। Many thanks for having lent us that room for the temperance meetings. I am glad to announce to you that there is already some good influence of these meetings.—অর্থাৎ, আপনারা যে সুরাপান-নিবারণী সভার জন্ত ঘরটা দিয়েছেন, সে জন্ত আমার ধন্তবাদ গ্রহণ করুন। আপনাকে জানাইয়া সুখী হচ্চি যে, ইতি মধ্যে আমাদের বক্তৃতায় ভাল ফল দেখা যাচ্ছে।

Kilburn. Yes, I know that. I hear drunkenness is decreasing amongst them.—অর্থাৎ,—হাঁ, আমি তা জানি; আমি শুনেছি ওদের মধ্যে মাতলামি কমেছে।

মহেশ। Well, my first proposal to-day is—Can we in any way get the wine-shops removed from the neighbourhood of the mills? On Saturday evenings, as soon as the men get their allowance from the mill, they run to the wine-shops and get drunk. The very fact of the shops being at a distance would partially resist such a temptation.—অর্থাৎ, আমার প্রথম প্রস্তাবটা এই—মদের দোকানগুলি কি কারখানার কাছ থেকে দূরে নেওয়া যায় না? শনিবার সন্ধ্যার সময়

শ্রমজীবীরা বেতন পাওয়া মাত্র ছুটে মদের দোকানে যায়; দোকানগুলো যদি দূরে যায়, তাদের প্রলোভনটা একটু বাধা পেতে পারে।

Kilburn. Don't you know the Government Exeise Act? We have no hand in the matter.—অর্থাৎ, তুমি কি গবর্ণমেণ্টের আবকারি আইনের কথা জান না? আমাদের এর উপরে হাত নেই।

মহেশ। What I mean is this—By your indirect influence on local Government officers can't you manage to get them removed to a little distance?—অর্থাৎ, আমার অভিপ্রায় এই—স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট অফিসারদিগকে বলে কয়ে কি দোকানগুলো একটু দূরে সরাতে পারেন না?

Kilburn. (হাসিয়া) No, that is not possible.—অর্থাৎ, না, তা সম্ভব নয়।

মহেশ। In that case we should commence agitation to get the present laws changed.—অর্থাৎ, তা যদি হয় তবে বর্ত্তমান আইন পরিবর্ত্তনের জন্ম আন্দোলন করা উচিত।

Kilburn. You may do that. But as the law now stands, we have no hand in the matter.—অর্থাৎ, তোমরা তা করতে পার। কিন্তু আইন যেরূপ আছে, তাতে আমাদের এর উপর কোন হাত নাই।

মহেশ। My second proposal is of a different kind. At present these workers live huddled up together. What do you think if arrangement be made to separate them? For instance, married men, having wives, to have separ-

ate quarters ; widows and other women to have separate conpartments for themselves ; men having no wives are to be separated in men's quarters and so on. That may act as a check on their indiscriminate mixing.—অর্থাৎ, আমার দ্বিতীয় প্রস্তাবটা অন্য প্রকার ;—এখন দেখছি শ্রমজীবীরা এক সঙ্গে দল বেঁধে থাকে। আপনি কি মনে করেন, যদি তাদের একটু ছাড়াছাড়ি হয়ে থাক্‌বার বন্দোবস্ত করা যায়, তা হলে কেমন হয়? মনে করুন সস্ত্রীক যারা আছে তাদের জন্য স্বতন্ত্র স্থান রইল ; বিধবা ও অপরাপর স্ত্রীলোকদের জন্য পৃথক্ বাড়ী দেওয়া গেল ; স্ত্রীবিহীন পুরুষদের জন্য বাড়ী আলাদা করা গেল। এরূপ হলে তাদের মেশামিশিটার উপর একটু শাসন থাকতে পারে।

Kilburn. That is an excellent plan no doubt ; but where are you to get those separate compartments ?—অর্থাৎ, এ পরামর্শটা ভাল বটে, কিন্তু ওদের জন্য ভিন্ন ভিন্ন বাড়ী কোথা পাবে ?

মহেশ। What I propose is this : Can't your firm construct separate compartments for them ?—অর্থাৎ, আমি যে প্রস্তাব করি তাহা এই,—আপনারা কি এদিগের জন্য ভিন্ন ভিন্ন বাড়ী নির্মাণ করে দিতে পারেন না ?

Kilburn. (হাসিয়া) Oh, that is a costly affair! It is not philanthropy for which we have come here ; it is for gain. How can we start on such ventures ?—অর্থাৎ, ওঃ, সে ত অনেক খরচের কথা! আমরা ত পরোপকারের জন্য এখানে আসি নাই, লাভের জন্যই এসেছি। এরূপ কাজে আমরা হাত দি কি করে ?

মহেশ। I know that. But these poor people pay rents for the wretched huts they occupy. Build healthier huts for them and charge moderate rent.—অর্থাৎ, আমি তা জানি। এই গরীব শ্রমজীবীরা যেসকল যাচ্ছেতাই কুঁড়েতে থাকে, তার জন্য তারা ভাড়া দেয়; আপনারা ওদের থাকবার জন্য স্বাস্থ্যকর কুঁড়ে বেঁধে দিন এবং অল্প স্বল্প ভাড়া নিন।

Kilburn. Yes, that is a practical proposal. I shall think over it, and consult my friends.—অর্থাৎ, হাঁ, এটা একটা কাজের মত কথা বটে। আচ্ছা, আমি এবিষয়ে ভেবে দেখব এবং আমার বন্ধুদের সঙ্গে পরামর্শ করব।

ইহার পরে মহেশ বাড়ীতে আসিয়া মদের দোকান খোলার উপরে স্থানীয় লোকের হাত যাহাতে থাকে, অর্থাৎ যাহাকে local option বলে, সেই মর্ম্মে একখানি দরখাস্ত লিখিয়া নিজের অনুগত যুবকদিগের দ্বারা স্বাক্ষর করাইতে লাগিলেন; এবং মধ্যে মধ্যে রবিবারে ডাক্তার ভদ্রের সঙ্গে কলকারখানার পাড়ায় গিয়া সেই দশজন শ্রমজীবীর সাহায্যে সুরা-পায়ীদিগকে বুঝাইতে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি কেবল পুরুষদিগকে বুঝাইয়াই ক্ষান্ত হইলেন না; এক রবিবার বৈকালে ক্ষীরদা, নিস্তারিণী ও ডাক্তার ভদ্রকে সঙ্গে করিয়া গিয়া শ্রমজীবী মেয়েদিগকে ডাকাইয়া একত্র করিয়া, বলিলেন—"মা, তোরা ত মেয়েমানুষ! মেয়েমানুষ খারাপ দেখলে বড় দুঃখু হয়; মেয়েমানুষ মদ খায় শুনলে লজ্জায় মরে যাই; তোরা কি করে এভাবে থাকিস?" এই বলিতে বলিতে তাঁর চক্ষে জলধারা বহিতে লাগিল। চক্ষের জল মুছিয়া বলিলেন—"এই দেখ্ আমার স্ত্রী, এই আমার পিসতুতো বোন্, এরা সতী লক্ষ্মী, এঁদের কাছে বসলে মন ভাল হয়; এঁরা তোদের অবস্থার কথা শুনে থাকতে পারেননি বলে

এসেছেন; এঁদের মুখের দিকে চেয়ে তোমরা আজ প্রতিজ্ঞা কর, যে মদ খায় সে মদ ছাড়বে, যে খারাপ আছে সে সেপথ পরিত্যাগ করবে।"

তাঁর বক্তৃতা শেষ হইতে না হইতে মেয়েদের মধ্যে অনেকে কাঁদিতে লাগিল; কেহ কেহ আর স্থির থাকিতে না পারিয়া চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল—"বাবা, আমরা আর মদ খাব না"। সে দিনকার উত্তেজনাতে সে একটা দেখিবার মত দৃশ্য হইয়াছিল। বক্তৃতার পর, ক্ষীরদা ও নিস্তারিণী মেয়েদের সঙ্গে তাদের কুঁড়ে ঘরে ঘরে ঘুরিতে লাগিলেন; মিষ্ট কথায় সকলকে বুঝাইতে লাগিলেন; অনেক মেয়ে সুরাপান ত্যাগ করিবার জন্য ও কুপথে পা না দিবার জন্য প্রতিজ্ঞা করিল; এবং "মা, তোমরা আবার এস" বলিয়া অনুরোধ করিতে লাগিল। ক্ষীরদা ও নিস্তারিণী মেয়েদিগকে বলিয়া আসিলেন—"আমরা বিধবা-বিবাহের পক্ষ; তোমাদের মধ্যে কোনও বিধবার যদি কোনও স্বজাতি নিজ জাতের পুরুষের প্রতি যথার্থ ভালবাসা হয়, পাপে মোজো না, বিপথে পা দিও না, আমাদিগকে জানিও, আমরা এসে বিয়ে দিয়ে যাব; লোকে যদি নির্য্যাতন করে আমরা দেখবো; পাপপথে পা দেওয়ার চেয়ে, মেয়েমানুষের ছোট কাজ, লজ্জার কাজ, আর নাই; যে ভালমেয়ে তাকে আমরা ভালবাসবো।"

তাঁরা চলিয়া আসিলে মেয়েদের কথা হইতে লাগিল—"ওমা, এঁরা এতদিন কোথায় ছিলেন? আমাদের জন্য এত ভাবনা ত কেউ ভাবে নি!"

এবারকার অন্যান্য কাজের মধ্যে মহেশ ডাক্তার ভদ্রকে ফিলবরণ সাহেবের সহিত পরিচিত করিয়া দিলেন; এবং সুরাপান নিবারণ বিষয়ে কাজ করিবার ভার তাঁহার উপরে দিলেন। তদবধি ডাক্তার ভদ্র হরিনারায়ণ বাবুকে সঙ্গে করিয়া মধ্যে মধ্যে কলকারখানাতে আসিতে

লাগিলেন; এবং শ্রমজীবীদিগকে সুরাপান ছাড়াইবার জন্ত চেষ্টা করিতে লাগিলেন। মহেশ যে কাজে হাত দেন তাহাই সবল হইয়া উঠে; তাঁহার প্রভাবে ঐ কলকারখানার মধ্যে মহা পরিবর্ত্তন আসিল।

মেয়েদের সঙ্গে কলকারখানা হইতে ফিরিয়া আসিয়া মহেশ তৎপরবর্ত্তী রবিবার বৈকালে পূর্ব্বোল্লিখিত সেই দশজন শ্রমজীবীকে আবার ডাকিয়াছিলেন। তাহাদিগকে সমাদরে অভ্যর্থনা করিয়া লইয়া জল খাইতে দিলেন; নিজের বৈঠকখানায় বসাইলেন; এবং তাহাদের মুখে শ্রমজীবীদিগের অবস্থার কথা শুনিতে লাগিলেন। শুনিলেন যে যারা বড় মাতাল ছিল, তারা আপনাদের পানস্পৃহা নিয়মিত করিতে আরম্ভ করিয়াছে; রবিবার প্রাতে আর রাস্তার পার্শ্বে, খানার ধারে, তত মাতাল পুরুষমেয়ে পড়িয়া থাকিতে দেখা যায় না; দলের মধ্যে সুরাপান নিবারণের কথা উঠিয়াছে; মেয়েদের মধ্যেও আলোচনা চলেছে; খারাপ মেয়েদিগকে সকলে ‘ছি ছি’ করিতেছে। শুনিয়া আনন্দে মহেশের হৃদয় পূর্ণ হইল। তিনি তাহাদিগকে সমাদরে বিদায় দিলেন; বলিলেন—“আর একদিন বাড়ীর মেয়েদের নিয়ে যাব।” তাহারা প্রণাম করিয়া তাঁহার পদধূলি লইয়া চলিয়া গেল।

তাহারা চলিয়া গেলে মহেশের চিত্ত আর এক চিন্তাতে মগ্ন হইল। ক্ষীরদা ও নিস্তারিণীকে সহায় করিয়া সহরের ভদ্রমেয়েদের মধ্যে শিক্ষা ও জ্ঞানবিস্তারের কোনও উপায় করা যায় কি না? তাঁহাদের দুজনের সঙ্গে এই পরামর্শ আরম্ভ করিলেন। কিন্তু কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে জগদ্ধাত্রীদেবী হঠাৎ জ্বররোগে আক্রান্ত হইলেন; সকল প্রস্তাব স্থগিত হইয়া গেল। তাঁহার বন্ধু ডাক্তার ভদ্র আসিয়া পরীক্ষা করিয়া বলিলেন যে, প্রত্যূষে গঙ্গাস্নানের জন্ত নিউমোনিয়া হইয়াছে। পরিবার শুদ্ধ সকলে মহা চিন্তার মধ্যে পড়িয়া গেলেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

জগদ্ধাত্রীদেবীর পীড়া কয়েকদিনের মধ্যে ভীষণ আকার ধারণ করিল। দুই তিন দিনের মধ্যেই ডাক্তার ভদ্র পরীক্ষা করিয়া বলিলেন, যে পীড়া দুরারোগ্য; তিনি বাঁচেন কি না সন্দেহ। শুনিয়া মহেশ চিন্তাতে আকুল হইলেন। ডাক্তার ভদ্র হাতের কাছেই আছেন; জগদ্ধাত্রীদেবীকে নিজ মায়ের মতই দেখেন; তিনি করিতে আর কিছুই বাকি রাখিলেন না; কিন্তু জগদ্ধাত্রীদেবী ডাক্তারি ঔষধ খাইবেন না; কখনই খান নাই; তাঁর পতিও খাইতেন না। এখন উপায় কি? সে সময়ে বহরমপুরে এক খ্যাতনামা কবিরাজ বাস করিতেন; তাঁহার সুযশ দেশবিদেশে ব্যাপ্ত হইয়াছিল। মহেশ এখানে আসার পর একদিন গিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আসিয়াছেন; এবং মধ্যে মধ্যে দুই এক গৃহে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎও হইয়াছে; কিন্তু সেরূপ আত্মীয়তা হয় নাই যে ডাক্তার ভদ্রের ন্যায় তাঁহার প্রতি নির্ভর করিতে পারেন। অবশেষে মহেশ নিরুপায় হইয়া তাঁহারই শরণাপন্ন হইলেন। কবিরাজ মহাশয় মহেশকে সমাদরে অভ্যর্থনা করিয়া লইলেন; এবং অবিলম্বে তাঁহার জননীকে দেখিবার জন্য আসিলেন; বলিলেন—"চল চল, তোমার মা! তাঁর বড় সুখ্যাতি শুনেছি।"

কবিরাজ মহাশয়ের চেহারা দেখিলেই রোগীদের প্রাণ প্রফুল্লিত হয়। নাতিদীর্ঘ নাতি খর্ব্ব দেহ, উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ, গৌরবর্ণ বলিলেও হয়, দেহটি নাতি স্থূল নাতিকৃশ, সুস্থ, সবল ও দীর্ঘায়তন! কাপড়খানি নাভির নিম্নে পরা, সুস্থ সবল কুক্ষিটি বাহির হইয়া আছে; মাথায়

চাদুরগুলি জড়াইয়া স্কন্ধের উপরেই আছে; গলদেশে স্বর্ণবটিকাবিশিষ্ট তুলসীর মালা, চক্ষু দুটি দীর্ঘ, বিশাল, প্রসন্ন, প্রীতিপ্রফুল্ল, ও সদাশয়তা-ব্যঞ্জক; দেখিলেই মন প্রফুল্ল হইয়া যায়। তিনি হাসিতে হাসিতে আসিয়া উপস্থিত।

তিনি গিয়া জগদ্ধাত্রীদেবীর শয্যার পার্শ্বে দাঁড়াইলেই, মহেশ ডাকিয়া বলিলেন, "মা কবিরাজ মশাই এসেছেন, চেয়ে দেখ।" জগদ্ধাত্রীদেবী কবিরাজ মহাশয়ের মুখ দেখিয়াই আনন্দিত হইলেন। কবিরাজ মহাশয় প্রণাম করিয়া তাঁহার শয্যাপার্শ্ববর্ত্তী চেয়ারে বসিলেন; এবং তাঁহার হস্ত নিজ হস্তে লইয়া বলিতে লাগিলেন, "আপনাকে যে দেখতে এসেছি এ আমার সৌভাগ্য; আমি চেষ্টা করতে আর বাকি রাখব না; বলুন দেখি, আজ সকালে কেমন বোধ করছেন।" জগদ্ধাত্রীদেবী ক্ষীণস্বরে বলিলেন, "ভাল।" তৎপরে কবিরাজ মহাশয় পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে প্রশ্ন করিয়া সকল কথা জানিলেন; এবং ডাক্তার ভদ্র কি কি বলিয়াছেন শুনিলেন এবং চিকিৎসাকার্য্যের ভার লইলেন। কিন্তু সুদক্ষ কবিরাজ হইলে কি হয়, তাঁর মুখ দেখিয়া জগদ্ধাত্রীদেবীর মন প্রসন্ন হইলে কি হয়, রোগীর কঠিন লক্ষণসকল প্রকাশ পাইতে লাগিল! তিনি আর বাঁচিবেন না, এই সংবাদ সহরে প্রচার হইয়া গেল। সকালে বিকালে মহেশের বন্ধুগণ আসা যাওয়া করিতে লাগিলেন; "কি চাই, কি কর্‌তে হবে বলুন" বলিয়া সকলে অনুরোধ করিতে লাগিলেন। প্রবোধের ত কথাই নাই; সে কবিরাজের বাড়ী ও ঘর করিতেছে; নিস্তারিণীর ডান হাত হইয়া যখন যা দরকার যোগাইয়া দিতেছে; মধ্যে মধ্যে আসিয়া জগদ্ধাত্রী দেবীর পায়ের কাছে বসিয়া পায়ে হাত বুলাইয়া দিতেছে; জগদ্ধাত্রীদেবী তাহাকে দেখিয়াই আনন্দিত হইতেছেন; "বাবা, বাবা" বলিয়া তাহার মাথায় হাত বুলাইতেছেন।

দুই চারিদিন পরেই বাবু গোপাললালের নিকট হইতে এক পত্র আসিল :—"শুনিলাম আপনার মাতাঠাকুরাণী বড় পীড়িত। আপনি আর এখানে আফিসে আসিবেন না। কাগজ, পত্র, বাক্স প্রভৃতি আপনার বাটীতে প্রেরণ করা যাইতেছে; লোকজন সেখানেই যাইবে; সেখানে বসিয়াই আফিসের কাজ করিবেন।" মহেশ তাঁহাদিগকে ধন্তবাদ করিলেন; এবং বাড়ীতে বসিয়াই আফিসের কাজ আরম্ভ করিলেন। তিনি প্রাতে উঠিয়া স্নানান্তে মাতাঠাকুরাণীর ঔষধ সেবন ও পথ্যাদির বন্দোবস্ত করিবার ভার নিস্তারিণীর উপরে দিয়া, নিজে নীচের ঘরে গিয়া আফিসের কাজ করিতে বসেন; তখন দেখিলে মনে হয় তাঁহার বুঝি পৃথিবীতে ভাবিবার বা করিবার আর কিছুই নাই; এমনি মনপ্রাণ দিয়া সে কাজ করেন! এদিকে নিস্তারিণী বদ্ধপরিকর হইয়া ডাক্তার ভদ্রের নির্দ্দেশ অনুসারে, প্রবোধের সাহায্যে, পিসীমার তত্ত্বাবধানকার্য্যে নিযুক্ত আছেন। বিপদে না পড়িলে মানুষকে চেনা যায় না! নিস্তারিণীর যে কতদূর গুছাইয়া কাজ করিবার শক্তি তাহা দেখিয়া সকলে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে লাগিল; অগ্রে কেহ এতটা দেখেন নাই। ডাক্তার ভদ্রকে প্রাতে হাসপাতালের কাজ করিতে হয়; সে কাজ সারিয়াই তিনি এ বাড়ীতে আসেন; আসিয়া নিস্তারিণীর মুখে সমুদয় কথা শোনেন; জগদ্ধাত্রীদেবীর বুক প্রভৃতি পরীক্ষা করেন; তৎপরে অনেক বেলাতে বাড়ীতে যান; আবার সন্ধ্যাকালে আসিয়া কয়েকঘণ্টা যাপন করেন। ক্ষীরদা সংসার দেখিতেছেন ও যত্নের সেবা বিষয়ে নিস্তারিণীর সাহায্য করিতেছেন; কৃপাও সহায় হইয়া আছে।

দিনের পর দিন যাইতে লাগিল; মহেশ মাতার রোগের বিবরণ দিয়া, তারাকে লইয়া সত্বর আসিবার জন্ত, গিরিশকে পত্র লিখিলেন। মাতার মৃত্যুর একদিন পূর্ব্বে তাহারা আসিয়া উপস্থিত হইল।

তৎপূর্ব্ব দিন হইতে জগদ্ধাত্রীদেবী অচেতন প্রায় আছেন; মধ্যে মধ্যে পাশ ফিরিতে চাহিতেছেন, 'উঃ আঃ' করিতেছেন বটে, কিন্তু দেখিলে বোধ হয়, কে কি বলিতেছে, কে কি করিতেছে সেদিকে মন নাই। রোগের বৃদ্ধি হইলেই আসন্নকাল জানিয়া তিনি নিজ পতির যোগপাট্টা নিজের গলায় দিয়া দিতে বলিয়াছেন; এবং নিজ পতির জপের মালাটা (যাহা লইয়া তিনি নিজে চিরদিন জপ করিয়া আসিতেছেন) নিজের হাতের কাছে রাখিতে বলিয়াছেন; কয়েকদিন প্রাতে সন্ধ্যাতে তাহা লইয়া জপ করিয়া আসিতেছেন; এখন সেই মালা সর্ব্বদাই হাতে উঠিয়া আছে; দেখিলে মনে হয় যেন জপেই মগ্ন আছেন। নিস্তারিণী অনেকবার "মামীমা, ঔষধটা খাও, মামীমা ঔষধটা খাও" করার পর একবার হাঁ করেন; তাহাতেই মনে হয় একেবারে অচৈতন্য অবস্থা নয়। যাহা হউক, মৃত্যুর জাল ক্রমশই ঘিরিয়া আসিতেছে।

গিরিশ পৌঁছিয়াই প্রথমে মায়ের ঘরে গেলেন; এবং মাতার শয্যার পার্শ্বে বসিয়া "মা চেয়ে দেখ, আমি এসেছি, মা চেয়ে দেখ, আমি গিরিশ ও তারা এসেছি" বলে চীৎকার করিতে লাগিলেন। অনেক ডাকাডাকির পর জগদ্ধাত্রীদেবী চক্ষু খুলিয়া চাহিলেন এবং "বাবা" বলিয়া হাত তুলিয়া গিরিশের কণ্ঠালিঙ্গন করিবার চেষ্টা করিলেন। তখন তারা গিয়া মাতার মাথার বালিশের পাশে মাটীতে হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া বলিল—"মা, আমি তারা, আমাকে একবার দেখ।" তখন মাতৃদেবী তার কণ্ঠালিঙ্গন করিয়া বলিলেন—"মা, মা;" তাহা দেখিয়া নিস্তারিণী ফোঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিলেন; এবং বাহিরে গিয়া চক্ষু মুছিতে লাগিলেন; মহেশও আর সেখানে দাঁড়াইতে পারিলেন না; তিনি বাহিরের বারাণ্ডাতে গিয়া দাঁড়াইলেন; গিরিশ ও তারা মায়ের ঘর আশ্রয় করিয়া রহিল।

সেই দিনই সন্ধ্যার পর হইতে শ্বাস দেখা গেল ; এবং সেই শ্বাস পরদিন দুপর পর্য্যন্ত থাকিল। মহেশ প্রাতঃকাল হইতে আর আফিসের কাজে বসিতে পারিলেন না ; তাঁহার কিরূপ জড়ভাব আসিয়াছে ; 'উঃ আঃ' করা নাই ; শোক প্রকাশ করা নাই ; "কি দেখছ, কি দাড়াচ্চে" এ প্রশ্ন করা নাই ; যেখানে বসিতেছেন, সেই খানেই বসিয়া থাকিতেছেন ; ডাকিলে উঠিয়া আসিতেছেন। মাতার কণ্ঠশ্বাস উপস্থিত হইলে তাঁহাকে ডাকা হইল ; তিনি আসিয়া গিরিশকে বলিলেন—"মার ইষ্টদেবতার নাম কাণের কাছে কর।" গিরিশ নিজের মুখ মার কাণের কাছে লইয়া "জগদম্বা, জগত্তারিণী, তারা, দীনতারিণী" প্রভৃতি নাম কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। তৎপরে সকলেই ধরাধরি করিয়া তাঁহাকে গঙ্গার ঘাটে লইয়া গেলেন। দেখিতে দেখিতে কয়েকজন ভদ্রলোক আসিয়া উপস্থিত; তাঁহারা সকলে গঙ্গাতীরে গিয়া সমস্বরে চীৎকার করিয়া নামকীর্ত্তন করিতে আরম্ভ করিলেন—"গঙ্গা, নারায়ণ, ব্রহ্ম, ওঁ রামঃ।" গিরিশ মায়ের কাণের কাছে চেচাঁইতে লাগিলেন ;—"দুর্গা, দুর্গতি-নাশিনী, তারা, দীনতারিণী" এবং মায়ের মুখে বিন্দু বিন্দু গঙ্গাজল দিতে লাগিলেন। এদিকে মহেশ মায়ের পায়ের কাছে একহাটু জলে বসিয়া নিজস্কন্ধে মায়ের দুই পা লইয়া বসিয়া রহিলেন। লোকে উঠিয়া আসিতে বলিল ; তাহা শুনিলেন না। ক্রমে জগদ্ধাত্রীদেবীর প্রাণবায়ু বাহির হইয়া গেল।

বৈকালে মৃতদেহ শ্মশানে লইবার সময় সমুদয় সহর যেন সঙ্গে বাহির হইল। মহেশ খালি পায়ে, স্কন্ধে একখানি চাদর মাত্র লইয়া, জননীর খাটের ধারে ধারে চলিয়াছেন ; ইচ্ছা খাটে কাঁধ দেন, কিন্তু তাঁহাকে ধরিয়া লইয়া যাইতে হইতেছে ; যেন চলিতে অসমর্থ ! সুতরাং তাঁহাকে খাটে কাঁধ দিতে দেওয়া হইতেছে না ; গিরিশ খাটে কাঁধ দিয়াছেন।

মহেশ মাতার সংকারের জন্ত প্রচুর পরিমাণে চন্দনকাষ্ঠ আনাইয়াছিলেন, তৎসংযোগে যথানিয়মে দাহকার্য্য সমাধা হইল।

মহেশ বাড়ীতে আসিয়াই সেই যে নিজগৃহে শয়ন করিলেন, আর উঠিলেন না! ক্ষীরদা খুকীকে লইয়া কতবার গৃহের মধ্যে গেলেন; খুকী "বাবা, বাবা" করিয়া ডাকিল; মহেশ চাহিয়া দেখিলেন না; কথা কহিলেন না; পাশও ফিরিলেন না;—যেন অচেতন! আহারের সময় উপস্থিত হইল; দুধ প্রভৃতি লইয়া ক্ষীরদা খাওয়াইতে গেলেন; "ওগো, একবার চেয়ে দেখ; ওগো, একটু দুধ খাও" বলিয়া কয়েকবার ডাকিলেন; সাড়া নাই, শব্দ নাই, নড়া নাই; কাজেই ক্ষীরদা ফিরিয়া গেলেন। সে রাত্রি মহেশ অনাহারেই পড়িয়া রহিলেন। ক্ষীরদা ও নিস্তারিণীর বড় বিষাদে রাত্রি কাটিল; তাঁহারা গিরিশ ও তারার পরিচর্য্যাতে রহিলেন বটে, কিন্তু যেন অনিচ্ছাতে নড়িতে চড়িতে লাগিলেন।

পরদিন প্রাতে মহেশকে ধরিয়া গঙ্গা হইতে স্নান করাইয়া আনা হইল। কি আশ্চর্য্য! একরাত্রে সমগ্র চেহারা যেন বদলাইয়া গিয়াছে! চক্ষে জল নাই; মুখে 'উঃ আঃ' নাই; চেহারাতে প্রশান্ত ভাব; সে কি ধৈর্য্যের আভা! কিন্তু সে কি উদাস ভাব! সে কি শোকের ছায়া! মহেশ স্নান করিয়া শোকবসন পরিধান করিলেন; এবং মাতার পূজার ঘরে গিয়া দ্বার বন্ধ করিয়া বসিলেন। বহুক্ষণ সেখানে যাপন করিয়া নিজ হস্তে রন্ধন পূর্ব্বক হবিষ্যান্ন আহার করিলেন। এইরূপে শোকের কয়েক দিন অতিবাহিত হইতে লাগিল।

দুই একদিন পরে মহেশ নিজ ভবনেই প্রাতে ও সন্ধ্যাতে দেবীপ্রসাদ বাবুর আফিসের কাজ কিছু কিছু করিতে লাগিলেন। মাতার শ্রাদ্ধের জন্ত গিরিশ ও তারাকে আবদ্ধ করিয়া রাখা হইল। অগ্রে প্রস্তাব হইয়াছিল, যে সকলে হরিহরপুরে গিয়া শ্রাদ্ধ করিবেন; কিন্তু তাহা মুসাধ

মনে হইল না। বহরমপুরে মাতার প্রিয় গঙ্গাতীরে শ্রাদ্ধ করা স্থির হইল। মহেশ স্বীয় মাতুল কৈলাসচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয়কে আসিবার জন্ত লিখিলেন; কিন্তু তিনি আসিতে পারিবেন না বলিয়া লিখিলেন। চতুর্থ দিনে তাঁহারা বিধিপূর্ব্বক চতুর্থী ক্রিয়া সম্পন্ন করিল; সে জন্ত প্রায় তিন চারিশত টাকা খরচ হইয়া গেল। অবশেষে যথাসময়ে ষোড়শোপচারে শ্রাদ্ধক্রিয়া সম্পন্ন হইল। দেবীপ্রসাদের জননী সেজন্ত পাঁচশত টাকা উপহার প্রেরণ করিলেন। লোক খাওয়ান, গরীব দুঃখীকে দান প্রভৃতিতে অনেক শত টাকা ব্যয় হইল। শ্রাদ্ধের পর গিরিশ তাঁহাকে লইয়া কলিকাতায় গেলেন। মহেশের আফিস আবার পূর্ব্ববৎ দেবীপ্রসাদের বাড়ীতে গেল; তিনি পূর্ব্ববৎ আপনার কার্য্য আরম্ভ করিলেন।

মহেশের সামলাইয়া উঠিতে অনেক দিন গেল। তিনি কাজ কর্ম্ম আরম্ভ করিলেন বটে, কিন্তু মুখে বিষাদের ছায়া পড়িয়া রহিল; তাহা যেন গিয়াও যায় না। জননীর পূজার ঘরে সেই যে প্রাতে ও সন্ধ্যাতে কিয়ংক্ষণ করিয়া যাপন করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, তাহা রহিয়া গেল। প্রাতে উঠিয়া আফিসে বাহির হইবার একঘণ্টা পূর্ব্বে স্নান করিয়া আসেন; আসিয়া মাতার পূজার ঘরে প্রবেশ করেন; এবং শাস্ত্রপাঠ ও ধ্যান ধারণাতে অনেকক্ষণ যাপন করেন; তৎপরে বাহির হইয়া বস্ত্রাদি পরিবর্ত্তন করিয়া, কিছু খাইয়া, আফিসে যান; সায়ংকালেও আসিয়া বস্ত্রাদি পরিবর্ত্তন করিয়া মাতার পূজার ঘরে প্রবেশ করেন; এবং কিয়ংক্ষণ নির্জ্জনে যাপন করেন। আর একটা পরিবর্ত্তন এই দেখা গেল, তিনি মাতৃবিয়োগের পর, শ্রাদ্ধের পূর্ব্বে, যে নিরামিষ আহার আরম্ভ করিয়াছিলেন, তাহাই রহিয়া গেল; মৎস্য মাংস একেবারে পরিত্যাগ করিলেন। বাড়ীর মেয়েরা কারণ জিজ্ঞাসা করিলে বলেন— "মানুষ গুরুজনের স্মৃতিতে অনেক সময় একটা না একটা সুখ ছাড়ে,

আমি মাছ মাংস ছাড়লাম"। ফলকথা এই, অগ্রেই বলা হইয়াছে যে, বহরমপুরে পদার্পণ করা অবধি তিনি ধর্ম্মচিন্তাতে নিযুক্ত আছেন; প্রতিদিন রাত্রে শয়নের পূর্ব্বে রাত্রি দশটা এগারটা পর্য্যন্ত ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠে নিমগ্ন থাকেন; দিনের বেলাও আহারের পর আফিস যাত্রার সময় পর্য্যন্ত সেই কার্য্যে রত থাকেন। তিনি শাক্তবংশের ছেলে, তাঁহার পিতামাতা শাক্ত ভাবাপন্ন ছিলেন, কিন্তু বহরমপুরে আসিয়া তাঁহার চিন্তাতে আর এক ভাব প্রবেশ করিয়াছে। বহরমপুরে সে সময় একজন ভক্ত বৈষ্ণব বাস করিতেন; তিনি বৈষ্ণব গ্রন্থ সকল মুদ্রিত করিতেছিলেন। মহেশ তাঁহার প্রচারিত গ্রন্থসকল পাইয়া, তৎসম্পর্কে আরও বৈষ্ণবগ্রন্থ সংগ্রহ করিয়া, পাঠ করিয়াছেন; এবং তাঁহাদের কীর্ত্তনাদিতে অনেক সময় উপস্থিত থাকিয়াছেন। দুই একবার সেই কীর্ত্তনিয়াদিগকে আনাইয়া মাতাকে সংকীর্ত্তন শুনাইয়াছেন। কিন্তু জননী বৈষ্ণব কীর্ত্তনে তেমন অনুরাগ দেখান নাই বলিয়া তাহাদিগকে আর আনান নাই; এবং মাতৃদেবীর শাক্তভাব প্রবল থাকাতে নিজের পরিবর্ত্তনোন্মুখ ভাবের কথা তাঁহাকে অধিক জানিতে দেন নাই। এক্ষণে তাঁহার মনের গতি নূতন দিকে ছুটিয়াছে; তিনি ভক্তি-ধর্ম্মের পক্ষপাতী হইয়াছেন।

এই পরিবর্ত্তিত ভাব আপাততঃ নিরামিষ আহারের আকার ধারণ করিয়াছে। একদিন নিস্তারিণী তাঁহাকে বলিলেন, "তোমার ভাবগতিক বড় বুঝতে পারছি না; কেমন কেমন লাগছে; তুমি দুপুরবেলা ও রাত্রে তোমার বসবার ঘরে বসে যে সব বই পড়, আমি সেগুলো উল্‌টে পাল্‌টে দেখেছি, তার অধিকাংশ ত বৈষ্ণব গ্রন্থ, তুমি কি মনে মনে বৈষ্ণব হয়ে যাচ্ছ?"

মহেশ। তুমি যখন কথাটা তুললে, তখন একটু খুলে কথা হওয়াই

ভাল। এখানে একটি বৈষ্ণব সাধুপুরুষ আছেন; তিনি শ্রী[illegible]র অনেক খণ্ড ছেপে বাহির করেছেন ; আমি কিছুদিন হতে পড়ছি। পড়ে আমার মনে একটা চিন্তা উঠেছে ; সেটা এই,—আমরা চিরদিন যে শাক্তধর্ম্মের কথা শুনে আসছি, সেটাতে নৃশংসতা, বীরাচার, বীভৎস আচার প্রভৃতির প্রশ্রয় দেয় ; ভগবানকে ওভাবে অর্চ্চনা করা উচিত নয় ; ওর চেয়ে বৈষ্ণবধর্ম্ম ভাল, সেটা প্রেম ও ভাবের ধর্ম্ম।

নিস্তারিণী। শাক্ত ধর্ম্মের নৃশংসতা দেখচ, বৈষ্ণবধর্ম্মের দুর্নীতি কি দেখ না? স্ত্রী পুরুষের কদাচার কি গণ্য কর না?

মহেশ। ঠিক বলেছ, বৈষ্ণব ধর্ম্মে রাধাকৃষ্ণেতে সর্ব্বনাশ করেছে। বৈষ্ণব ধর্ম্ম ভক্তির ধর্ম্ম ও ভাবের ধর্ম্ম ; কিন্তু রাধাকৃষ্ণের ভাব এনে সেই ভাবকে দুর্নীতির দিকে নিয়ে গেছে।

নিস্তারিণী। তবে?

মহেশ। গড়ের উপরে বলি শোন। আমার মনে হচ্চে ভক্তির পথটাই আসল পথ, অর্থাৎ ভগবানে প্রেম ও আত্মসমর্পণই আসল পথ। প্রেম না হলে মানবজীবন ফোটে না ; মানবজীবনের গূঢ় শক্তি প্রকাশ পায় না। মনে কর তুমি আমাদের জন্যে করতে কিছু বাকি রাখছ না ; যার কি সেবাটাই করেছ! তার মূলে ত প্রেম। তেমনি মানবজীবনের সকল মহত্ত্ব, সকল শক্তির মূলেই প্রেম। এই প্রেম ভগবদ্ভক্তি ও সাধুভক্তির আকার ধারণ করে। দুর্ভাগ্যবশতঃ বৈষ্ণবদের ভক্তি, ভাবুকতাও দুর্নীতির মধ্যে গিয়ে পড়েছে। আমাদের পক্ষে কর্ত্তব্য এই ভক্তিকে ভাবুকতা ও দুর্নীতি হইতে উদ্ধার করে মানব-প্রেমে অর্পণ করা। ভক্তি যখন মানব-প্রেম ও মানবসেবাতে পরিণত হয়, তখন ভক্তি পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। এই ভাবটা এসে আমার পরসেবার প্রবৃত্তি যেন আরও প্রবল করে তুলছে।

নিস্তারিণী। রোজ দেখি তুমি প্রাতে আফিসে যাবার পূর্ব্বে স্নান করে মামীমার পূজার ঘরে দোর দিয়ে অনেকক্ষণ বসো, তার পর রাত্রে এসেও অনেকক্ষণ বসো। দরোজা দিয়ে কি কর?

মহেশ। আমি কিছুক্ষণ ধর্ম্মগ্রন্থ পড়ি; কিছুক্ষণ ধ্যান ধারণাতে যাপন করি।

নিস্তারিণী। সন্ধ্যার সময় দোরটা খুলে রাখলে ত আমরা গিয়ে বসতে পারি; শাস্ত্রব্যাখ্যা করে আমাদের শোনালে আমাদের ত উপকার হতে পারে; বিশেষতঃ সন্ধ্যার পরে ডাক্তার ভদ্র আমাদের সঙ্গে বসতে পারেন; তিনি বেশ গাইতে পারেন, তিনি তোমাকে দুই একটা ব্রহ্মসঙ্গীতও শোনাতে পারেন।

মহেশ। ঠিক বলেছ। আচ্ছা, আজ হতে সন্ধ্যার পর দোর খুলে রাখব; তুমি, ক্ষীরদা, ডাক্তার ভদ্র এসে বসতে পার। আমি ভাগবত পড়ে তোমাদের শোনাব।

অতঃপর সেই নিয়ম আরম্ভ হইল। সন্ধ্যার পর আফিস হইতে আসিয়া মহেশ মায়ের পূজার ঘরে যখন বসেন, দ্বার খোলা রাখেন; নিস্তারিণী ও ডাক্তার ভদ্র গিয়া এক পার্শ্বে বসেন; ক্ষীরদা সব দিন বসিতে পারেন না, কিন্তু তিনিও মধ্যে মধ্যে আসিয়া বসেন; মহেশ শ্রীমদ্ভাগবত ও ভগবদ্গীতা প্রভৃতি ব্যাখ্যা করিয়া শোনান; ডাক্তার ভদ্র সুমধুর স্বরে দুই একটি ব্রহ্মসঙ্গীত করিয়া শোনান; মেয়েরা দেখিতে পান, মহেশের চক্ষে দর দর ধারে জল পড়ে; মনে মনে ভাবেন, "এ যে দেখি আর এক রকম মানুষ হয়ে উঠছেন।"

ইহার সঙ্গে আর একটা কাজ আরম্ভ হইল। মহেশ সেই তিন জন কীর্ত্তনিয়াকে সপ্তাহে দুই দিন করিয়া আনিয়া মেয়েদিগকে কীর্ত্তন শুনাইতে লাগিলেন।

এইরূপে কিছুদিন পাঠ, সঙ্গীত, কীর্ত্তনাদি চলিতে না চলিতে—কলিকাতা হইতে জগদ্ধাত্রীদেবীর সুচিত্রিত প্রতিমূর্ত্তি আসিয়া উপস্থিত। মহেশ মায়ের ফটোগ্রাফ গিরিশের হাতে কলিকাতার একজন প্রসিদ্ধ চিত্রকরের নিকট প্রেরণ করিয়াছিলেন; চিত্রকর সেখানিকে বর্দ্ধিত ও সুচিত্রিত করিয়া পাঠাইয়াছেন। ছবিখানি দেখিয়া বাড়ীর লোকের মন একেবারে পুলকিত হইয়া উঠিল। মা যেন প্রসন্নদৃষ্টিতে সকলের মুখের দিকে চাহিয়া রহিয়াছেন; ছবিখানি মায়ের পূজার ঘরে প্রতিষ্ঠিত করা হইল। জননীর পদতলে বসিয়া মহেশের প্রাতঃ-সন্ধ্যায় ভজন সাধন আরম্ভ হইল। ক্ষীরদা, নিস্তারিণী ও কৃপা তিন জনে প্রাতে ও সন্ধ্যাতে আসিয়া মাতৃচরণে প্রণত হইতে লাগিলেন।

যখন গৃহমধ্যে এই সকল ধর্ম্মভাবের বিকাশ দেখা গেল, তখন অপরদিকে মহেশ মহোৎসাহের সহিত তাঁহার চিরপোষিত পরসেবার ভাবসকল ফুটাইতে প্রবৃত্ত হইলেন। অগ্রেই বলা হইয়াছে যে, মাতা পীড়িত হইবার পূর্ব্বে তিনি ভাবিতেছিলেন যে ক্ষীরদা ও নিস্তারিণীকে সহায় করিয়া নারীগণের উন্নতির জন্য কোনও উপায় অবলম্বন করা যায় কি না? সেই চিন্তা আবার তাঁহার হৃদয়ে আসিল। তিনি ডাক্তার ভদ্র, ক্ষীরদা ও নিস্তারিণীর সঙ্গে সে বিষয়ে কথাবার্ত্তা আরম্ভ করিলেন। শেষে স্থির হইল যে, কঠিন অবরোধ প্রথার মধ্যে নারীগণের নিকট পৌঁছান কঠিন; ক্ষীরদা ও নিস্তারিণী যে বাড়ী বাড়ী ঘুরিয়া বেড়ান তাহাও সম্ভব নয়। অভাবপক্ষে এইমাত্র হইতে পারে, সহরের ভদ্র পরিবারদের যে পল্লী আছে, তাহার মধ্যে নির্জ্জন স্থানে যদি একটি বাড় পাওয়া যায়, তাহাতে দুইটি ঘর বৈকালে পাড়ার মেয়েদের একত্র হইবার জন্য থাকিবে, মেয়েরা, বিশেষতঃ বিধবারা, একত্র হইয়া কাপড়ের পাড় তোলা, কাপড়ে ফুলতোলা, টুপীর পাড় বসান, ছোট ছোট ছেলে

মেয়েদের জামা কাপড় তৈয়ার করা, প্রভৃতি কাজ শিখিবেন; কৌমুদী ও নিস্তারিণী প্রতিদিন বৈকালে গিয়া সেই কাজ দেখিবেন; এবং মেয়েদের একটু একটু পড়াইবেন। তদ্ভিন্ন তৎপার্শ্বেই আর তিন চারিটি ঘরে একটী বালিকাবিদ্যালয় থাকিবে, সেখানে ছোট মেয়েরা পড়িবে।

এই ভাবটা মাথায় আসাতে মহেশের আর বিশ্রাম রহিল না। তিনি সহরের ভদ্রলোকদের মধ্যে যেখানে সেখানে এই কথা আরম্ভ করিলেন; বাড়ীতে বাড়ীতে মেয়েরা শুনিয়া উৎসাহিত হইতে লাগিলেন। অনুসন্ধানে জানা গেল যে বাঙ্গালী ভদ্রলোকদের পাড়ার মধ্যে একপার্শ্বে দেবীপ্রসাদ বাবুদের কর্ম্মচারীদের থাকিবার জন্য একটী বাড়ী আছে; তাহার উঠানের একদিকে তিনটি ঘর ও অপর দিকে চারিটী ঘর আছে। মহেশ কাহাকেও কিছু না বলিয়া একদিন সেই বাড়ীটী দেখিয়া আসিলেন। তৎপরে বাবু গোপাললালের সাক্ষাতে একদিন দেবীপ্রসাদের জননী গৃহিণী ঠাকুরাণীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া, মধ্যবিত্ত গৃহস্থদের গৃহে বিধবাদের কিরূপ দুর্দ্দশা, তাঁহাদিগকে যদি নিজ নিজ ঘরে বসিয়া কাপড়ে পাড় লাগান, কাপড়ে ফুলতোলা, টুপীতে পাড় বসান এবং অন্যান্য শিল্প শেখান যায়, তাঁহাদের অনেক খরচ বাঁচিয়া যায়, মাঝে মাঝে কিছু কিছু উপার্জ্জন করিতেও পারেন; এবং একটা করবার মত কাজ হাতে থাকিলে, মনটাও ভাল থাকিতে পারে,—এই সকল কথা তাঁহাকে বুঝাইবার চেষ্টা করিলেন। সহৃদয়া নারী বিষয়টা বেশ হৃদয়ঙ্গম করিলেন; এবং কিরূপ সাহায্যের প্রয়োজন তাহা জিজ্ঞাসা করিলেন। তখন কর্ম্মচারীদের সেই বাড়ীটার কথা হইল। গৃহিণী ঠাকুরাণীর অনুরোধে বাবু গোপাললাল তখন সে বাড়ীটা খালি করাইবার সঙ্কল্প জানাইলেন; এবং গৃহিণী ঠাকুরাণী ঐ মহিলা-শিল্পাশ্রমের সমুদয় ব্যয়ভার বহন করিতে প্রস্তুত হইলেন।

কর্মচারীদিগকে উঠাইয়া অন্য এক বাড়ীতে রাখা হইল, এবং বাড়ীটী পরিষ্কার করিয়া, উঠানটি ভাল করিয়া ঘিরিয়া, মেয়েদের জন্য দেওয়া হইল। পাড়ার বাড়ীতে বাড়ীতে বিধবাদিগকে একদিন বৈকালে ঐ বাড়ীতে সমবেত হইবার জন্য নিমন্ত্রণ করা হইল। প্রথমদিন বড় বেশী মেয়ে আসিলেন না; কিন্তু ক্ষীরদা ও নিস্তারিণী বাড়ীর গাড়ীতে করিয়া গেলেন। গিয়া মেয়েদের কথা সঙ্গে কহিতেছেন, এমন সময়ে কন্যা ও পুত্রবধূসহ গৃহিণীঠাকুরাণী আসিয়া উপস্থিত। মেয়েরা দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া গেলেন। শিক্ষার্থিনী বিধবার সংখ্যা দিন দিন বাড়িতে লাগিল। মহেশ গৃহিণীঠাকুরাণীর সাহায্যে মেয়েদের শিল্পশিক্ষার বন্দোবস্ত করিয়াদিলেন। ক্রমে উঠানের অপর পার্শ্বের চারি ঘরে একটী বালিকাবিদ্যালয়েরও আয়োজন হইল। স্বীয় বাসগ্রামে বালিকাবিদ্যালয় স্থাপন করিয়া মহেশের সে বিষয়ে অভিজ্ঞতা আছে; সেই সকল উপায়ে এখানেও কার্য্য আরম্ভ করিলেন। গৃহিণীঠাকুরাণীর প্রদত্ত এক গাড়ীতে করিয়া বালিকাদিগকে ও দূরের বিধবাদিগকে আনা হইতে লাগিল।

উৎসাহের সহিত মহিলা-শিল্পাশ্রমের কাজ চলিতেছে, এমন সময়ে একটী ঘটনা ঘটিল যাহা উল্লেখযোগ্য। পাড়ার বিধবাদের অনেকেই গাড়ীর অপেক্ষা না করিয়া, হাঁটিয়া, অপরাহ্ণ বেলা দুইটার সময়ে, শিল্পাশ্রমে আসিতেন, এবং পাঁচটার সময়ে ঘরে ফিরিতেন। তখন পুরুষেরা কর্মস্থানে, সুতরাং কাহারও সহিত সাক্ষাৎ হইত না। এই বিধবাদের মধ্যে একজন শিল্পাশ্রমের সন্নিকটেই থাকিতেন। বৃদ্ধা বিধবা মাতা ভিন্ন কেহ তাঁহাদের সঙ্গিনী ছিলেন না। তিনি উৎসাহের সহিত এই কাজে আপনাকে অর্পণ করিয়াছিলেন। মেয়েটী প্রায় নিস্তারিণীর সমবয়স্কা, দেখিতে বেশ সুশ্রী। তিনি একদিন গোপনে ক্ষীরদা ও নিস্তারিণীকে বলিলেন, যে পাড়ার পুরুষেরা তাঁকে বড় বিরক্ত করে; এই বিরক্তি

তিনি অনেকদিন সহিয়া আসিতেছেন; সম্প্রতি এই বিরক্তির এক নূতন কারণ উপস্থিত হইয়াছে; তাঁহার বাড়ীর পার্শ্বেই তাঁহাদের স্বজাতীয় ও স্বসম্পর্কীয় একটী নিকম্মা যুবক আছে, তার পত্নীর সহিত তাঁর বন্ধুতা আছে; কিন্তু নির্লজ্জ পুরুষটী তাঁর পশ্চাতে বড়ই লাগিয়াছে; তিনি শিল্পাশ্রমে আসিবার জন্য পথে বাহির হইলেই সে বাড়ীর বাহির হয়; গলা খাঁকারি দেয়; পথ সম্পূর্ণ নির্জ্জন দেখিলে কাছে আসে; হাসিয়া কথা কয়; প্রেম সম্ভাষণ করে—ইত্যাদি ইত্যাদি।

ক্ষীরদা। তুমি তার দিকে চেয়েও দেখোনা; তার দিকে কাণও দিও না; কতদিন ওরকম করবে? করে করে লাঞ্ছিত হয়ে, শেষে ওপথ ছাড়্বে।

নিস্তারিণী। তার কি মা বাপ কেউ নাই? তাঁদের জানিয়ে কি থামান যায় না?

বিধবা। না, মা বাপ নাই; এক বড় ভাই আছে, তারও স্বভাব চরিত্র ভাল নয়।

নিস্তারিণী। ও মা! তবেইত বিপদ!

ক্ষীরদা। আমার একটা কথা মনে হচ্চে; লোকটাকে কোনও প্রকারে লজ্জিত করতে পারলে ভাল হয়; তখন হয় ত আপনা আপনি ওপথ ছাড়বে।

নিস্তারিণী। বেহায়া মানুষকে লজ্জিত করা কত কঠিন, তা ত জান?

ক্ষীরদা। আমার একটা কথা মনে হচ্ছে। সামনেই ভাইফোঁটার দিন আসচে; সেই দিনে ওকে একলা তোমার বাড়ীতে খেতে নিমন্ত্রণ কর; তুমি নিমন্ত্রণ করলে সে উৎসাহেই আসবে, মনে করবে তোমার মন বুঝি ফিরচে; তার পর সে এসে বসলে তুমি তার কপালে ফোঁটা ও

গলায় মালা দিয়ে দিও; এবং বোলো—"আজ হতে তুমি আমার ভাই হলে; আজ থেকে আমার পিছনে দাঁড়াও, ও আমাকে রক্ষা কর।" যদি তার একটুও মনুষ্যত্ব থাকে, এতে তার মন নিশ্চয় ভিজে যাবে।

সেইরূপ করাই স্থির হইল। ভাইফোঁটার দিন প্রাতে নিস্তারিণী মহেশকে ফোঁটা দিবার জন্ত ও তাঁর খাওয়ার আয়োজন করিবার জন্ত গৃহে আবদ্ধ রহিলেন; কিন্তু ক্ষীরদা গোপনে গাড়ীতে করিয়া গিয়া, সেই বিধবার বাড়ীর কিছু দূরে গাড়ী রাখিয়া তাঁর বাড়ীতে গেলেন; এবং ঘরের মধ্যে লুকাইয়া রহিলেন। যথা সময়ে বিধবাটীর নিমন্ত্রণে যুবকটী হাসিতে হাসিতে আসিয়া উপস্থিত; তখন মনে করে নাই যে ভাই-ফোঁটার নিমন্ত্রণ; কিন্তু মেয়েটী যখন গম্ভীর ভাবে ফোঁটা লইয়া কপালে দিল এবং গলায় মালা পরাইয়া দিয়া বলিল—"তুমি আজ হতে আমার ভাই হলে, এইবার আমাকে রক্ষা কররে", তখন বাস্তবিক যুবকটীর মুখে গম্ভীর ভাব আসিল; সে লজ্জায় অধোবদন হইয়া রহিল; বলিতে লাগিল —"আমাকে মাপ কর, আমি ওরূপ কাজ আর করব না"। সেই অবধি বিধবাটীর প্রতি তার ভাব বদলাইয়া গেল; সে মহিলা-শিল্পাশ্রমের একজন প্রধান পৃষ্ঠপোষক হইয়া দাঁড়াইল। যুবকটী আহার করিয়া চলিয়া গেলে, ক্ষীরদা হাসিতে হাসিতে ঘর হইতে বাহির হইলেন, বলিলেন—"কি আশ্চর্য্য, আমি যা ভেবেছিলাম, তাই হলো! মানুষটার মন বোধ হয় ফিরে গেল!" তৎপরে গাড়ী করিয়া ক্ষীরদা বাড়ীতে ফিরিলেন।

ইহার কিছুদিন পরেই আর একটী ঘটনা ঘটিল। মিশনারিদের বালিকাবিদ্যালয়ে কৃপার পড়া ভাল হইতেছে না দেখিয়া, কিছুদিন হইতে মহেশের মনটা উদ্বিগ্ন রহিয়াছে। নিজেদের যে বালিকাবিদ্যালয় হইল, তাহাও অশিক্ষিত বালিকাদের নূতন পাঠারম্ভের জন্ত, কৃপার উপযুক্ত নয়। কৃপার জন্ত কি করা যায় ভাবিতে ভাবিতে মহেশের মনে হইল

যে কলিকাতাতে একটী ব্রাহ্মপরিবারের সহিত তাঁর বন্ধুতা আছে; যদি তাঁরা দয়া করিয়া কৃপাকে নিজ ভবনে স্থান দেন, তাহা হইলে তাকে বেথুনস্কুলে ভর্ত্তি করা যাইতে পারে। সেই ব্রাহ্মবন্ধুটীর সহিত পত্রে পত্রে মহেশের পরামর্শ চলিতেছিল। অবশেষে তাঁহার উত্তর আসিল যে, মহেশ ইচ্ছা করিলে কৃপাকে তাঁহাদের ভবনে রাখিয়া আসিতে পারেন। মহেশের মাথার বোঝা যেন নামিয়া গেল। তিনি আফিস হইতে দুইদিনের ছুটী লইয়া কৃপাকে লইয়া কলিকাতায় গেলেন। সেখানে কৃপাকে বেথুনস্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দেওয়া হইল; এবং থাকার ও পড়ার সমুদয় বন্দোবস্ত ঠিক করা হইল।

এই সকল আয়োজন করিবার জন্ত মহেশ যে দুইদিন কলিকাতাতে রহিলেন তাহার মধ্যে তিনি নারীকুলের উন্নতির জন্য কি কি করা হইতেছে, তাহা দেখিবার অবসর পাইলেন। তন্মধ্যে একটী আয়োজন এই দেখিলেন যে, কতকগুলি শিক্ষিত মেয়ে দলবদ্ধ হইয়া তাঁহার বন্ধুর ভবনে একটি সঙ্গীত-সভা স্থাপন করিয়াছেন। তাঁহারা নিজ নিজ ভবনে শিক্ষক রাখিয়া গান বাজনা শিখিয়া থাকেন; তদ্ভিন্ন প্রত্যেক শুক্রবার সন্ধ্যার সময় মহেশের বন্ধু গুপ্ত মহাশয়ের ভবনে সকলে মিলিত হইয়া ঐকতান বাদন শিখিয়া থাকেন। এই গান বাজনা শিক্ষার বিষয়ে তাঁহার বন্ধুর পত্নী মনোরমা অধিনেত্রীর কাজ করিয়া থাকেন। সে শুক্রবার মহেশ তাঁহাদের ভবনে উপস্থিত; সুতরাং মহিলাদের সঙ্গীত চর্চ্চা দেখিবার সুবিধা হইল।

মেয়েরা চলিয়া গেলে তাঁহার বন্ধুর পত্নীর সহিত তাঁহার কথোপকথন হইল। তিনি একজন শিক্ষিতা, ধর্ম্মপরায়ণা, নারী; তিনি ধর্ম্মপরায়ণতা ও আত্মানুরাগের জন্ত নারীকুলের মধ্যে প্রসিদ্ধা। গৃহ পরিবারে ধর্ম্মসাধনকে সুপ্রতিষ্ঠিত রাখিয়াছেন; প্রতিদিন প্রাতে তিনি পতির সহিত

ভগবানের স্তুতি বন্দনা না করিয়া গৃহকর্ম আরম্ভ করেন না। সায়ংকালে পুত্রকন্যাদিগকে লইয়া সপরিবারে ভগবানের নিকট প্রার্থনা করা হয়। একদিকে যেমন তাঁহার সন্তানদের রীতিনীতি, চরিত্র, ধর্মভাব ও আত্মোন্নতির প্রতি দৃষ্টি, অপরদিকে তাহাদিগকে গান বাজনা শিখাইবার জন্য ব্যগ্রতা। গান বাজনাকে তাহাদের চক্ষে নির্দোষ ও পবিত্র আমোদ করিবার জন্য নিজে হারমোনিয়ম ও সেতার বাজাইতে শিখিয়াছেন ; এবং তাহাদের গান বাজনার মধ্যে নিজে উপস্থিত থাকেন। পরিবারের মধ্যে গান বাজনার চর্চ্চা বিষয়ে মহেশের সহিত তাঁহার যে আলাপ হইল তাহা এই :—

মহেশ। আপনাদের বাড়ীতে এসে একটা নূতন বিষয় দেখলাম।

মনোরমা। কি দেখলেন ?

মহেশ। মেয়েদের গান বাজনা।

মনোরমা। এটা আমি ইচ্ছে করে প্রবর্ত্তিত করেছি ; আমি এ বিষয়ে অনেক চিন্তা করেছি ; গৃহ পরিবারে যেমন ধর্মচিন্তা, ধর্মসাধন প্রভৃতির নিয়ম থাকা আবশ্যক, তেমনি নির্দোষ আমোদও থাকা আবশ্যক। গৃহ পরিবার এমন হবে যে ছেলে মেয়েদের আমোদ প্রমোদের জন্য বাইরে যাবার দরকার থাকবে না। ছেলেরা যে গানবাজনা শোনার জন্য থিয়েটারে যাবে, কি ইয়ার বন্ধুদের সঙ্গে গিয়ে মিশবে, তাতে বিপদ আছে। তাদের প্রাণ যা চায় তা যেন ঘরের মধ্যে পায়। গানবাজনার মধ্যে এমন কি আছে যে ছেলে মেয়েরা মা বাপের সাক্ষাতে করতে পারবে না ? এই দেখুন না, আমাদের ছেলে মেয়েরা কিরূপ প্রফুল্ল, আনন্দিত ও পরস্পরকে ভালবাসে ; ও কেবল ঘরের মধ্যে প্রাণ খুলে গানবাজনা আমোদ আহ্লাদ করতে পারে বলে। দেশের অবস্থা একবার ভেবে দেখুন ; গানবাজনা শেখবার লোভে

যুবকেরা কত সময় বিপথে পদার্পণ করে; থিয়েটারে যায় অসৎ মেয়েদের সঙ্গে মেশে; এবং অসৎ হয়ে যায়। আর একটা কথা আছে। সৌন্দর্য্য বোধ শক্তি, যাহাকে ইংরাজীতে esthetics বলে, তার বিকাশকে আমি বালক বালিকাদের শিক্ষার একটা প্রধান অঙ্গ বলে মনে করি। তাতে তাদের চিত্তকে সুস্থ, সুখী ও মিষ্ট করে; এইজন্ত দেখুন না, কত ভাল ভাল ছবি সংগ্রহ করে বাড়ী পূর্ণ করেছি; এইজন্ত বাড়ীর সঙ্গে একটি ছোট বাগান রেখেছি; বাগানটিকে সুন্দর করে রাখবার ভার ছেলে মেয়েদের উপরে দিয়েছি; তদ্ভিন্ন মাসে প্রায় দুবার ছেলে মেয়েদের নিয়ে কোম্পানির বাগান দেখিয়ে আনি; এবং Art gallery দেখতে নিয়ে যাই; আমি সৌন্দর্য্যবোধের বড় পক্ষপাতী।

মহেশ। ঠিক বলেছেন, ঠিক বলেছেন; গৃহপরিবারে সকল প্রকার নির্দ্দোষ আমোদ প্রমোদ থাকা ও সৌন্দর্য্য বোধের বিকাশের উপায় থাকা নিতান্ত আবশ্যক। ওমা, আপনি এত ভাবেন ও এত করেন, তা ত জানতাম না। পরিবারের মাথায় আপনার মত একজন কর্ত্রী থাকা সৌভাগ্য। আমি এইবার বহরমপুরে গিয়ে ক্ষীরদা ও নিস্তারিণীকে গান বাজনা শেখাবার বন্দোবস্ত করব।

ইহার পরে মহেশ ভাবিতে লাগিলেন যে বহরমপুরে ফিরিয়া ক্ষীরদা ও নিস্তারিণীর সঙ্গীত শিক্ষার বন্দোবস্ত করিবেন। ভাবিতে গিয়া মনে হইল ডাক্তার ভদ্র একজন সুগায়ক এবং হারমোনিয়ম প্রভৃতি বাজাইতে জানেন, তিনি এবিষয়ে সাহায্য করিতে পারিবেন। জননী চলিয়া গিয়াছেন, সুতরাং অগ্রে এ পথে যে বিঘ্ন ছিল, তাহা আর নাই; এই একটা কাজে ভাল করিয়া লাগিতে হইবে। এই সংকল্প স্থির রহিল।

তাঁহার বন্ধুর পত্নীর ধর্ম্মভাব ও সদাশয়তা তাঁহাকে মুগ্ধ করিল। প্রাতে পুত্তি পত্নীতে সর্ব্বাগ্রে ভগবানের চরণ বন্দনা করিয়া তবে গৃহকার্য্য

আরম্ভ করেন ; সায়ংকালে সপরিবারে ঈশ্বরের স্তুতি হয় ; সে নিয়ম লঙ্ঘনের যো নাই। কেবল তাহা নহে। এই মনস্বিনী মহিলার মুখে এমনি একটা সাধুতা, দৃঢ়তা, জিতাত্মতার ও ঈশ্বর-ভক্তির আভা আছে যে, মুখ দেখিলে শ্রদ্ধা না করিয়া থাকা যায় না। মহেশ দুই দিনেই বন্ধুর পত্নী মনোরমার গোঁড়া হইয়া পড়িলেন।

তৎপরে তিনি নব-প্রতিষ্ঠিত বালিকা বিদ্যালয়ের জন্য একজন শিক্ষয়িত্রী অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। এবিষয়ে তাঁহার বন্ধুর পত্নী তাঁহার সহায় হইলেন। মনোরমার চেষ্টাতে একজন শিক্ষয়িত্রী মিলিল ; তিনি নব-প্রতিষ্ঠিত বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষয়িত্রী হইবার উপযুক্ত। তিনি নিজে বিধবা, কিন্তু পরিণয়সূত্রে আর বদ্ধ হইবার ইচ্ছা নাই ; শিক্ষয়িত্রীর কাজ ও অপরাপর ভাল কাজে জীবন অর্পণ করিতে চান। ভাগ্যক্রমে ইনি সঙ্গীত-সভার একজন সভ্য, গাইতে বাজাইতে পারেন। ইঁহাকে পাইয়া মহেশের আনন্দ হইল। স্থির হইল যে, তিনি মহেশের বাড়ীতেই থাকিবেন, সেখানে অন্ন বস্ত্র পাইবেন এবং খুকীর তত্ত্বাবধানের জন্য মাসে অতিরিক্ত পনর টাকা বেতন পাইবেন। তদ্ভিন্ন বালিকা বিদ্যালয় হইতে মাসিক পঁয়ত্রিশ টাকা পাইবেন। ইহাতে স্বীকৃত হইয়া তিনি মহেশের সঙ্গে বহরমপুরে গেলেন। তাঁহার নাম সারদাসুন্দরী ; বয়সে নিস্তারিণী অপেক্ষা দুই এক বৎসরের বড়।

সারদাসুন্দরীকে আনিয়া মহেশ নিজগৃহে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। তাঁহার পদার্পণে গৃহে যেন নূতন আনন্দের হাওয়া বহিল। মেয়েটি বড়ই সপ্রতিভ, সুপ্রসন্ন, উদারচেতা ও অমায়িক ; সকল কাজে বাড়ীর মেয়েদের সাহায্য করিতে প্রস্তুত। তিনি দুই দিনের মধ্যেই গৃহের সকল কাজে সকল পরামর্শে প্রবেশ করিলেন। প্রতিদিন সন্ধ্যার পর জগদ্ধাত্রী দেবীর পূজার ঘরে গিয়া সকলের সঙ্গে বসিতে লাগিলেন ;

এবং ব্রাহ্মধর্ম্মাশ্রিত করিয়া মহেশের ভজন সাধনের বিশেষ সহায়তা করিতে লাগিলেন। তিনি তিন দিনের মধ্যেই প্রবোধকে একেবারে হাতের ভিতর পুরিয়া লইলেন; প্রবোধ তাঁর হুকুমে চলিতে লাগিল; এবং তাঁহার প্রভাবে ব্রাহ্ম ভাবাপন্ন হইয়া উঠিল।

সারদাসুন্দরীকে হাতের কাছে পাইয়া মহেশের মনের সংকল্পটা কাজে পরিণত করিবার বিশেষ সাহায্য হইল। এবিষয়ে ডাক্তার ভদ্র ও তাঁর সহায় হইলেন। তিনি পঠদ্দশায় গাইতে বাজাইতে শিখিয়া ছিলেন; হার্ম্মোনিয়ম ও বেহালা বেশ বাজাইতে পারেন। মেয়েদের সঙ্গীত শিক্ষার প্রস্তাবে তিনি যেন লাফাইয়া উঠিলেন, বলিলেন, "বাঃ, একথা এতদিন কেন বল নাই ?"

মহেশ। বুঝলে না, মা যতদিন ছিলেন, ততদিন ত এরূপ কিছু করা সম্ভব ছিল না; তার পর মা চলে গেলে, সেই ধাক্কাতে কত দিন গেল। অল্প দিন হলো মেয়েদের মধ্যে কাজ আরম্ভ হয়েছে; এখন সারদা-সুন্দরীকে পেয়ে কাজ করবার সুবিধা পাওয়া গেছে।

ডাক্তার ভদ্র। বেশ, আমি হারমোনিয়ম ও বেহালা শেখাব; সারদাসুন্দরী সেতার শেখাবেন। কয়েকটা সেতার যোগাড় কর।

ক্রমে হারমোনিয়ম, বেহালা, সেতার প্রভৃতি আসিল। ক্ষীরদা ও নিস্তারিণী ডাক্তার ভদ্র, সারদাসুন্দরী ও একজন ওস্তাদের সাহায্যে গান বাজনা শিখিতে প্রবৃত্ত হইলেন। দেখা গেল, এ বিষয়ে নিস্তারিণীর অদ্ভুত শক্তি আছে।

সারদাসুন্দরী প্রাতে উঠিয়া খুকীর পরিচর্য্যাতে ও গৃহকর্ম্মের সাহায্যে ব্যস্ত থাকেন; দশটার পর মহেশকে আনিতে গাড়ি যায়, সেই গাড়িতে বালিকাবিদ্যালয়ে যান; বৈকালে ক্ষীরদা ও নিস্তারিণী যখন শিল্পাশ্রম হইতে ফেরেন, তখন সেই গাড়িতে ঘরে আসেন; এইরূপে তাঁর দিন চলিল।

সারদাসুন্দরীকে আনিয়া মহেশের খরচ বাড়িল; কিন্তু জগদীশ্বরের কৃপায় আর এক সুখের সমাচার আসিয়া উপস্থিত। সারদাসুন্দরী আসিবার কয়েকদিন পরেই মহেশ বাবু গোপাললালের এক পত্র পাইলেন। তিনি লিখিয়াছেন, যে মহেশের চেষ্টাতে পাঁচবৎসরের মধ্যে দেবীপ্রসাদের অর্দ্ধেকের অধিক দেনা শোধ হইয়াছে; জমিদারীর সকল বিভাগেই আয় বৃদ্ধি হইয়াছে; এবং প্রজারা সকলে সন্তুষ্টচিত্তে আছে;— ইহা দেখিয়া তিনি, তাঁহার ভগিনী ও দেবীপ্রসাদ কয়জনে বসিয়া স্থির করিয়াছেন যে, আগামী মাস হইতে তাঁহার বেতন চারিশত টাকা করিয়া দেওয়া হইবে। মহেশ জগদীশ্বরকে ধন্যবাদ করিলেন; মেয়েরা সারদাসুন্দরীকে বলিতে লাগিলেন, "ওগো তোমার পয়া দেখ! তুমি পদার্পণ করলে, অমনি আয় বেড়ে গেল।" এই লইয়া সকলে আনন্দ করিতে লাগিলেন।

নবম পরিচ্ছেদ।

এতদিন খুকুমনির বিশেষ বিবরণ দেওয়া হয় নাই। সে একজন মানুষ সকলের চক্ষের আড়ালে বাড়িতেছে; বাড়ীর লোক ছাড়া অপর কেহ তাহার বিশেষ খবর রাখে না। কিন্তু ফুল যেমন লোক-চক্ষের আড়ালে ফুটিয়া বন আমোদিত করে, তেমনি ঐ শিশুবালিকাও লোকচক্ষের আড়ালে ফুটিয়া উঠিতেছে। সময় আসিয়াছে যখন তাহার খবর লওয়া আবশ্যক; কারণ, তাহার জন্য এক তত্ত্বাবধায়িকা আসিয়া গৃহে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন।

মহেশ যৌবনের প্রারম্ভ হইতেই স্ত্রীশিক্ষার পক্ষপাতী; তিনি সাধ করিয়া খুকীর নাম বীণাপাণি রাখিয়াছেন। বীণাপাণি প্রায় পাঁচ ছয় বৎসরের মেয়ে হইল; সুস্থ সবল দেহ, উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ, চক্ষুদুইটী বিশাল সুদীর্ঘ ও আনন্দের আভাতে উজ্জ্বল, গালদুটী সুগোল ও সুন্দর, ওষ্ঠা-ধরের দুইপার্শ্বে একটু একটু চাপা, তাহাতে আরও সুন্দর দেখায়, মস্তকের কেশগুলি কোঁকড়া কোঁকড়া, মধ্যে দ্বিখণ্ডিত ও অপূর্ব্ব শ্রীতে স্কন্ধদেশে বিলম্বিত। বীণাপাণির সবই ভাল, কেবল ভাষাটার বেলাতেই গোলমাল। কোন্ সূত্রে, কোন্ নিয়মে যে তার ভাষার সৃষ্টি হয়, তাহা বুঝিতে পারা যায় না; বাড়ীর লোকে তবুও কতক বোঝেন, অন্যের সে সাধ্য নাই। একদিনের একটা ঘটনার উল্লেখ করিলে সকলে বুঝিতে পারিবেন ব্যাপার খানা কি। একদিন প্রাতে মহেশের বন্ধু, সুরাপান নিবারিণী সভার সম্পাদক মহাশয়, আসিয়া বসিবার ঘরে তাঁর জন্য অপেক্ষা করিতেছেন, এমন সময়ে বীণাপাণি আসিয়া সেই ঘরে উপস্থিত।

সে অনেকবার তাঁহাকে পিতার কাছে আসিতে দেখিয়াছে, অনেকবার তাঁহার কোলে উঠিয়াছে, অনেকবার তাঁহার চুম্বন পাইয়াছে, সুতরাং তাঁহাকে আপনার লোক বলিয়াই জানে; তাঁহার কাছে আসিতে বা তাঁহার কোলে উঠিতে সঙ্কোচ নাই। সেদিন প্রাতে উঠিয়া সারদাসুন্দরী তাহাকে সুন্দর করিয়া পোষাক পরাইয়া দিয়াছেন; কি সুন্দরই দেখাইতেছে! সে নিকটে আসিবামাত্র সমাগত বন্ধু উঠিয়া তাহাকে কোলে করিয়া লইলেন; "বাঃ বাঃ, কি সুন্দর দেখাচ্ছে!" বলিয়া দুই কপোলে চুম্বন করিলেন; এবং তাহাকে কোলে করিয়া বসিলেন বীণাপাণি তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া দাড়িতে হাত দিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"তুমি বুক্কী থাবে?" বন্ধুটী জানিতেন, মেয়েটী "ক" কে "ত" বলে, "খ" কে "থ" বলে; সুতরাং "থাবে"র অর্থ যে "খাবে" এটা বুঝিতে পারিলেন; কিন্তু "বুক্কী" টাকে তিনি "বক্কী" বলিয়া শুনিয়াছিলেন, তাই জিজ্ঞাসা করিলেন—"বক্কী কি?" বীণাপাণি উত্তর করিল—"আঃ, বক্কী তেন? বক্কী থাগো, থোয়া থায়; বক্কী নয়,বক্কী নয়—বুক্কী—ঈ—ঈ।" এটাও তাঁর পক্ষে দুর্বোধ হইল, তিনি 'হাহা' করিয়া হাসিতে লাগিলেন। এমন সময়ে মহেশ আসিয়া উপস্থিত। তিনি সমুদয় শুনিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন—"ওর কথাটা বুঝতে পার নি? এই ঘরে আস্‌বার আগে ওকে একমুঠো মুড়কী খেতে দেওয়া হয়েছিল; নিজে খেয়ে আনন্দ পেয়েছে, তাই এসে তোমাকে জিজ্ঞাসা করেছে—'মুড়কী খাবে?' মুড়কীকে বলেছে বুক্কী, ও "ম" কে "ব" বলে। তুমি বুক্কী না বুঝে বক্কী করেছ, তাই সংশোধন ক'রে বলেছে—'আঃ, বক্রী কেন? বক্রী ছাগোল, ছোলা থায়; বক্রী নয়, বক্রী নয়,—মুড়কী,!" এই কথার পর উচ্চের অট্টহাস্য! সমাগত ভদ্রলোকটী আবার তাকে বার বার বুকে জড়াইয়া চুম্বন করিতে লাগিলেন; বলিলেন—"দেখুন, আপনার

এই মেয়েটা বড় প্রেমিকা মেয়ে হবে ; মুড়কীটা নিজের মিষ্টি লেগেছে, অমনি আমাকে খেতে দেবার ইচ্ছে হয়েছে ; আমাকে ভালবাসে কি না!”

মহেশ। ওযে প্রেমিকা মেয়ে হবে তাতে আর সন্দেহ নাই ; আমরা সকল কাজে সকল কথায় ওর প্রেমের পরিচয় পাই।

মহেশ সারদাসুন্দরীকে লইয়া কলিকাতা হইতে ফিরিবার সময় বীণাপাণির জন্য রাশীকৃত খেলানা, ছবির বই প্রভৃতি আনিয়াছিলেন। সেগুলির সাহায্যে সারদাসুন্দরী তাহাকে সকাল বিকাল খেলাতে নিযুক্ত রাখেন ; এবং সেইসূত্রে বর্ণপরিচয় করাইয়া শিক্ষারম্ভ করিয়া দিয়াছেন। নিজে স্কুলে যাইবার সময় তাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া যান ; এবং ক্ষীরদা ও নিস্তারিণী যখন বৈকালে ফেরেন, তখন তাহাকে সঙ্গে করিয়া আসেন ; তাঁহারা শিক্ষালয়ে যাইবার সময় খুকীর খাবার সঙ্গে লইয়া যান ; খুকী তাঁহাদের কাছে আসিয়া খায়।

মাতার শয়নগৃহের এককোণে বীণাপাণির একটী খেলার ঘর আছে ; কৃপা সেই খেলার ঘরে বসিয়া তার সঙ্গে খেলা করিত ; তাহাতে ছোট বড় পুতুল, রাঁধিবার হাঁড়িকুড়ি সব আছে। জগদ্ধাত্রীদেবী কলিকাতা হইতে আসিবার সময় কালীঘাট হইতে ঐ সব হাঁড়িকুড়ি, খেলাঘরের সামগ্রী, কৃপা ও খুকীর জন্য আনিয়াছিলেন ; তারপর মেয়ে বড় হইলে ক্ষীরদা আবার অনেক রকম জিনিসপত্র আনাইয়া দিয়াছেন। সুতরাং বীণাপাণির জিনিসপত্রের অভাব নাই ; কেবল খেলিবার সঙ্গীর অভাব। কৃপার প্রতিপালিত মণি-বিড়ালের একটী বাচ্ছা ধুনী এক প্রধান সঙ্গী ; খুকুমণি নড়িতে চড়িতে ধুনীকে বাম কক্ষে লইয়াই আছেন ! নিজের খেলার ঘরের মধ্যে তাকে স্থাপন করিবার ইচ্ছা ; কিন্তু সে ছাড়া পাই-লেই খেলার ঘর হইতে বাহির হইয়া যায়, ঐ এক বড় দুঃখ। নিস্তারিণী

বলিয়া দিয়াছেন—"ওকে মধ্যে মধ্যে খেলা ঘরের ভিতর মিষ্টি খেতে দিও, লোভে লোভে খেলাঘরে থাক্‌বে।" তাই মণির বাচ্ছা ধুনীর জন্য মিষ্টান্ন সর্ব্বদাই খেলাঘরে আছে। আর একজন সঙ্গী জহর-কুকুর; জগদ্ধাত্রীদেবী চলিয়া যাওয়ার পর জহরের বন্ধনদশা ঘুচিয়াছে; সে মহানন্দে সর্ব্বত্রই গতিবিধি করে; কেবল রান্নাঘরের কাছে গেলে ঝী ও রাঁধুনীর তাড়া খাইয়া ফিরিয়া আসিতে হয়। নতুবা এমন মানুষ নাই যার সঙ্গ সে লয় না, এমন ঘর নাই যেখানে সে যায় না। ক্ষীরদা শুইয়া আছেন, সে আসিয়া খাটে পা দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়াছে, এবং তাঁর হাত চাটিতে চাহিতেছে; ক্ষীরদা হাত সরাইয়া লইয়া বলিতেছেন—"থাক্‌, থাক্, ঐ ঢের হয়েছে"; বুঝিতে পারিতেছেন ওটা চুম্বনের প্রয়াস। নিস্তারিণী কুটনা কুটিতেছেন, জহর সেখানে গিয়া আলু লইয়া গড়াইয়া খেলা করিতেছে; এবং চোকোচোকি হইলেই লাঙ্গুল নাড়িয়া আনন্দ প্রকাশ করিতেছে; মহেশ মায়ের পূজার ঘরে ধ্যানস্থ আছেন, জহর সেখানে গিয়া চক্ষুমুদিয়া পড়িয়া আছে; যেন সেও ধ্যানস্থ! খুকী খেলার ঘরে খেলা করিতেছে, সেখানে গিয়া তার কোলে মাথা দিয়া আছে; খুকী বাম হস্তে মাঝে মাঝে তার মাথা থাবড়াইতেছে। ইহার উপরে বীণাপাণির প্রধান সঙ্গী আছে খেলাঘরের পুতুলগুলি। তাদের কেউ পুরুষ, কেউ মেয়ে, কেউ মা, কেউ খুকী; কেউ কাঁদচে, তাকে থামাতে হচ্চে; কেউ খেতে চাচ্চে, তাকে খেতে দিতে হচ্চে;—এই সকল কাজে বীণাপাণি সর্ব্বদাই ব্যস্ত। সারদাসুন্দরী আসিয়া খেলাঘরের আর একজন সঙ্গিনী হইয়াছেন। তিনি কাজকর্ম্মের ভিতরে মধ্যে মধ্যে আসিতেছেন, খেলার ঘরে বসিতেছেন, এটা ওটা গুছাইয়া দিতেছেন, একে ওকে বকিতেছেন, কারুকে সাজা দিতেছেন, বাড়ীর বাহির করিয়া দিতেছেন, ইত্যাদি ইত্যাদি।

সারদাসুন্দরী যে কেবল খুকীর সকলপ্রকার ভার লইয়াছেন, তাহা নহে; সংসারের কাজকর্ম্ম দেখাও তাঁহার কাজের মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছে। ক্ষীরদা আসন্ন-প্রসবা; সারদাসুন্দরী তাঁহাকে রন্ধনশালার ভার হইতে নিষ্কৃতি দিয়াছেন; বলিয়াছেন—"যাও, যাও, ও কাজগুলো আমি দেখব; তুমি ওদিকে আর এখন খেট না।" নিস্তারিণী সে ভার লইতে গেলে বলিয়াছেন—"যাও, যাও, শিল্পাশ্রম দেখা তোমার যথেষ্ট কাজ; তুমি লেখাপড়া কর, গানবাজনা শেখ ও শিল্পাশ্রমের কাজ কর;—কোন দিন তোমাদের দুইহাত এক হবে তা কে জানে?" এটা ডাক্তার ভদ্রের প্রতি কটাক্ষ, তাহা সকলেই বুঝিতে পারিতেছেন। সারদাসুন্দরী আসিয়াই অল্প কয়েক দিনের মধ্যেই নিস্তারিণীর অন্তরঙ্গ বন্ধু হইয়া পড়িয়াছেন; এবং ডাক্তার ভদ্রের সহিত কথা কহিয়া এবং উভয়ের ভাব দেখিয়া গন্ধে গন্ধে অনুভব করিয়াছেন, যে, নদী যেমন সাগরাভিমুখে চলিয়াছে, ডাক্তার ভদ্রও জগতের নারীকুলের মধ্যে এই নারীটীতে বিশেষ আকর্ষণের বস্তু দেখিতেছেন; অথচ, আজিও তিনি নিস্তারিণীর কাছে নিজ মনের ভাব ব্যক্ত করেন নাই; নিস্তারিণীও নিজের ভাব গোপনে রাখিয়াছেন; কিন্তু প্রেম এমনি জিনিস যে ফুলের সৌরভের ন্যায় ইহার একটা সৌরভ বাহির হয়, যাহা অপরে কাছে আসিলেই অনুভব করে!

যাহা হউক, ক্ষীরদা ও নিস্তারিণী সংসারের কাজকর্ম্ম হইতে বিদায় পাইয়া নিজ নিজ পাঠ ও আত্মোন্নতিতে বিশেষরূপ মনোনিবেশ করিয়াছেন। প্রাতে পণ্ডিত মহাশয়ের নিকট সংস্কৃত ও সন্ধ্যাতে মাষ্টার মহাশয়ের নিকট ইংরাজী উৎসাহের সহিত পড়িতেছেন। তাহার উপরে মহেশ ডাক্তার ভদ্রের পরামর্শে সন্ধ্যা ছটা হইতে ৭টা পর্য্যন্ত ক্ষীরদা ও নিস্তারিণীকে সেতার শিখাইবার জন্য একজন সেতারী ওস্তাদকে

নিযুক্ত করিয়াছেন। দুইজনে, বিশেষতঃ নিস্তারিণী, সেতারে খুব অগ্রসর হইতেছেন।

সংসারের কাজকর্ম্ম ও মেয়েদের শিক্ষা প্রভৃতি যখন এইভাবে চলিয়াছে, তখন মহেশের পরসেবা-প্রবৃত্তি যেন আগুনের মত জ্বলিয়া উঠিতেছে। পশ্চাতে থাকিয়া বালিকাবিদ্যালয় ও মহিলা-শিল্পাশ্রমের তত্ত্বাবধান করা তাঁহার একমাত্র কার্য্য নয়; আত্মোন্নতি-সভা ও সুরাপান-নিবারিণী সভার পশ্চাতে তিনি লাগিয়া রহিয়াছেন। আত্মোন্নতি-সভার 'হল'গৃহে স্থানীয় যুবকদিগকে লইয়া মধ্যে মধ্যে বসিতেছেন; সভার জন্য ভাল ভাল পুস্তক আনাইতেছেন; ছেলেদের দ্বারা চাঁদা সংগ্রহ করিয়া বিধবা ও নিরাশ্রয় ব্যক্তিদের সাহায্যের ব্যবস্থা করিতেছেন; সুরাপান-নিবারিণী সভার পুস্তকপত্রিকাদি বিতরণ করিতেছেন; এবং ডাক্তার ভদ্রের সাহায্যে ভদ্রলোকদিগকে মধ্যে মধ্যে ডাকাইয়া সুরাপানের অনিষ্টকারিতা সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছেন।

কেবল তাহাও নহে, কলকারখানার শ্রমজীবিগণকে তিনি বিস্মৃত হন নাই। পূর্ব্বোক্ত দশ ব্যক্তিকে আরও দুই তিনবার, রবিবার বৈকালে, নিজ ভবনে আনাইয়া খাওয়াইয়াছেন; এবং শ্রমজীবীদিগের সংবাদ লইয়াছেন; দুইবার মেয়েদিগকে লইয়া তাহাদের মেয়েদিগকে দেখিতে গিয়াছেন; এবং সুরাপান-নিবারিণী সভার সম্পাদকের দ্বারা ক্রিশ্চান সাহেবের প্রদত্ত 'হলে' শ্রমজীবীদের জন্য সুরাপানের অনিষ্টকারিতা বিষয়ে বক্তৃতার বন্দোবস্ত করিতেছেন। এ বিষয়ে ডাক্তার ভদ্র তাঁর সহায় আছেন।

এই সকল দেখিয়া লোকে আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলাবলি করিতে লাগিল, "সে ব্যক্তি এত বড় অফিসারটার ম্যানেজার এবং সে কাজে যাকে এতটা ভাবিতে ও এতটা সময় দিতে হয়, সে মানুষ এত কাজ কি

করে করে!" ভিতরকার কথা এই, মহেশের সমুদয় কাজ বাঁধা নিয়মে চলে। লোকে আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া প্রশ্ন করিলে তিনি বলেন—"নিয়মে কাজ কর, দেখবে অনেক কাজ হবে। মানুষ যদি নিয়মে কাজ করা অভ্যাস করে, নিঃশব্দে অনেক হয়ে যায়, যাহা দেখে লোকে অবাক্ হয়। স্বদেশে বিদেশে জগতের মহাপুরুষগণ যে এত কাজ করতে পেরেছেন, তা কেবল নিয়মে কাজ করার জন্য। ভেবে দেখুন, জগদীশ্বরের ন্যায় নিয়মাধীন কে? প্রাতে ঠিক সময়ে সূর্য্যকে তুলতেই হবে; গ্রীষ্মের পর বর্ষা, বর্ষার পর শরৎ আনতেই হবে। এত বিচিত্রতা কোথায়? এক প্রকার শক্তির এত প্রকার কার্য্য কোথায়?—অথচ সাড়া নাই, শব্দ নাই, উত্তেজনা নাই;—নদীর জলস্রোতের ন্যায় কার্য্যস্রোত চলেছে! এটা কেমন শিক্ষা করবার জিনিস! আমার দুঃখ এই, আমি যতটা করতে চাই, ততটা করে উঠতে পারি না; যতটা নিয়মাধীন হওয়া আবশ্যক মনে করি, ততটা হতে পারি না।" মহেশের এই উক্তিতে অনেকে চমৎকৃত হয়।

সারদাসুন্দরীকে গৃহে প্রতিষ্ঠিত করার পর এই সকল কাজ কিছুদিন চলেছে, এমন সময়ে একদিন প্রাতে ক্ষীরদা নবকুমারের মুখ দর্শন করিলেন। পূর্ব্বদিন মধ্যরাত্রি হইতেই প্রসববেদনা দেখা দিয়াছিল; কিন্তু বাড়ীর লোকের নিদ্রাভঙ্গের ভয়ে তিনি কাহাকেও কিছু বলেন নাই; এমন কি মহেশ যে তাঁহার পাশের ঘরে নিদ্রিত ছিলেন, তাঁহাকেও কিছু জানিতে দেন নাই। প্রাতে মহেশ আফিসে বাহির হইবার পূর্ব্বেই শেষ মুহূর্ত্ত আসিয়া উপস্থিত হইল। ডাক্তার ভদ্রকে ও একজন দাইকে ডাকাইবার পূর্ব্বেই সারদাসুন্দরীর ক্রোড়দেশ অলঙ্কৃত করিয়া নবকুমার দেখা দিল। নিস্তারিণীর আনন্দ দেখে কে? মহেশ যে ভাবে উদ্বেগে অন্তরে দাইএর আসার অপেক্ষা করিতেছিলেন,

নিস্তারিণী সে ঘরে দৌড়িয়া গিয়া বলিলেন—"ওগো, এস এস, একবার এসে দেখ, কি সুন্দর ছেলে হয়েছে ; যেন ঘর আলো করেছে !" মহেশ উঠিয়া গেলেন ; গিয়া ক্ষীরদার পাশে দাঁড়াইয়া মনে মনে জগদীশ্বরকে ধন্তবাদ করিতে লাগিলেন। সারদাসুন্দরী বলিলেন—"দাই আর কি ডাকবেন ? আমি বন্ধুদের অনেক আঁতুড় ঘরে কাজ করেছি ; আমি জানি নবজাত শিশুকে কিরূপে রাখতে হয়।" এই বলিয়া নবজাত শিশু ও ক্ষীরদার পরিচর্য্যাতে নিযুক্ত হইলেন। সুন্দর সুপরিষ্কৃত শয্যায় ক্ষীরদা ও শিশুটীকে শয়ান করাইয়া, তাহাদের স্বাস্থ্যের জন্ম যাহা যাহা প্রয়োজন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহার ব্যবস্থা সকল দেখিয়া নিস্তারিণী চমৎকৃত হইয়া যাইতে লাগিলেন। তিনি বরাবর দেখিয়া আসিয়াছেন যে, বাড়ীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা অপরিষ্কৃত স্থানটীতে আঁতুড় ঘর বাঁধা হয় ; তাহাতে ভিজা মেজের উপরে প্রসূতিকে শয়ন করান হয় ; অনেকস্থলে প্রসূতির মলমূত্র, পচা নাড়ী প্রভৃতি কয়েকদিন সেই ঘরেই রাখা হয় ; সে ঘরকে সকলে অপবিত্র মনে করে ; সে ঘরে কেহ প্রবেশ করে না। সারদাসুন্দরীর ব্যবস্থা তাহার বিপরীত দেখিয়া নিস্তারিণী আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। দেখিলেন, সর্ব্বাপেক্ষা স্বাস্থ্যকর সুন্দর ঘরটী সূতিকাগৃহ করা হইল ; অত্যাবশুক ঔষধ ও পথ্যের আয়োজন আগেই করিয়া রাখা হইয়াছিল, তাহা দেওয়া হইল। নিস্তারিণী দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া সারদাসুন্দরীকে বলিতে লাগিলেন—"মাগো মা ! কে বলবে তুমি স্কুলের শিক্ষয়িত্রী ? তুমি যে একজন পাকা দাই !"

সারদাসুন্দরী। অনেক সূতিকাঘরে কাজ করে করে আমি পাকা হয়ে গিয়েছি। আমাদের দেশে সূতিকাঘরের যে অবস্থা সে কথা আর বোলো না ! এতগুলি মানুষ যে আমরা সে ঘর হতে কি করে বাইরে এলাম, এই আশ্চর্য্য। লোকে সূতিকাঘরকে কেন এত অপবিত্র মনে

করে তাই ভেবে আমি আশ্চর্য্য হই। শিশুর জন্মগ্রহণের ন্যায় পবিত্র ব্যাপার আমি কিছু ভেবে পাই না। মাতৃক্রোড়ে নবজাত শিশুকে দেখা—একি সুন্দর, কি পবিত্র দৃশ্য! যদি কোনও বিষয়ে ভগবানের হাত দেখতে হয় তবে এই সেই বিষয়; আর, এইটেই কিনা দেশের লোকের পক্ষে অতি অপবিত্র ঘটনা! কেউ তাদের ছোঁবে না, কেউ সে ঘরে যাবে না—এ কি রকম!

নিস্তারিণী। ঠিক বলেছ; আমরা যে আঁতুড়ঘর থেকে এত লোকে কি করে বাহির হলাম, সেই আশ্চর্য্য। আজ আমি নূতন আঁতুড়ঘর দেখলাম।

তৎপরে একজন আঁতুড়ের দাই আসিল বটে, কিন্তু সারদাসুন্দরীর উপরে প্রধান ভার রহিয়া গেল। ঘরকন্নার কাজকর্ম নিস্তারিণী দেখিতে লাগিলেন; সারদাসুন্দরী বীণাপাণিকে দেখা ও নবপ্রসূতির পরিচর্য্যা করাকে নিজের প্রধান কাজ করিলেন। মায়ের কোলে নবজাত শিশুকে দেখা বীণাপাণির পক্ষে কি বিস্ময়জনক হইল তাহা আর কি বলিব! শিশুর জন্ম গ্রহণের কয়েকঘণ্টা পরে সারদাসুন্দরী বীণা-পাণিকে বলিলেন "তুমি পুতুল নিয়ে খেলা কর, মায়ের কোলে কেমন সুন্দর পুতুল এসেছে দেখবে?"

বীণাপাণি। মান খেলা ধন তোতার?

সারদাসুন্দরী। দেখবে এস না।

এই বলিয়া তাহাকে সূতিকাগৃহে লইয়া গেলেন; এবং ক্ষীরদার কোলে শিশুটিকে দেখাইলেন। বীণাপাণি দেখিয়া বিস্ময়াবিষ্ট; সারদা-সুন্দরীর কোল হইতে নামিয়া মায়ের কোলে যাইবার জন্য ব্যগ্র হইল। সারদাসুন্দরী তাহাকে ক্ষীরদার পার্শ্বে বসাইয়া দিলেন।

বীণাপাণি। (জননীর মুখের দিকে চাহিয়া) মা ও কে?

ক্ষীরদা। ও তোমার ছোট ভাই, তুমি ওর দিদী, তুমি ওর সঙ্গে খেলা করবে, ও তোমার কোলে বসবে।

বীণাপাণি। আমা তোলে বচিয়ে দেও।

ক্ষীরদা। এখন ও বসতে পারে না, কিছুদিন পরে বসবে।

ইহার পরে বীণাপাণি সকালে বৈকালে অনেক সময় জননীর পার্শ্বে যাপন করিতে লাগিল; এবং নবজাত শিশুকে তাহার কোলে শোয়াইয়া দেওয়া হইতে লাগিল। তাহার খেলাঘরের পুতুল অপেক্ষা এই জীবন্ত পুতুল ভাল লাগিতে লাগিল।

ক্ষীরদা যেদিন আঁতুড় ঘর হইতে বাহির হইলেন, ঘটনাক্রমে সেদিন রবিবার পড়িল। সে দিন প্রাতে ৮ টার সময় জগদ্ধাত্রীদেবীর পূজার ঘরে বাড়ীর সকলে মিলিত হইলেন; জগদ্ধাত্রীদেবীর ছবির দক্ষিণদিকে মহেশ, তাঁর পার্শ্বে ক্ষীরদা, তাঁর পার্শ্বে বীণপাণি, ক্ষীরদার কোলে নবজাত শিশু, বীণাপাণির কোলে মণি-বিড়ালের বাচ্ছা খুনী, বামদিকে সারদাসুন্দরী, নিস্তারিণী ও ডাক্তার ভদ্র। এই প্রাতে বাহি-রের লোককে নিমন্ত্রণ করা হয় নাই। বাহিরের লোকের মধ্যে স্যায়রত্ন মহাশয় আসিয়াছেন; তিনি উভয়দলের মধ্যে আসন পরিগ্রহ করিয়া শাস্ত্রপাঠ ও ভগবানের স্তুতি আবৃত্তি করিতে লাগিলেন; সারদাসুন্দরী, নিস্তারিণী ও ডাক্তার ভদ্র সমস্বরে একটী সুন্দর সঙ্গীত করিলেন; অনন্তর সারদাসুন্দরী নবজাত শিশুর জন্ত ভগবানকে ধন্তবাদ করিতে এবং মাতা ও শিশুর দীর্ঘায়ু প্রার্থনা করিতে লাগিলেন।

বৈকালে শিল্পাশ্রমের অনেক মেয়ে নবজাত শিশু দেখিবার জন্ত আসিলেন। তাঁহারা শিল্পাশ্রমে নিস্তারিণীর কাছে সংবাদ পাইয়া, নব-জাত শিশু দেখিবার ইচ্ছা প্রকাশ করাতে তিনি মহেশের পরামর্শানুসারে অদ্য বৈকালে তাঁহাদের সমবেত হইবার বন্দোবস্ত করিয়াছেন। শুশ্রূষা

৫টার সময় গর্ম্ম্ডির পর গাড়ি আসিয়া মহেশের ভবনের দ্বারে লাগিতে লাগিল এবং মহিলাগণকে পার্শ্বের ঘর দিয়া উপরে লইয়া যাওয়া হইতে লাগিল। ক্রমে স্ত্রীলোকে উপরকার তালার বসিবার ঘর পূর্ণ হইয়া যাইতে লাগিল। শিশুটী তাঁহাদের নিকট আনীত হইলে তাঁহারা সকলে আদর করিতে লাগিলেন এবং নানা প্রকারে আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন। ইত্যবসরে দেবীপ্রসাদের জননী গৃহিণী ঠাকুরাণী কন্যা ও পুত্রবধূসহ আসিয়া উপস্থিত। তাঁহারা মহেশের নিকট সংবাদ পাইয়াছিলেন যে আজ বৈকালে শিশু দেখিবার জন্য উপর তালায় মহিলাদের সমাগম হইবে, তাই আসিয়াছেন; তাঁহারা আসাতে উপরকার নারীসভাটা জাঁকিয়া গেল। ক্ষীরদার আনন্দের সীমা পরিসীমা রহিল না।

এদিকে নীচের তালায় পুরুষদের সমাগম হইয়াছে; মহেশের পরিচিত অনেক ভদ্রলোক আসিয়াছেন। শিশু দেখা তত উদ্দেশ্য নয়, কিন্তু মহেশকে তাঁহাদের আনন্দ জানান প্রধান উদ্দেশ্য; সুতরাং শিশু উপরে মেয়েদের কোলেই রহিল, নীচের তালায় বন্ধুগণ কথোপকথনে কালযাপন করিতে লাগিলেন। ক্রমে নারীগণ একে একে চলিয়া গেলেন। তাঁহারা যাওয়ার পর মহেশ শুনিলেন,—দেবীপ্রসাদের মাতাঠাকুরাণীরা তিন মায়ে ঝিয়ে ছয়টা মোহর দিয়া ছেলে দেখিয়া গিয়াছেন; প্রত্যেকে ছেলের এক এক হাতে এক একটা মোহর দিয়াছেন।

খোকাবাবুর কি আদর! ক্ষীরদা, নিস্তারিণী, সারদাসুন্দরী ও বীণাপাণি এদের কোল ত আছেই, তারপর এক বালিকা ঝী রাখা হইয়াছে; খোকাকে কোলে রাখাই তার প্রধান কাজ। বীণাপাণির খেলাঘরটা তার প্রধান আকর্ষণের স্থান; সকাল বিকাল খোকাকে কোলে করিয়া সেখানে বসিয়া আছে; পুতুল শুয়াইতেছে, পুতুলের কাপড় পরাইতেছে,

সকল বিষয়ে বীণাপাণির সাহায্য করিতেছে। এই সকল দেখিয়া মনে হয় খোকাবাবু এমন কি করিয়া আসিল যে এতটা আদর পায়! সে ত কাহারও এককড়ার সাহায্য করে নাই; কাহারও একটী কেশ-পরিমাণ উপকার করে নাই; সে এতটা আদর যত্ন পায়! হায় রে মাতৃস্নেহ! ইহার ভাব ভাবাতে কে ব্যক্ত করিতে পারে? ইহা যদি না দেখিতাম তাহা হইলে জননীর জননী যিনি তাঁহাকে বোধ হয় চিনিতাম না। বাসাতে কয়টা বাচ্ছা আছে তাহা দেখিবার জন্য আমি নিজে একবার এক পাখীর বাসায় কাঠি দিয়াছিলাম; তারপর দশ বারো দিন সেই পথে যাইতে গেলেই তাহাদের মা আসিয়া আমার মাথাতে ঠুকরাইত; যাপ আর হয় না! আমাদের গাভীটাকে বড় শান্ত বলিয়া জানিতাম, যখন তার বাছুর হইল, তখন বাছুরটীকে ধরিলেই দড়ি ছিঁড়িয়া গুঁতাইতে আসিত! এ সব কি বিচিত্র ব্যাপার! ভগবান, ভগবান! এ মাতৃস্নেহ তোমারি বিচিত্র বিধান! পরের মাতৃস্নেহের কথা কেনই বা বলি? মাগো, তুমি পরকালে কোথায় আছ? বৃদ্ধ সন্তানকে কি দেখিতেছ? তুমি স্নেহের বশে যাহা করিয়াছিলে, তাহার কি বর্ণনা হয়? জননি, তুমি পরম মাতার প্রতিনিধি ছিলে। তাই ত বলি ক্ষীরদা পরমমাতার প্রতিনিধি স্বরূপ হইয়া খোকা বাবুকে কোলে লইয়াছেন; এবং তাঁহারই প্রেরণাতে আর সকলে তাহাকে বুক দিয়া ধরিতেছেন।

যাক্ এ সকল বাহিরের কথা। কয়েক মাসের ছেলে হইতে না হইতে, খোকাবাবুকে কোলে লইবার জন্য আর একজন লোক আসিয়া উপস্থিত। গরমীর ছুটীতে কৃপা কলিকাতা হইতে আসিল। মহেশের কলিকাতার বন্ধু একজন লোকসঙ্গে তাহাকে পাঠাইয়া দিলেন। কৃপার পদার্পণে মহেশের ভবনে আনন্দধ্বনি উঠিল। "ওগো কৃপা এসেছে, ওগো কৃপা এসেছে" বলে সকলেই দেখিবার জন্য ছুটিয়া আসিলেন।

নিস্তারিণী। ওমা, এত অল্প দিনে কত বদলে গেছে দেখ! সে মুখ যেন আর নেই।

ক্ষীরদা। চেহারা কিন্তু ভাল হয়েছে; গালে মাংস লেগেছে; দেখে বোধ হচ্চে খুব যত্নেই আছে।

সারদাসুন্দরী। ওমা, এই সেই কৃপা;—"কৃপা, কৃপা, কৃপা" সর্ব্বদাই শুনি; মনে ভাবি, না জানি সে কৃপা কেমন; বাঃ, এত বেশ মেয়ে!

এত আদর অভ্যর্থনায় দিকে কৃপার মনই নাই; সে অবিলম্বে ক্ষীরদার শয়ন গৃহের দিকে ছুটিল,—"খোকাকে একবার দেখি"। ক্ষীরদা পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিলেন—"সে এখন ঘুমুচ্চে যেন জাগিও না"। কৃপা গিয়া অবাক হইয়া সেই নিদ্রিত শিশুর মুখ দেখিতে লাগিল; বলিল—"ওমা, কি, সুন্দর ছেলেই হয়েছে!" তারপর অর্দ্ধদণ্ডের মধ্যে কৃপা এঘর ওঘর, খুকীর খেলার ঘর, রান্নাঘর, প্রবোধ বাবুর ঘর, গোয়াল ঘর, গরু বাছুর, জহর, মণি, মনির বাচ্ছা ধুনি—সকল পরিদর্শন করিয়া লইল; সর্ব্বশেষে নিজ শয়ন ঘরে গিয়া কাপড়চোপড় ছাড়িতে প্রবৃত্ত হইল। খোকা জাগিলে আর কোথায় যায়! তাকে বুকে করিয়া কি আদর!—"মণি, ধন, মাণিক, সাত রাজার ধন, আকাশের চাঁদ" ইত্যাদি ইত্যাদি আদরের আর অন্ত নাই! অতঃপর খোকাবাবু কৃপা ও বালিকা ঝীর তত্ত্বাবধানেই বাস করিতে লাগিলেন; দুঃখের বিষয় এই মাত্র, তাঁহাকে লইয়া বালিকা ঝীর সহিত মধ্যে মধ্যে কৃপার ঝগড়া হইতে লাগিল; কিন্তু বাড়ীর মেয়েরা তাহাতে কর্ণপাত করেন না।

কৃপা আসার পর প্রবোধের একজন সঙ্গী মিলিল; প্রাতে, দ্বিপ্রহরে, সন্ধ্যাতে যখনই খোকাকে লইয়া ক্লান্ত, তখন তাকে মায়ের কোলে দিয়া কৃপা প্রবোধের ঘর আশ্রয় করে; কখনও বা বই লইয়া এটা ওটা জিজ্ঞাসা করে, কখনও বা কলিকাতার গল্প করে, কখনও প্রবোধের

জামা প্রভৃতি মেরামত করে; একটা না একটা কাজে ব্যাপৃত থাকে। বাড়ীর লোকে দেখিতে পান, সন্ধ্যাকালীন উপাসনান্তে জগদ্ধাত্রী মন্দিরে রূপা প্রবোধেরই পার্শ্বে বসে এবং প্রবোধের সহিত গলা মিশাইয়া গান করে। প্রবোধ বেশ গাইতে পারে; সারদাসুন্দরী গান ধরিলে সে যোগ দেয় এবং ভক্তিভরে দর দর ধারে তার চক্ষে জল পড়িতে থাকে।

অতঃপর একটা ঘরের কথা বলি। পূর্ব্বেই বলিয়াছি সারদাসুন্দরী এ বাড়ীতে আসিয়াই কয়েক দিনের মধ্যে বুঝিতে পারিয়াছেন যে, ডাক্তার ভদ্র ও নিস্তারিণী পরস্পরকে ভালবাসেন। "তোমরা কেন বিয়ে করনা? মহেশবাবু ত বিধবাবিবাহের পক্ষে?"— নিস্তারিণীকে এই কথা জিজ্ঞাসা করাতে তিনি বলিয়াছেন—"বিয়েটাত আর গায়ে ফেলে দেবার জিনিস নয়? উনি সেরূপ ইচ্ছা আজও প্রকাশ করেন নি; এমন কি আমাকে মুখ ফুটে বলেন নি যে আমাকে ভালবাসেন; তারপর আর একটা কথাও আছে;—আমার মা বাবা এখনও বেঁচে আছেন; এরূপ বিবাহে তাঁদের মত হবে না; সেও একটা ভাবনার কথা"।

সারদাসুন্দরী। এই না শুনি তোমার মা বাবা পাঁচ বছরের মধ্যে তোমার খবর নেন নি? মহেশবাবুর হাতে তোমাকে একেবারে দিয়ে দিয়েছেন?

নিস্তারিণী। হাঁ, দিয়েছেন বটে; তবু তাঁদের কথা একটা ভাববার বিষয়।

অতঃপর সারদাসুন্দরী একদিন ডাক্তার ভদ্রকে নির্জ্জন ঘরে পাইয়া বলিলেন—"আপনি একটু বসুন, আমার একটা কথা আছে।"

ডাক্তার ভদ্র। (আসন পরিগ্রহ করিয়া) কি কথা?

সারদাসুন্দরী। নিস্তারিণীর ও আপনার ভাবগতিকে মনে হয়,

আপনারা পরস্পরকে ভালবাসেন এবং পরস্পরকে চান; মহেশবাবু ত বিধবাবিবাহের পক্ষে, কেন তবে এতদিন অপেক্ষা করছেন?

ডাক্তার ভদ্র। আপনি যখন কথাটা তুললেন তখন সব ভেঙ্গেই বলি; উনি আমাকে ভালবাসেন, আমি তা জানি; আমি মাসে আড়াইশ টাকা বেতন পাই; বাহিরের দিক দিয়ে দেখতে গেলে, ওঁকে বিবাহ করে আমার বসবারই কথা; কিন্তু আমার বাবা আমার ঘাড়ে অনেক হাজার টাকার ঋণ-ফেলে গিয়েছেন; সে ঋণের অনেকটা আমার পঠদ্দশায় আমার জন্যেই হয়েছে; তারপর তিনি চলে যাওয়ার পর আমার তিন ভাইকে কলকেতায় রেখে লেখা পড়া শেখাতে হয়েছে; এই সকল কারণে আমার বেতনের অল্পই আমার হাতে থাকে; এরূপ অবস্থায় ভদ্রলোকের মেয়েকে আমার সঙ্গে জুটিয়ে কষ্ট পেতে ডাকা! তাই এতদিন চুপ করে আছি; তাঁকে যে ভালবাসি, কাছে চাই, তা-ও জানতে দিইনি।

সারদাসুন্দরী। ওঃ, এতদিনে কারণটা জানতে পারলাম; কিন্তু বয়স বেড়ে যাচ্চে, আর কতদিন এভাবে থাকবেন।

ডাক্তার ভদ্র। ঈশ্বর-কৃপায় আমার দ্বিতীয় ভাইটী মানুষ হয়ে ছমাস একটা বড় কাজে বসেছে; আমি তাকে বলেছি, "আমার কাঁধের বোঝাটা এখন তুমি লও, আমাকে নিষ্কৃতি দেও"; সে বলেছে, "আরও চার পাঁচ মাস দেরী কর; আমি একটু গুছিয়ে বসি, তারপর ও বোঝা নেব; তুমি যা করেছ, ঢের করেছ;" সুতরাং আর চার পাঁচ মাস পরে বোধ হয় নিষ্কৃতি পাব।

সারদাসুন্দরী। বেশ, চার পাঁচ মাস পরেই না হয় হবে; আমরা তার বন্দোবস্ত করছি; আপনি এখন নিস্তারিণীকে মনের কথাটা ভেঙ্গে বলুন না।

ডাক্তার ভদ্র। আপনারা ত জানলেন, তা হলেই হলো; আবার আমি কি বলবো?

সারদাসুন্দরী। সে কি! পরের হাজার বলাতে কি করে? আমরা ত রোজ বলছি; আপনার প্রাণের কথাটা জানতে পেলে তার কি আনন্দই হবে!

ডাক্তার ভদ্র। আচ্ছা, তবে আমি পত্র দিয়ে জানাব।

ইহার পর ডাক্তার ভদ্র আপনার ভালবাসা জানাইয়া এবং বিবাহের ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া নিস্তারিণীকে এক পত্র লিখিলেন। মহেশ এই চিঠির কথা শুনিয়া চিন্তিত হইলেন। তিনি নিজে ডাক্তার ভদ্র ও নিস্তারিণীর ভালবাসা লক্ষ্য করিয়া আসিতেছিলেন; কিন্তু সেটা যখন পাকিয়া উঠিল, তখন নিস্তারিণীর পিতামাতার চিন্তা আসিল; তাঁহাদিগকে ত একথা জানান চাই; এবং তাঁহাদিগের অনুমতি ত ভিক্ষা করা চাই। অবশেষে সারদাসুন্দরীর সহিত কথা কহিয়া এ বিষয়ে যাহা স্থির হইল তাহা এই;—তাঁহারা যখন মহেশের হাতে মেয়ের ভার দিয়াছেন, তখন মহেশ বিবাহ দিতে পারেন; এখন গোপনে বিবাহ স্থির হইয়া যাক্; চারি পাঁচ মাস পরে, বিবাহের পূর্ব্বেই, তাঁহাদিগকে জানান যাইবে। তদনুসারে একদিন সন্ধ্যার পর, মহেশ, ক্ষীরদা, সারদাসুন্দরী, নিস্তারিণী ও ডাক্তার ভদ্র, কয়জনে জগদ্ধাত্রী দেবীর পূজার ঘরে বসিয়া, ভগবানের নাম করিয়া, এই স্থির হইল যে, আর চারি পাঁচ মাস পরে তাঁহাদের বিবাহ হইবে; সেই মর্ম্মে এক প্রতিজ্ঞা-পত্রে ডাক্তার ভদ্র ও নিস্তারিণী নিজ নিজ নাম স্বাক্ষর করিলেন; এবং সারদাসুন্দরী তাঁহাদিগকে এ প্রতিজ্ঞাতে দৃঢ় রাখিবার জন্ত ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিলেন।

ইহার পরে মহেশের কতকগুলি কাজ আসিয়া পড়িল। প্রথম কাজ, বহরমপুরের কয়েক ক্রোশ দক্ষিণে, কৃষ্ণনগরের উত্তরে, বাবু দেবীপ্রসাদের

জমিদারীর মধ্যে এক গ্রাম আছে; তাহাতে তাঁতীর সংখ্যাই অধিক। এই তাঁতীরা কাপড় বুনিবার জন্য প্রসিদ্ধ; তাহাদের বোনা কাপড় লোকসমাজে "শান্তিপুরে শাড়ী" বলিয়া পরিচিত;—যদিও তাহাদের গ্রাম শান্তিপুর হইতে অনেক দূরে। ইহাদের মধ্যে অনেকে কাপড়ের ব্যবসা করিয়া প্রচুর সম্পত্তি লাভ করিয়াছে; পাকাবাড়ী প্রভৃতি করিয়াছে; এবং জমিজিরেত লইয়া জমিদার হইয়া বসিয়াছে। কিন্তু পদবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ইহাদের মধ্যে অনেকের দুষ্টামি আরম্ভ হইয়াছে; তাহারা সম-ব্যবসায়ী লোকদিগের মধ্যে দল পাকাইয়া বাবু দেবীপ্রসাদের কর্ম্মচারীদিগকে জ্বালাতন করিতে আরম্ভ করিয়াছে। মহেশ কয়েক মাস এই দুশ্চিন্তাতে যাপন করিয়াছেন। অবশেষে নিজে একবার সেই গ্রামে যাওয়া স্থির করিলেন। একদিন, কয়েক দিনের মত নিজ আফিসের কাজের বন্দোবস্ত করিয়া, সেখানে যাত্রা করিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া ও তাঁহার সাধুতার পরিচয় পাইয়া গ্রামবাসী সাধারণ প্রজাদের ভাবান্তর উপস্থিত হইল। তাহারা তাঁহার নিকট কোনও কথা গোপন করিল না; যে যে বিষয় লইয়া জমিদার বাবুদের সহিত বিরোধ উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা সহজে মিটিয়া গেল। অপরদিকে সেই কয়জন ক্ষমতাশালী মানুষ মহেশের সৌজন্যে মুগ্ধ হইয়া সমুদয় বিরুদ্ধ ভাব পরিত্যাগ করিল; এবং গ্রামের তাঁতীদের অবস্থার উন্নতি বিষয়ে মহেশ যে যে পরামর্শ দিয়াছিলেন, তদনুসারে কার্য্য করিতে প্রস্তুত হইল। সে পরামর্শের মধ্যে একটা পরামর্শ এই:—মহেশ অগ্রে শুনিয়াছিলেন ফরাসি সহর চন্দন-নগরের কতকগুলি তাঁতী পশ্চিম হইতে একপ্রকার নূতন তাঁতের কাজ শিখিয়া আসিয়াছে, ও নূতন কল আনিয়াছে, যাহাতে কাপড় বোনার সময় অল্প হয় এবং কাপড়ও ভাল হয়। মহেশ ঐ প্রণালী শিখিবার জন্য তাঁহার প্রজাদের মধ্যে দুইজনকে চন্দননগরে পাঠাইবেন, এই প্রস্তাব

করিয়া তাহাদিগকে সঙ্গে করিয়া বহরমপুরে আসিলেন ; এবং চন্দননগর-বাসী তাঁহার এক বন্ধুকে পত্র লিখিয়া সেই দুইজনকে তাঁত বোনার নূতন প্রণালী শিখিবার জন্য সেখানে প্রেরণ করিলেন। তাহারা যখন সেই প্রণালী শিখিয়া নিজ গ্রামে ফিরিল, তখন সেখানকার তাঁতীদের মধ্যে মহা পরিবর্ত্তন দেখা দিল ; তাহারা নূতন দেওয়ানজীর ও জমিদার বাবুর মহা অনুরক্ত হইয়া দাঁড়াইল।

ইহার ফল এই হইল যে, বাবু গোপাললালের নিকট হইতে একদিন এক পত্র আসিল ; তাহাতে তিনি লিখিয়াছেন যে মহেশের আশ্চর্য্য কার্য্য-প্রণালীর গুণে জমিদার পরিবারের সমস্ত ঋণ শোধ হইয়াছে ; জমিদারীর সকলদিকের সকল গোলমাল থামিয়া গিয়াছে ; জমিদারীর আয় বাড়িয়া সকল দিকে সচ্ছলবোধ হইতেছে ; এইজন্য তিনি, তাঁহার ভগিনী, ও দেবীপ্রসাদ তিনজনে বসিয়া স্থির করিয়াছেন যে, বর্ত্তমান মাস হইতে তাঁহার বেতন ৫০০ পাঁচশত টাকা করা হইল ; এবং যাহাতে তিনি নিজে বহরমপুরে স্থায়ীরূপে থাকেন, সেই উদ্দেশ্যে গঙ্গার ধারে যে বাড়ীতে তিনি আছেন, দানপত্র লিখিয়া সেই বাড়ী তাঁহাকে দান করা হইল।

এই পত্র পড়িয়া মহেশের শরীর কণ্টকিত হইয়া উঠিল। তিনি মেয়েদের মধ্যে গিয়া এই সংবাদ দিলেন ; সকলেই অবাক,—"ওমা, ওমা, কি দয়ালু পরিবার গো !" সারদাসুন্দরী বলিলেন—"হবে না, আপনি এই সদাশয়তার সম্পূর্ণ উপযুক্ত ; আপনি ঐ পরিবারের জন্য কি না করেছেন !"

মহেশ। আমাকে 'আপনি' 'আপনি' কর কেন ? আমি যে তোমার সমবয়স্ক ; দেখ এটা তোমারই পয়া ; তুমি এলেছ বলে এই আয়টা বাড়ল, বাড়ীটা নিজের হলো ; বল দেখি তোমার বেতন কত বৃদ্ধি করে দিলে তোমার সকল দিকে সচ্ছল বোধ হবে ? তুমি সচ্ছন্দ-চিত্তে এখানে বাস কর এই আমার ইচ্ছা।

সারদাসুন্দরী। ছি, ছি! বলোনা! বলোনা, তোমাদের বাড়ী আর আমার পরের বাড়ী মনে হয় না; আমি এখানে কি ভালবাসাই পেয়েছি! আমি ত তোমার বোন! আমি আর মাসে পঞ্চাশ টাকা বেতন নেবনা; আমার যা দরকার হবে তোমার কাছে চেয়ে নেব; আমার তাতে কিছু লজ্জা নেই; আমি জন্মের মত তোমাদের কাছে রইলাম; ক্ষীরদা ও তুমি আমাকে দেখবে; আমি এমন সুখে কোথাও কখনও থাকি নাই।

এই বলিয়া সারদাসুন্দরী বস্ত্রাঞ্চলে চক্ষু মুছিতে লাগিলেন। মহেশের মুখে কথা নাই; তাঁহার চক্ষুর্দ্বয় অশ্রুপূর্ণ, তিনি মৌনী হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন! ক্ষীরদা অগ্রসর হইয়া আসিয়া সারদাসুন্দরীর করে ধরিয়া বলিলেন—"ঠাকুরঝি, ঠাকুরঝি, তুমি আজ কি কথা শোনালে! তোমাকে জন্মের মত কাছে পেলাম! জগদীশ্বরের কি দয়া! আচ্ছা, আর তোমাকে বেতনের কথা বলা হবে না; কিন্তু তোমার যা যখন দরকার চেয়ে নেবে, কিছু সংকোচ করবে না। আচ্ছা, আমাদের টাকা কড়ি সব তুমি রাখতে আরম্ভ কর না কেন? তোমার হিসাব রাখা বেশ আসে, আমার পক্ষে ওটা বিষম লেঠা! তুমি টাকা কড়ি সব রাখ, ঘরকন্না দেখ, আমি ছেলে মেয়ে দেখি"।

সারদাসুন্দরী। আচ্ছা, সে ভার আমাকে দিয়ে তুমি যদি একটু খোলা পাও তবে আমাকে দিও; বলতে গেলে এটা নিস্তারিণীর কাজ, কিন্তু সে কবে চলে যায়।

অতঃপর ক্ষীরদা আলমারি, দেরাজ, ক্যাশবাকস সমুদয়ের চাবি সারদাসুন্দরীর হাতে দিয়া, তাঁহাকে গৃহের কর্ত্রী করিয়া দিলেন; এবং নিজে খুকী ও খোকাকে লইয়া পশ্চাতে রহিলেন। সারদাসুন্দরী কিন্তু তাঁহাকে জিজ্ঞাসা না করিয়া কোনও কাজ করেন না। দুইজনে গলাগলি ভাব!

উঠিতে, বসিতে, খাইতে, শুইতে, একজন যেন অপরের প্রেমালিঙ্গনের মধ্যেই আছেন! নিজেদের মনের মত করিয়া বাড়ী সাজাইয়া দুইজনে গৃহস্থালী আরম্ভ করিলেন। নিস্তারিণী বিবাহের দিনের পথ চাহিয়া রহিলেন। মহেশ সারদাসুন্দরীকে না জানাইয়া তাঁহার নামে প্রত্যেক মাসে পঁচিশ টাকা করিয়া ব্যাঙ্কে জমা দিতে লাগিলেন; মনের কথাটা এই, যদি তিনি অসময়ে চলিয়া যান, সারদাসুন্দরীর যেন কিছু সঞ্চিত অর্থ থাকে।

দশম পরিচ্ছেদ।

গঙ্গার ধারের বাড়ীতে প্রতিষ্ঠিত হইয়া বসিবার কিছুদিন পরেই মহেশ কলকারখানার কিলবরণ সাহেবের নিকট হইতে এক পত্র পাইলেন, তাহাতে তিনি লিখিয়াছেন যে, তাঁহারা শ্রমজীবীদের জন্য যে সব কুটীর বানাইতেছিলেন, তাহার কাজ শেষ হইয়াছে; মহেশ ইচ্ছা করিলে একবার গিয়া দেখিয়া আসিতে পারেন। মহেশ একদিন দুপর বেলা দেখিতে গেলেন। সে ঘরগুলি কিলবরণ সাহেবের বাড়ীর অদূরে, কলকারখানার সন্নিকটে, এক বাগানের মধ্যে করা হইয়াছে। কুটীরগুলি সুন্দর, সুপরিচ্ছন্ন, যথেষ্ট বায়ুসমাগমের বন্দোবস্ত আছে। সাহেব তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া ঘুরিয়া ফিরিয়া বাড়ীগুলি দেখাইতে লাগিলেন। দেখিয়াই মহেশের মন আনন্দে উৎফুল্ল হইতে লাগিল। তিনি যাহা যাহা বলিয়াছিলেন, ঠিক সেই রকমই করা হইয়াছে। বিবাহিত পরিবারদের জন্য স্বতন্ত্র দিকে কতকগুলি বাড়ী করা হইয়াছে, তাহা বিবাহিত দম্পতীর সপরিবারে থাকিবার উপযুক্ত; অবিবাহিত পুরুষদের জন্য স্বতন্ত্রদিকে নূতন প্রণালীতে নূতন রকমের বাড়ী হইয়াছে; পতিহীন বা বিধবা নারীদের জন্য স্বতন্ত্র দিকে স্বতন্ত্র রকমের বাড়ী হইয়াছে। মহেশ ঘুরিয়া ফিরিয়া দেখিয়া, যে যে স্থানে যে যে বিষয়ে এক আধটু পরিবর্ত্তন প্রয়োজনীয় বোধ করিলেন, তাহা সাহেবকে জানাইলেন। তৎপরে বহরমপুরে ফিরিবার পূর্ব্বে কলের মধ্যে প্রবেশ করিয়া শ্রমজীবীরা যেখানে কাজ করিতেছে সেখানে দেখিতে গেলেন। তাঁহাকে দেখিয়াই শ্রমজীবীরা প্রণাম করিয়া আনন্দ জানাইল। তাহারা কবে নূতন বাড়ীতে যাইবে

তাহা জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন। পরে যখন চলিয়া আসেন, তখন একটী মেয়ে একটু একান্তে আসিয়া তাঁহাকে বাড়ীর মেয়েদিগকে আর একদিন লইয়া আসিতে অনুরোধ করিল; বলিল তাহাদের মধ্যে চারিটী বিধবা মেয়ে মহেশের বাড়ীর মেয়েদের অনুরোধে বিবাহ করিতে রাজি হইয়াছে। মহেশ এই সংবাদে আনন্দিত হইয়া গৃহে ফিরিয়া আসিলেন; এবং মেয়েদিগকে সেই সংবাদ দিলেন।

তৎপরে এক সপ্তাহের মধ্যেই শ্রমজীবীরা নূতন বাড়ীতে উঠিয়া গেল; এবং পরবর্ত্তী রবিবার বৈকালে মেয়েদিগকে লইয়া যাইবার জন্ম মহেশকে লিখিয়া পাঠাইল। তদনুসারে পরবর্ত্তী রবিবার তিনি ও তাঁহার ভগ্নী নিস্তারিণী ও সারদাসুন্দরীকে লইয়া তাহাদিগকে দেখিতে গেলেন; ক্ষীরদা যাইতে পারিলেন না, খুকী ও খোকার জন্ম আবদ্ধ হইয়া রহিলেন। কলকারখানার ঘাটে উঠিয়া তাঁহারা যখন শ্রমজীবীদের পাড়ার দিকে অগ্রসর হইয়াছেন, তখন কিলবরণ সাহেব নিজের গৃহ হইতে তাঁহাদিগকে দেখিতে পাইয়া, উঠিয়া তাঁহাদের নিকট আসিলেন; এবং মহেশকে আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। মহেশ তাঁহার সহিত মেয়েদিগকে পরিচিত করিয়া দিয়া, আপনাদের আগমনের কারণ ব্যক্ত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তখন যে কথোপকথন হইল তাহা এই!—

মহেশ। We come for a special purpose.—অর্থাৎ, আমরা একটা বিশেষ অভিপ্রায়ে এসেছি।

কিলবরণ। What is that purpose?—অর্থাৎ সে অভিপ্রায়টা কি?

মহেশ। Our ladies have impressed on many of the women-workers of the mills, the fact, that it is disgraceful for women, who earn their own living by honourable

work, to live in open sin. If they truely love any men, they should marry them according to the widow-remarriage act. And four of the widows have expressed a desire to marry their lovers.—অর্থাৎ, আমাদের মেয়েরা শ্রমজীবী মেয়েদের অনেককে বুঝিয়ে দিয়েছেন যে, যে সকল মেয়ে নিজের শ্রমের দ্বারা জীবিকা অর্জ্জন করে, তাহাদের পক্ষে পাপে লিপ্ত থাকা বড় লজ্জার কথা। তাহারা যদি যথার্থ কোনও পুরুষকে ভালবাসে, তাহা হইলে, বিধবা-বিবাহের আইন অনুসারে, তাহাদিগকে বিবাহ করিতে পারে। ইহাতে চারিজন বিধবা স্বীয় স্বীয় প্রেমাস্পদ পুরুষদিগকে বিবাহ করিতে প্রস্তুত হইয়াছে।

কিলরণ। Is there such an Act?—অর্থাৎ, এরূপ আইন আছে না কি?

মহেশ। Yes, there is.—অর্থাৎ, হাঁ আছে।

কিলবরণ। Why then do they not largely avail of it?—অর্থাৎ, তবে কেন তারা অনেকে সে আইন অনুসারে কাজ করে না?

মহেশ। It was an Act of Reform which one of our great and revered leaders got passed. But as yet social opinion, in Hindu society, is opposed to widow-remarriage, and those who dare marry are put to severe persecution.—অর্থাৎ, এই আইনটা সংস্কারের আইন, আমাদের একজন অগ্রগণ্য ও সর্ব্বসম্মানিত নেতা তাহা পাশ করাইয়া লইয়াছিলেন; কিন্তু এখনও হিন্দুসমাজের মত বিধবাবিবাহের বিরোধী; এবং যাহারা ঐরূপ বিবাহ করিতে সাহসী হয়, তাহাদিগকে ঘোর সামাজিক নির্য্যাতন সহ্য করিতে হয়।

কিলবরণ। Ah, I see! How can these poor people face those persecutions?—অর্থাৎ, ওঃ! আমি বুঝতে পারছি, এই গরীব মানুষেরা কি করে সে নির্য্যাতন সহ্য করবে?

মহেশ। That's what brings us here to day. We come to tell them, we shall back them.—অর্থাৎ, সেই জন্যই ত আমরা আজ এখানে এসেছি; আমরা বলতে এসেছি যে লোকে যদি নির্য্যাতন করে আমরা ওদের পিছনে দাঁড়াব।

কিলবরণ। You may tell them that we will keep our eyes on them and will see that no body causes them any trouble here.—অর্থাৎ, তুমি এদের বলতে পার, যে ওদের উপর আমরা চোখ রাখব, এবং কেউ এখানে তাদের কষ্ট না দেয়, তা আমরা দেখব।

মহেশ। Very kind of you, Sir, thus to come to their rescue! Will you accompany us to their quarter? Your very presence and the announcement of your intention to protect them, will mightily strengthen their cause.—অর্থাৎ, আপনি যে ওদের উদ্ধারের জন্য অগ্রসর হচ্ছেন; এটা বড় দয়ার কথা! আপনি কেন আমাদের সঙ্গে ওদের পাড়ায় চলুন না? আপনাকে দেখে ও আপনি যে তাদের রক্ষা করতে চান তা জেনে তাদের মন সবল হবে।

কিলবরণ। All right, let me accompany you—অর্থাৎ আচ্ছা, বেশ, আমি তোমাদের সঙ্গেই যাচ্ছি।

তৎপরে সকলে শ্রমজীবীদের পাড়াতে গেলেন। মহেশ, সেই দশ জনের দ্বারা শ্রমজীবীদিগকে ডাকাইয়া তাহাদের নিকট নিজেদের

আগমনের উদ্দেশ্য ব্যক্ত করিলেন; এবং বিধবাবিবাহ যে নির্দ্দোষ, পাপে লিপ্ত থাকা অপেক্ষা যে বহুগুণে শ্রেষ্ঠ, তাহা বুঝাইবার চেষ্টা করিলেন। কিলবরণ সাহেব বাঙ্গালা বুঝিতেন; তিনি মহেশের কথায় উত্তেজিত হইয়া কতক হিন্দী কতক বাঙ্গালাতে শ্রমজীবীদিগকে বলিতে লাগিলেন, "পাপে লিপ্ত থাকা অপেক্ষা বিবাহ করা খুব ভাল; যারা বিবাহ করতে যাচ্চে, তারা কিছুই অন্যায় করছে না; তাদের প্রতি কেউ যদি অন্যায় করে, আমরা মাপ করবো না; তোমাদের ইচ্ছে না হয় তাদের সঙ্গে খেও না; কিন্তু তাদের অনিষ্ট করতে পারবে না।" সভার মধ্যে একেবারে নিস্তব্ধ ভাব আসিল; সকলে চোকো চোকি, গা টেপাটিপি আরম্ভ করিল। ইহার পর সকলে চলিয়া গেলেন। মহেশ সেই দশ ব্যক্তিকে তাঁহার ভবনে পরবর্ত্তী রবিবার বৈকালে যাইতে বলিয়া গেলেন; বিবাহের দিন ঠিক করিয়া তাহাদিগকে বলিয়া দিবেন।

পর রবিবার বৈকালে সে দশজন লোক আসিল না; তাহাদের পরিবর্ত্তে বিবাহার্থী ব্যক্তিদের দুইজন আসিয়া উপস্থিত। তাহারা আসিয়া বলিল যে, পূর্ব্বোক্ত দশ ব্যক্তি ভয়ে আসিতে সাহসী হইল না; তাহাদের দুইজনকে পাঠাইয়াছে। মহেশ দুইজনকে আদর পূর্ব্বক লইলেন; এবং যথেষ্ট মিষ্টান্ন খাওয়াইলেন। তারপর তাহাদের সঙ্গেই কথাবার্ত্তা আরম্ভ হইল। তাহাদের মুখে শুনিলেন যে, তাঁহারা চলিয়া আসার পর শ্রমজীবীদের মধ্যে এই বিধবাবিবাহের প্রতি বড় বিরুদ্ধভাব উঠিয়াছে। কেহ মুখে কিছু বলিতেছে না; কাহারও মুখে কথা নাই; সাড়া শব্দ নাই; ভাল মন্দ বিচার নাই; সকলেই নিস্তব্ধ; বিবাহার্থীদের সঙ্গে কেহ কথা কহে না; তাহাদের সাহায্য করিতে কেহ অগ্রসর হয় না; সকলেই তাহাদিগকে পরিহার করে। সাহেবের কাছে নালিশ করিবার মত কিছু নাই; কিন্তু এই নির্ব্বাক নির্য্যাতন অসহ্যপ্রায় বোধ হইতেছে। পূর্ব্বোক্ত

দশ ব্যক্তি শ্রমজীবীদের এই নির্ব্বাক নির্য্যাতন দেখিয়া ভয় পাইয়াছে; তাহাদের আর এ সকল বিষয়ে উৎসাহ নাই; বিবাহার্থী চারিজনের মধ্যে দুইজন পিছাইয়া গিয়াছে; তাহারা দুইজন মাত্র দৃঢ়প্রতিজ্ঞ আছে; তাহারা প্রতিজ্ঞা করিয়াছে, যে যা বলে বলুক, যে যা করে করুক, তাহারা বিবাহ করিবেই করিবে।

মহেশ সেই দুই ব্যক্তিকে লইয়া নির্জ্জনে বসিলেন; এবং তাহাদের কার্য্যের গুরুত্ব তাহাদিগকে ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। বলিলেন, "তোমরা ত দেখচ, লোকে তোমাদের কাজটা কি ভাবে নিচ্চে? তোমরা তাতে ভয় পেও না; যে মেয়েকে ভাল-বাস, তাকে উপপত্নী করে লোকচক্ষে হীন করে রাখা অপেক্ষা, সর্ব্বসমক্ষে স্ত্রী বলে নিয়ে মান সম্ভ্রমে রাখা কি ভাল নয়?"

দুজনে। অবশ্যি ভাল।

মহেশ। তোমরা তাই করতে যাচ্চ। দেশে বিধবাবিবাহ প্রথা চলিত নাই বলে, লোকে ভাল চোখে দেখচে না, কিন্তু আমরা তোমাদের পিছনে আছি; কিলবরণ সাহেবও পিছনে আছেন; তোমরা ভয় পেও না।

দুজনে। আমরা ভয় পাচ্চি না; ভয় যদি পাব আপনার কাছে আসব কেন?

মহেশ শুনিয়া বড়ই প্রীত হইলেন; পাঁজি দেখিয়া বিবাহের দিন স্থির করিলেন; বলিলেন সেই দিনে তিনি পুরোহিত ব্রাহ্মণ সঙ্গে করিয়া সপরিবারে বিবাহ ক্ষেত্রে যাইবেন; শ্রমজীবীদের পুরাতন আড্ডার একটা বাটীতে বিবাহ হইবে; কিন্তু শ্রমজীবীদের কেহ যদি নিমন্ত্রণ না নেয়, বা না যায়, তাঁহারা সপরিবারে খাইয়া আমোদ করিয়া আসিবেন; খাওয়া দাওয়ার ব্যয় সমুদয় নিজেরা দিবেন। এই বলিয়া তাহাদের হাতে

কিলবরণ সাহেবকে এক চিঠি দিলেন ; তাহাতে সমুদয় বিবরণ লিখিয়া, বিবাহের স্থান ও দিন নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন। পত্রবাহক দুই জনকে বলিয়া দিলেন, যে স্থান ঠিক করিয়া তাঁহাদিগকে জানাইবে ; বিবাহটা পূজার ছুটির মধ্যেই হইবে।

কিলবরণ সাহেব মহেশের চিঠি পাইয়া বিবাহার্থী দুইজনের প্রতি বিশেষ অনুগ্রহ প্রদর্শন করিলেন ; বলিলেন, "তোমাদের বন্ধুরা তোমাদের সঙ্গে কথা না কয় তাতে কিছু মনে করো না ; কত দিন কথা না কয়ে থাকবে ? শেষে কথা কবে। তোমরা যা কর্ত্তব্য বোধ করেছ, যেমন করে হয় সেই পথে দাঁড়াও ; আমরা পিছনে আছি।" এই বলিয়া তাহাদের জন্য দুইটি সুন্দর বাড়ী নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন ; বলিলেন সেই বাড়ীতে তারা থাকিবে, তার ভাড়া তাহাদের দিতে হইবে না ; আর তাহারা অগ্রে যে কাজ করিত তাহা অপেক্ষা অধিক বেতনের কাজে বসাইয়া দিলেন ; তাহাদের আয় প্রায় দুইগুণ হইয়া গেল।

ওদিকে শ্রমজীবীদ্বয়ের বিবাহের আয়োজন হইতে লাগিল ; এদিকে মহেশের নবজাত কুমারের নামকরণের দিন আসিয়া উপস্থিত। পূজার ছুটীর মধ্যেই সে কাজ করা স্থির হইল। মহেশ গিরিশকে নামকরণ কার্য্যে উপস্থিত থাকিবার জন্য নিমন্ত্রণ করিলেন। অপরদিকে তাঁহার কলিকাতাস্থ যে ব্রাহ্মবন্ধুর ভবনে কৃপা আশ্রয় পাইয়াছে, তাঁহাকেও সপরিবারে আসিবার জন্য অনুরোধ করিয়া পাঠাইলেন। "পূজার ছুটীর সময় একটা নূতন স্থান দেখা হয়, মন্দ কি ?" এই ভাবিয়া তাঁহার বন্ধু গুপ্ত মহাশয় আনন্দের সহিত আসিতে প্রস্তুত হইলেন। ছুটির দুই দিন পরেই তাঁহারা আসিয়া উপস্থিত ; দলটি বড় ছোট নয় ; তাঁহার বন্ধু বিধুশেখর গুপ্ত, তাঁহার পত্নী মনোরমা, অষ্টাদশ বা ঊনবিংশ বর্ষীয়া কন্যা নিরুপমা, ষোড়শ বর্ষীয়া দ্বিতীয়া কন্যা সুরমা, চতুর্দ্দশ বর্ষীয়া অতএব কৃপার সমবয়স্কা তৃতীয়া কন্যা

রমা, দশবৎসর বয়স্ক প্রথম পুত্র ধীরেন, ও সপ্তম-বর্ষ-বয়স্ক সর্ব্বকনিষ্ঠ পুত্র বীরেন, একটী বেহারা ও একজন পরিচারিকা,—এই তাঁহাদের দল, তৎপরে কৃপা আছে। এই দলটী যখন সিরাজগঞ্জ হইতে নৌকা করিয়া আসিয়া উপস্থিত হইলেন তখন মহেশ আফিসে। ক্ষীরদা, নিস্তারিণী ও সারদাসুন্দরী তাঁহাদের নৌকা দেখিবামাত্র গঙ্গার ঘাটে গেলেন; এবং তাঁহাদিগকে সমাদরে অভ্যর্থনা করিয়া লইলেন। নূতন স্থানে, নূতন মানুষের মধ্যে, গঙ্গার ধারে আসিয়া, গুপ্ত মহাশয়ের পুত্র কন্যাদিগের মুখ প্রফুল্ল হইয়া উঠিল। যে দিকে যায়, যে দিকে চায়, কিছু না কিছু নূতন দেখিতে পায়; অমনি করতালি দিয়া উঠে, "বাঃ বাঃ কি মজা কি মজা!" কৃপা অর্দ্ধদণ্ডের মধ্যে কিছু দেখাইতে বাকি রাখিল না; গাছ, পালা, বাগান, বাগিচা, গোয়ালঘর, প্রবোধ বাবুর ঘর, জহর, মণি, ধুনী, খুকীর খেলাঘর, সমুদয় দেখাইয়া আনিল; বাগানের দোলাতে দোল খাওয়াও হইয়া গেল। সারদাসুন্দরীর সহিত তাঁহাদের অগ্রেই আলাপ পরিচয় ও আত্মীয়তা ছিল; সুতরাং তাঁহাদিগকে পাইয়া তাঁহার বড়ই আনন্দ হইল। এই আনন্দ কোলাহলের ভিতর হইতে তিনি সরিয়া পড়িয়াছেন; এবং নবাগত অতিথিদের জন্য যে সকল মিষ্টান্ন প্রস্তুত রাখিয়াছিলেন, তাহা গুছাইতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। যথাসময়ে সকলকে ডাকিয়া খাবার দেওয়া হইল। নানাপ্রকার খাদ্যদ্রব্য দেখিয়া গুপ্ত মহাশয়ের পুত্রকন্যাগণ চমৎকৃত হইয়া আনন্দ ধ্বনি করিতে লাগিল; এবং মহোৎসাহে আহারে প্রবৃত্ত হইল। ইতিমধ্যে মহেশ আসিয়া উপস্থিত। বন্ধুতে বন্ধুতে কণ্ঠালিঙ্গন, বন্ধুর পত্নীকে অভিবাদন, পুত্র-কন্যাদিগকে সাদর আলিঙ্গন, কুশলসম্ভাষণ প্রভৃতি সমাধা করিয়া তিনি তাঁহাদের পরিচর্য্যাতে প্রবৃত্ত হইলেন; সারদাসুন্দরীকে সঙ্গে করিয়া কে কোন ঘরে থাকিবে, কার জন্য কি প্রয়োজন সেই সকল দেখিতে গেলেন।

সায়ংকালে সকলে একত্রে আহারে বসিয়া মহেশের কি আনন্দই হইতে লাগিল! ছেলেরা কিছুমাত্র পরের বাড়ী ভাবিতেছে না, চাহিয়া খাইতেছে, হাসি ঠাট্টা গল্পগাছাতে মগ্ন আছে, দেখিয়া তাঁহার প্রাণে কি উল্লাসই হইতে লাগিল! খাইতে খাইতে তাহাদিগকে হাসাইবার জন্য দুই একটি গল্প করিলেন; তাহারা হাসিয়া কে কার গায়ে ঢলিয়া পড়িতে লাগিল; অট্টহাস্যে ঘর কাঁপিয়া যাইতে লাগিল। তৎপরে বসিবার ঘরে আসিয়া অনেকক্ষণ গল্পগাছাতে গেল; বয়স্থেরা গল্পগাছায় রহিলেন; বালকবালিকারা জহর ধুনি প্রভৃতির সঙ্গে খেলা করিতে গেল।

পরদিন প্রাতে মহেশ বোটে করিয়া তাঁহার বন্ধুকে সপরিবারে মুর্শিদাবাদ সহর দেখিতে পাঠাইলেন; প্রবোধচন্দ্রকে ও অপর একজন অভিজ্ঞ ব্যক্তিকে সঙ্গে দিলেন; তাঁহারা মধ্যাহ্নকালে ফিরিয়া আসিয়া মুর্শিদাবাদের বিষয়ে কত কথাই বলিলেন। সর্ব্বাপেক্ষা উৎসাহিত নিরুপমা ও তাহার ভগিনী সুরমা;—"ওমা ওমা ইতিহাসে যে মুর্শিদাবাদের কথা এত পড়েছি সেই মুর্শিদাবাদ চোখে দেখলাম!"

মধ্যাহ্নে নিস্তারিণী গাড়ি করিয়া মেয়েদিগকে শিল্পাশ্রমের বাড়ী, পাবলিক লাইব্রেরীর বাড়ী, বাবু দেবীপ্রসাদের বাড়ী প্রভৃতি দেখাইয়া আনিলেন। তাহারা যাহা দেখে তাহাতেই যেন মনে আনন্দ ধরে না! এইরূপে দিনের পর দিন আনন্দে কাটিতে লাগিল।

মনোরমা নিজের পুত্রকন্যাদিগকে লইয়া আসিয়া এ বাড়ীতে প্রতিষ্ঠিত হইলে বাড়ীর হাওয়া যেন ফিরিয়া গেল। মনোরমার প্রেমোজ্জ্বল ও ধর্ম্মভাব পূর্ণ মুখ দেখিয়া ক্ষীরদা ও নিস্তারিণী একেবারে মুগ্ধ! ক্ষীরদা গোপনে মহেশকে বলিতে লাগিলেন,—"তুমি যে বিধুশেখর বাবুর স্ত্রীর কেন এত প্রশংসা কর, তা এখন বুঝতে পারছি; তাঁর সঙ্গে

কথা কইলে মন পবিত্র হয়! কৃপার কি সৌভাগ্য, যে এমন মেয়ের কোলে আশ্রয় পেয়েছে!" প্রবোধের ত কথাই নাই! সে যেন মনোরমার গোলাম হইয়া দাঁড়াইল! তাঁর ফাই ফরমাস খাটা একটা আনন্দের ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইল! সুখেই সকলের দিন কাটিতে লাগিল।

ক্রমে খোকার নামকরণের দিন উপস্থিত। তৎপূর্ব্ব দিন অপরাহ্নে গিরিশ কলিকাতা হইতে আসিলেন। মহেশ গিরিশকে আলিঙ্গনপাশে আবদ্ধ করিলেন; এবং মাতুলালয়ের, গিরিশের শ্বশুর বাড়ীর ও গ্রামের সমুদয় সংবাদ লইলেন। ক্ষীরদা আসিয়া শিশুটি গিরিশের কোলে দিয়া বলিলেন, "ঠাকুরপো', কেমন ছেলে হয়েছে বল। তুমি এসেছ আমার বড় আনন্দ হয়েছে।"

গিরিশ। বাঃ, বেশ ছেলে হয়েছে! সুন্দর হবে না! কার পেটে জন্মেছে!

তারপর ক্ষীরদা গিরিশকে নিজের ঘরে লইয়া গেলেন; সেখানে বসাইয়া, নানাপ্রকার মিষ্টান্ন খাওয়াইলেন; এবং বহরমপুর আসার পর দিন দিন যে প্রকার উন্নতি হইতেছে তাহা আনুপূর্ব্বিক বর্ণন করিলেন। ইহার মধ্যে নিস্তারিণীর কথা উপস্থিত হইল; এবং ক্ষীরদা অসাবধানতা-বশতঃ ডাক্তার ভদ্রের বিবরণ দিয়া তাঁহার সহিত নিস্তারিণীর বিবাহের প্রস্তাবের কথাও জানাইলেন; বলিলেন,—"জানত এঁরা চিরদিনই বিধবা-বিবাহের পক্ষপাতী, এতদিন সেটা মনে ছিল, এতদিনের পর কাজে হবার যোগাড় হয়েছে।" শুনিয়া গিরিশের মন শিহরিয়া উঠিল। জ্যেষ্ঠের কাজকর্ম্ম তাঁর চিরদিনই ভাল লাগে না; তারপর নিজে ধনীর কন্যা বিবাহ করিয়া হাইকোর্টে উকীল হইয়া বসার পর সেই বিরাগের ভাব আরও বাড়িয়াছে! কিন্তু তিনি যে এত বয়সে নিস্তারিণীর বিবাহ দিতে অগ্রসর হইবেন, এটা তাঁর সম্ভব মনে হয় নাই।

নিস্তারিণীর বিবাহ দিলে তাঁহাদের বংশের কলঙ্ক, বিদ্যালঙ্কার মহাশয়ের মুখে কালি,—এই সকল ভাবিয়া রাগে তাঁর মন আন্দোলিত হইতে লাগিল। ইচ্ছা হইতে লাগিল, নিস্তারিণীর কেশাকর্ষণ করিয়া দেশে লইয়া যান; কিন্তু তিনি মনের আবেগ সম্বরণ করিয়া মৌনী রহিলেন।

গুপ্ত মহাশয় ডাক্তার ভদ্রের সঙ্গে মেয়েদিগকে লইয়া একটা নূতন স্থান দেখিতে গিয়াছিলেন, ফিরিয়া আসিতে রাত্রি হইয়া গেল। তাঁহারা আসিয়া দেখেন যে বসিবার ঘরে মহেশ ও গিরিশ বসিয়া কথা কহিতেছেন। নিস্তারিণী আসিয়াই গিরিশের পাশে বসিলেন; এবং আনন্দে প্রফুল্ল হইয়া নানা প্রশ্ন করিতে লাগিলেন। শেষে গুপ্ত মহাশয়ের পত্নী ও কন্যাদিগকে একে একে দেখাইয়া দিয়া চুপে চুপে তাহাদের বিবরণ দিতে প্রবৃত্ত হইলেন; সারদাসুন্দরীকে দেখাইয়া দিয়া বলিলেন, "শুনেছ বোধ হয় যে মহেশ নিজের বাড়ীতে একটি মেয়ে কর্ত্রী করে রেখেছেন, ঐ সেই মেয়েটী; ও যে কি মেয়ে তোমাকে কি করে বলবো!" নিরুপমা আঠার উনিশ বছরের মেয়ে তার বিবাহ হয় নাই; সুরমা ষোল বছরের মেয়ে, তার বিবাহের দিকে মনই নাই; মেয়েগুলি শিশুর ন্যায় সরল, কি দেখিয়াছে, কি শুনিয়াছে, মহেশের নিকট তাহা বর্ণন করিবার সময় তাহাদের অট্টহাস্য, করতালির ধ্বনি, এই সব দেখিয়া গিরিশ একেবারে অবাক্। তাহাদের সরলভাব ভাল লাগিল বটে; কিন্তু এদৃশ্য কেমন কেমন বোধ হইতে লাগিল।

রাত্রে আহারের সময় আর এক ব্যাপার গিরিশের চক্ষের কাছে আসিল। ক্ষীরদা ও নিস্তারিণী তাঁহার ভাব অগ্রেই জানিতেন। তাঁহারা পাশের ঘরে, তাঁহার আহারের স্থান স্বতন্ত্র করিয়া দিয়া, নিজেরা তাঁহার পরিচর্য্যায় রত রহিলেন। এদিকে সারদাসুন্দরী নিস্তারিণীর সাহায্যে নবাগত অতিথিদের পরিচর্য্যা করিতে লাগিলেন। গিরিশ

পাশের ঘর হইতে দেখিতেছেন পুরুষ মেয়ে সব একসঙ্গে আহারে বসিয়াছেন; মহেশ, বিধুশেখর বাবু ও ডাক্তার ভদ্র তাঁহাদের মধ্যেই আসীন; গল্প গাছা, হাসি ঠাট্টা, কৌতুকে মেয়েদিগকে হাসাইতেছেন; কোথা দিয়া সময় যাইতেছে, কেহ যেন টের পাইতেছেন না। গিরিশের আহারটা শীঘ্র হইয়া যাওয়াতে তিনি আঁচাইয়া আর একদিকের পাশের ঘরে এক চেয়ারে বসিয়া এই সমুদয় দেখিতে ও শুনিতে লাগিলেন। মেয়েমানুষ পুরুষের সঙ্গে বসিয়া খায় এদৃশ্য তাঁর ভাল লাগিল না। তৎপরে মহেশ ব্রাহ্মণ হইয়া বৈদ্যজাতীয় নরনারীর সঙ্গে একত্র আহার করিতে বসিয়াছেন, সেটা ভাল লাগিল না; মনে মনে এই বলিতে লাগিলেন, "চিরদিনই ত জানা আছে বড়দার সব কাজে বাড়াবাড়ি। এতদিন পরেও যে সেটা গেল না এই বড় আশ্চর্য্য!" তৎপরে সকলে স্বীয় স্বীয় ঘরে গিয়া রাত্রি যাপন করিলেন।

নিস্তারিণী যখন গিরিশকে তাঁহার শয্যায় শোয়াইতে লইয়া গেলেন, তখন একবার গিরিশের ইচ্ছা হইল যে তাঁহাকে দুই কথা শুনাইয়া দেন এবং ডাক্তার ভদ্র হইতে তাঁহাকে বিযুক্ত করিয়া পরদিন সঙ্গে করিয়া কলিকাতায় লইয়া যান, কিন্তু বিশেষ ভাবিয়া সে আবেগ সম্বরণ করিলেন; এবং মৌনাবলম্বন করিয়া থাকাই শ্রেয়ঃ বোধ করিলেন; নিস্তারিণী চলিয়া গেলে 'ছিঃ, ছিঃ' রব করিয়া বালিশে মুষ্ট্যাঘাত করিতে লাগিলেন; বলিতে লাগিলেন, "ব্রাহ্ম বেটাদের সবই বাড়াবাড়ি! বড়দা কি ব্রাহ্মসমাজে যোগ দিলেন না কি?" এইরূপে নিদ্রা যাইতে অনেক বিলম্ব হইল।

অনেক রাত্রে নিজে শুইতে যাইবার পূর্ব্বে, গিরিশের শয্যাদি কিরূপ হইয়াছে দেখিবার জন্য, মহেশ একবার সেই ঘরের দ্বারে আসিলেন; দেখিলেন গিরিশ এপাশ ওপাশ করিতেছেন। বলিলেন, "কি গিরিশ, ঘুমোচ্চ না-যে?"

গিরিশ। "নূতন জায়গায় এসেছি বলে বোধ হয় ঘুম হচ্চে না; ঘুমুই এই, তুমি গিয়ে শোও; বৌদিদী ও নিস্তারিণী দিদী আমার জন্ত করতে কিছু বাকি রাখেন নি।

মহেশ চলিয়া গেলেন; কিয়ৎক্ষণ পরে গিরিশ ঘুমাইয়া পড়িলেন।

তৎপরদিন প্রাতে দ্বারের কাছে দ্বারবানের ঘরের ছাতের উপর সানাই বাজিতে আরম্ভ হইল। মহেশের সানাই টানাইএর বন্দোবস্ত করিবার ইচ্ছা ছিল না; বলিয়াছিলেন, কতিপয় বন্ধু ও বাড়ীর লোকে মায়ের চরণে নির্জনে বসে, ভগবানের নাম করে একটা নাম দেওয়া যাবে; নামকরণে আবার বাদ্য বাজনার আড়ম্বর কেন?" তাহাতে ক্ষীরদা নিস্তারিণী ও সারদাসুন্দরী বলেন, "কলকেতা হতে মানুষ জন এসেছে, কদ্দিন বৈ থাকবে না, যতটা আনন্দ দেওয়া যায় মন্দ কি?" একথাটা মহেশের মনে লাগাতে বাদ্য-বাজনার আয়োজন করা হইয়াছে। কেবল যে ভোর হইতে দরজায় সানাই বাজিবে তা নয়, বৈকালে বহরমপুর সহরের প্রসিদ্ধ একজন ঢুলী আসিয়া সানাই করতাল মন্দিরা প্রভৃতি সহকারে আপনাদের কৃতিত্ব দেখাইবে তাহাও স্থির করা হইয়াছে; তৎ-পরে সন্ধ্যার পর, নিস্তারিণী, ডাক্তার ভদ্র ও ক্ষীরদা, নিস্তারিণীর সেতার শিক্ষকের সাহায্যে হারমোনিয়ম, বেহালা, এসরাজ, সেতার লইয়া ঐকতান বাদন করিবেন এইরূপ স্থির হইয়া আছে।

প্রাতে উঠিয়া উপরকার বারাণ্ডায় বসিয়া মহেশ নামটা কি হইবে সেই আলোচনাতে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহার ইচ্ছা ছিল, একটা পৌরাণিক প্রসিদ্ধ নাম দিবেন, কিন্তু তাঁহার বন্ধুর পুত্র কন্যারা বলিতে লাগিল, "হয় সুরেন, না হয় নরেন, রাখুন। ধীরেন, বীরেন, এরূপর সুরেন কি নরেন হলে সে আমাদের ভাই হবে। মহেশ হাসিয়া বলিলেন, "যে নামই রাখি না কেন, সে তোমাদের ভাই।" যাহা-হউক, অনেক কথা-

বার্ত্তার পর ক্ষীরদা ও নিস্তারিণী সুরেন্দ্রনাথ নাম পছন্দ করিলেন। তদনুসারে সেই নামই স্থির হইল। বেলা আটটার সময় নামকরণ ক্রিয়া আরম্ভ হইবে। ৭॥ টা বাজিতে না বাজিতে ন্যায়রত্ন মহাশয় আসিয়া উপস্থিত। অগ্রেই বলিয়াছি তাঁহার উপরে মহেশের প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ভক্তি, তিনিই বাড়ীর কাজকর্ম্মে পৌরহিত্য করিয়া থাকেন; একাজটা মহেশ এক নূতন প্রণালীতে করিতে যাইতেছেন, তাহাতে তাঁহাকে সম্মত করিয়াছেন। তিনি আসিয়া দেখেন মালা দিয়া মহেশের মায়ের পূজার ঘর সাজান হইয়াছে; তাঁর মায়ের ছবিও ফুলের মালাতে ঘেরা; ধুপ ধূনার গন্ধে একেবারে বাড়ী আমোদিত। বাড়ীতে পদার্পণ করিলেই কেমন একপ্রকার পবিত্র ভাবের উদয় হয়।

যে প্রণালীতে স্তুতি বন্দনা প্রভৃতি হইবে তাহাও মহেশ ন্যায়রত্ন মহাশয়ের সহিত কথা কহিয়া স্থির করিয়াছেন। ৮টার সময় সকলে জগদ্ধাত্রী দেবীর পূজার ঘরে স্বীয় স্বীয় স্থানে আসন পরিগ্রহ করিলে, দেখা গেল যে, ক্ষীরদা খোকাকে ক্রোড়ে করিয়া আসিতেছেন; তার দেহ নানা অলঙ্কারে ভূষিত। কণ্ঠে সোণার পদক-বিশিষ্ট মণিময় হার, হস্তে সোণার বালা, কোমরে সোণার গোট ও কোমর পাটা, পায়ে মল ও একপ্রকার নূতন আভরণ। দেবীপ্রসাদের জননী সে সকল অলঙ্কার দিয়াছেন। লোকে বলে তিনি মহেশের বড় গোঁড়া। মহেশের সঙ্গে কথা কহিয়া তিনি কি শুনিয়াছেন, কি দেখিয়াছেন, জানিনা, একেবারে তাঁর গোঁড়া হইয়া গিয়াছেন। তাঁর মাসিক বেতন পাঁচ শত টাকা করাতে, এবং এবাড়ীখানা তাঁহাকে দানপত্র করিয়া দেওয়াতে তাঁর প্রধান হাত ছিল; কিন্তু তাহাতেও মন নিবৃত্ত হয় নাই; আবার খোকার নামকরণের দিনে এই সকল উপহার আসিল!

সকলে আসন পরিগ্রহ করিলে যে প্রণালীতে কার্য্য হইল তাহা এই:—

—ন্যায়রত্ন মহাশয় প্রথমে সেই অনুষ্ঠানে ভগবানের আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা-পূর্ব্বক একটি সংস্কৃত বচন পাঠ করিলেন ও ব্যাখ্যা করিলেন; তৎপরে মহানির্ব্বাণতন্ত্রের স্তুতিটি পাঠ করিয়া তাহার ব্যাখ্যা করিলেন; তৎপরে উপনিষদ ও প্রাচীন পুরাণাদি হইতে আশীর্ব্বাদসূচক বচন সকল পাঠ করিতে লাগিলেন এবং এক একটির শেষে ক্ষীরদার ক্রোড়স্থ শিশুটির মস্তকে হাত দিতে লাগিলেন। সে বচনগুলি এমন সুন্দর যে তাহার অর্থ শুনিয়া সমাগত ব্যক্তিদের শরীর কণ্টকিত হইতে লাগিল। তৎপরে বিষ্ণুপুরাণ হইতে আর একটি স্তুতি পাঠ করিয়া তাঁহার কার্য্য শেষ করিলেন। তদনন্তর বিধুশেখর গুপ্ত মহাশয় ও সারদাসুন্দরী ঈশ্বর-চরণে শিশুর দীর্ঘজীবনের জন্য ও মনুষ্যোচিত চরিত্রের জন্য এবং গৃহপরিবারের কল্যাণের জন্য প্রার্থনা করিলেন। সর্ব্বশেষে মেয়েরা সকলে সমস্বরে একটি সঙ্গীত করিয়া অনুষ্ঠানের উপসংহার করিলেন।

গিরিশ পার্শ্বের ঘরের এক কোণে বসিয়াছিলেন, তাঁহার এসব ভাল লাগিল না; তিনি দেখিলেন ঠাকুর দেবতা আনা হইল না; দেশীয় রীতি অনুসারে কাজ করা হইল না! জ্যেষ্ঠের ভাবগতি তাঁহার ভাল লাগিল না।

মহেশ তাঁহার অন্তরঙ্গ বন্ধু কয়েক জন ভদ্রলোককে সপরিবারে এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছিলেন। পুরুষেরা উপাসনা-গৃহের পার্শ্বে বসিয়া যোগ দিতেছিলেন, মেয়েরা ঐ ঘরেই ছিলেন। তাঁহাদের আহারের নিমন্ত্রণ ছিল। আহারের সময় উপস্থিত হইলে পুরুষদিগকে এক ঘরে ও নারীদিগকে তাহার পার্শ্বের ঘরে খাওয়ান হইল। মহেশ তাঁহার কলিকাতার বন্ধুর সঙ্গে এবং ডাক্তার ভদ্রের সঙ্গে একদিকে বসিলেন, অপর বন্ধুরা ভিন্ন এক শ্রেণীতে বসিলেন।

মেয়েদের ঘরে কলিকাতার মেয়েরা একদিকে অপর মেয়েরা আর এক দিকে বসিলেন। ক্ষীরদা, নিস্তারিণী ও সারদাসুন্দরী পরিবেশন করিতে লাগিলেন। আহারাদির পর নিমন্ত্রিত ব্যক্তিরা চলিয়া গেলেন।

বৈকালে ৫॥ টার সময় ঢুলীদল আসিল। তাহারা বাস্তবিক বড় কৃতী। শিল্পাশ্রমের মেয়েরা, তদ্ভিন্ন অপরাপর অনেক মেয়ে বৈকালের আমোদ প্রমোদে উপস্থিত থাকিবার জন্য আসিলেন। উপরের বারাণ্ডাতে তাঁহারা বসিলেন। গঙ্গার ঘাটের নিকটস্থ বাগানে বসিয়া ঢুলীরা বাজাইতে লাগিল। পুরুষেরা নীচের বারাণ্ডা আশ্রয় করিয়া রহিলেন। প্রায় দেড় ঘণ্টা বাজাইবার পর তাহাদের ছুটি হইল। অনেক মেয়ে সন্ধ্যার পরের ঐকতান বাদন শুনিবার জন্য রহিয়া গেলেন। মহেশ শুনিলেন, দেবীপ্রসাদের জননী তাঁহার কন্যাকে সঙ্গে করিয়া ঢুলীদের বাজনা শুনিতে আসিয়াছেন; তিনিও রহিয়া গেলেন।

সন্ধ্যার পর বসিবার পার্শ্বের ঘরে মেয়েদের ঐকতান বাদন আরম্ভ হইল। নিরুপমা ও মনোরমা হার্ম্মোনিয়মে বসিলেন; ডাক্তার চন্দ্র ও নিস্তারিণী বেহালা লইয়া দাঁড়াইলেন; ক্ষীরদা, ও নিস্তারিণীর সেতার শিক্ষকের হাতে সেতার রহিল; অপরাপর মেয়েরা এসরাজ লইয়া বসিলেন। সমাগত বন্ধুরা বসিবার ঘরে আসন পরিগ্রহ করিলেন; মহিলা বন্ধুরা ঐকতান বাদনের পার্শ্বের ঘরে বসিয়া শুনিতে লাগিলেন। সে ঐকতান বাদনে মহা আনন্দধ্বনি উত্থিত হইতে লাগিল। পুরুষদের কেহ বলেন, 'বাহবা বাহবা' কেহ বলেন 'ব্রেভো ব্রেভো', কেহ করতালি দেন, কেহ বাদিকাদিগকে দেখিবার জন্য উঠেন; এইরূপে কার্য্য সমাধা হইল। দেবীপ্রসাদের জননী উপস্থিত থাকিয়া সকল দেখিয়া গেলেন।

পরদিন সহরে কথা উঠিল মহেশ বাবুর ছেলের ভাতে ঠাকুর দেবতা আনা হয় নাই; নানা জাতে একত্র খেয়েছে; এবং মেয়েরা নেচেছে, গেয়েছে, বাজিয়েছে। অমনি কাণাকাণি আরম্ভ হইল। যে সকল পুরুষ ও মেয়েরা নিমন্ত্রিত হইয়া আহার করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে 'এক-ঘরে' করিবার প্রস্তাব উপস্থিত হইল। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ মানুষদিগকে বুঝাইয়া বলিলেন, যে, তাঁহারা নিমন্ত্রিত হইয়া আহার করিয়াছেন বটে, কিন্তু তাহা ব্রাহ্মণে পাক করিয়াছে, ব্রাহ্মণে পরিবেশন করিয়াছে এবং তাঁহারা জাতিভ্রষ্ট ব্যক্তিদের সঙ্গে এক পংক্তিতে খান নাই; মেয়েরা গান করিয়াছে, বাজাইয়াছে কিন্তু নাচে নাই। সে কথাতে কাণ দেয় কে? অপর কতিপয় বন্ধু আত্মমর্য্যাদাতে পূর্ণ থাকিয়া কাহাকেও কিছু বলিলেন না। এইমাত্র বলিলেন, "মহেশকে আমরা শ্রদ্ধা ভক্তি করি, যাহা করেছি কর্ত্তব্য বোধেই করেছি, এখন তোমাদের যা ইচ্ছা কর।" ইহা লইয়া আন্দোলন চলিল। দেবীপ্রসাদের জননীকেও ধাক্কা খাইতে হইল। বাড়ীর লোকে তাঁহাকে চাপিয়া ধরিল; তিনি যাহা যাহা দেখিয়াছেন, তাহা বলিলেন, এবং ইহাও জানিতে দিলেন, যে তিনি সন্তুষ্টই হইয়াছেন;—"মহেশ বাবুর পক্ষে কিছুই নূতন নয়। তাঁর এই সব ভাবের কথা আমরা অগ্রেই জানি"। বাবু গোপাল লাল বলিলেন—"তা বৈ কি"; অমনি সব থামিয়া গেল।

এই সকল দেখিয়া শুনিয়া গিরিশের মন একেবারে বিষণ্ণ হইয়া গেল। তিনি প্রথমে মনে করিয়া আসিয়াছিলেন যে পূজার ছুটির সময় কয়েক দিন জ্যেষ্ঠের ভবনে থাকিবেন; কিন্তু তাঁহার সে উৎসাহ অন্তর্হিত হইয়া গেল; তিনি একটা কাজের দোহাই দিয়া জ্যেষ্ঠের নিকট বিদায় লইয়া পরদিনই কলিকাতা প্রস্থান করিলেন।

গিরিশ চলিয়া গেলে কয়েকদিন পরে পূজার ছুটীর মধ্যেই কল কার-

খানার সেই দুই বিধবার বিবাহের আয়োজন হইল। মহেশ কলিকাতাতে ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়কে লিখিয়া একজন ব্রাহ্মণ আনাইলেন; তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া বিবাহের দিন সায়াহ্নে তাঁহারা সবান্ধবে বিবাহ স্থলে গেলেন। পূর্ব্বের প্রস্তাব অনুসারে শ্রমজীবীদের পুরাতন বাস-ভবনের এক গৃহে একটির পরে আর একটি এই নিয়মে দুই বিবাহ হইয়া গেল। মহেশ পূর্ব্বোক্ত দুই ব্যক্তির হস্তে অগ্রেই কিছু টাকা দিয়াছিলেন; তাহা হইতে তাহারা ব্রাহ্মণের প্রাপ্য দিল; এবং খাবার আয়োজন করিয়া সকলে আমোদ করিয়া খাইল। বিবাহান্তে মহেশেরা বহরমপুরে ফিরিয়া আসিলেন। পরদিন হইতে সহরে মহা আন্দোলন উঠিল। পুত্রের নামকরণ-উপলক্ষে যে আন্দোলন চলিতেছিল তাহা আরও পাকিয়া উঠিল। বহু লোক মহেশের বিরোধী হইয়া দাঁড়াইলেন। মহেশ সেদিকে বড় মনোনিবেশ করিলেন না; নিজের কর্ত্তব্য সাধন করিয়া ধীরস্থির রহিলেন। লোকে দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইতে লাগিল; যাহারা তাঁহার প্রধান বিরোধী, তাহাদের প্রতিও তাঁহার আচরণে কিছু পার্থক্য দেখা গেল না; সেই সদ্ভাব, সেই সদাশয়তা, সেই সৌজন্য! দেখিলেই বোধ হয় গোলমাল, সমালোচনা তাঁহার মনের ত্রিসীমাতেও প্রবেশ করে নাই।

বাবু দেবীপ্রসাদের পরিবারের লোকেরা এসকল সমালোচনার প্রতি কর্ণপাতও করিলেন না। তাঁহারা বলিলেন—"মহেশ বাবু চির দিনই ত ঐ ভাবের মানুষ, নূতন আর কি হলো? আমরা ওসব জানি না; তিনি আমাদের রক্ষাকর্ত্তা আমরা তাই জানি।" সুতরাং মহেশ নিরুপদ্রবে নিশ্চিন্তমনে পূর্ব্বের ন্যায় কাজ করিতে লাগিলেন।

এদিকে পূজার ছুটীর শেষ হইলে গুপ্ত মহাশয় সপরিবারে কলিকাতা প্রতিনিবৃত্ত হইলেন; কৃপা তাঁহাদের সঙ্গে গেল; যাইবার সময় বীণা-

পাণির কি আদর! সকলের কোলে কোলে আলিঙ্গন চুম্বন পাইতে পাইতে তার যেন বিরক্তি বোধ হইতে লাগিল। কিন্তু মেয়েরা তাহাকে নানাপ্রকার উপহার সামগ্রী দিয়া গেল, সেই একটা আনন্দ। তাহারাও গেল, আর বীণাপাণি সেই সকল উপহারসামগ্রী লইয়া নিজের খেলার ঘর আশ্রয় করিল। দুই একদিন পরেই গিরিশ আসিয়া উপস্থিত। কলিকাতার হইকোর্টে সে ওকালতি করে, হাইকোর্ট তখনও বন্ধ আছে; গিরিশ আসিয়া বলিল, তাহাদের পিতৃস্বসা, নিস্তারিণীর মাতা, হঠাৎ গুরুতর রোগে পীড়িত, জীবনের আশা নাই, সে নিস্তারিণীকে লইতে আসিয়াছে। চিঠি পত্র লিখিয়া সমুদয় কথা জানিবার আর সময় নাই। মহেশ গিরিশের কথাতেই বিশ্বাস করিলেন এবং নিস্তারিণীকে তার সঙ্গে পাঠাইয়া দিলেন। তাঁহারা যেদিন গেলেন সেই দিনই মহেশ দেশে একজন বন্ধুকে পিতৃস্বসার অবস্থা জানিবার জন্য পত্র লিখিলেন; যথাসময়ে উত্তর আসিল যে, তাঁহার কোনও পীড়া হয় নাই; এবং গিরিশ যে নিস্তারিণীকে আনিয়াছেন তাহা তাঁহারা জানেনও না। এই উত্তর পাইয়া মহেশ ভয়ানক দুশ্চিন্তার মধ্যে পড়িয়া গেলেন; সকল কথা জানিবার জন্য গিরিশকে পত্র লিখিলেন; কিন্তু তাহার উত্তর পাইলেন না।

তাঁহার আর বুঝিতে বাকি রহিল না যে নিস্তারিণীর বিবাহের প্রস্তাব কলিকাতার আত্মীয়দের কর্ণগোচর হইয়াছে, সেইজন্য নিস্তারিণীকে সরাইয়া লওয়া হইল। কিন্তু বেচারীকে লইয়া কোথায় রাখিল সেই চিন্তাতে মহেশ আকুল হইলেন; এবং সেই সংবাদ সংগ্রহের জন্য প্রবোধচন্দ্রকে কলিকাতায় পাঠান স্থির করিলেন।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

মহেশের আদেশে কাহাকেও সংবাদ না দিয়া প্রবোধ দুই একদিনের মধ্যেই কলিকাতায় গেলেন; গিয়া সেই রাত্রে গিরিশের পাড়ায় তাঁর এক পরিচিত বন্ধুর বাসায় উঠিলেন। বন্ধুকে গোপনে মনের কথা জানিতে দিলেন; কিন্তু কাহাকেও কিছু বলিতে নিষেধ করিলেন। তাঁহার বন্ধু বলিলেন—"অপেক্ষা কর, আমি বিকালে ঠিক খবর আনব; আমাদের ক্লাসে হরিরামপুরের একটী ছেলে পড়ে; সে নিশ্চয় বলতে পারবে নিস্তারিণী কোথায়। এ কি আশ্চর্য্য কথা, গিরিশ বাবু একজন হাইকোর্টের উকিল, তিনি মায়ের ব্যারাম হয়েছে বলে মেয়েটীকে আনলেন, পরে জানা গেল সব মিথ্যে কথা! নিশ্চয় এর মধ্যে কিছু আছে; কথাটা খুঁজে বার করছি, রোস না! কলেজে গিয়ে রামময়কে জিজ্ঞাসা করবো।

সেই কথাই স্থির রহিল। প্রবোধ প্রাতে উঠিয়া মহেশের বন্ধু গুপ্ত মহাশয়ের পরিবার পরিজনদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য বাহির হইলেন। পথে একজন পরিচিত বন্ধুর সহিত সাক্ষাৎ হইয়া কথায় কথায় বিলম্ব হইয়া গেল। ক্রমে গুপ্ত মহাশয়ের ভবনে গিয়া উপস্থিত। প্রবোধকে দেখিয়াই মেয়েরা তাঁহাকে ঘিরিয়া ফেলিল;—"ওমা প্রবোধ বাবু, ওমা প্রবোধ বাবু! এত সকালে কোথা থেকে?" গুপ্ত মহাশয় ও ও তাঁহার পত্নী মনোরমা আসিয়া নিকটে দাঁড়াইলেন।

গুপ্তমহাশয়। তাই ত, এত সকালে কোথা থেকে এলে?

প্রবোধ। আজ্ঞে, আমি একটু বিশেষ কাজে কাল রাত্রে এসেছি; আমার এক পরিচিত বন্ধুর বাসাতে উঠেছি।

গুপ্তমহাশয়। আমাদের বাড়ীতে উঠলে না কেন?

প্রবোধ। আজ্ঞে, খবর না দিয়ে আসছি, আপনাদের বাড়ীতে আগে কখনও আসি নাই, খুঁজে বেড়াব, তাই সেখানে গিয়ে উঠলাম।

গুপ্তমহাশয়। খবর না দিয়ে এলে কেন?

প্রবোধ। আজ্ঞে তার একটা বিশেষ কারণ আছে, পরে বলবো।

এইরূপ কথাবার্ত্তা চলিতেছে এমন সময়ে গৃহের কর্ত্রী মনোরমা ঠাকুরাণী প্রবোধের স্কন্ধে হাত দিয়া বলিলেন—"প্রবোধ, চল চল, কিছু খাবে এস, আমাদের এখন চা খাবার সময়"।

অতঃপর প্রবোধ মেয়েদের সঙ্গে আহারের ঘরে গিয়া চা খাইতে বসিলেন, এবং গিরিশ কিরূপে তাঁহার পিতৃস্বসার পীড়ার মিথ্যা সংবাদ দিয়া নিস্তারিণীকে বহরমপুর হইতে আনিয়াছেন, এবং মহেশ কিরূপে আত্মীয় বন্ধুদিগের নিকট চিঠিপত্র লিখিয়া নিস্তারিণীর উদ্দেশ না পাইয়া, তাঁহাকে অনুসন্ধানের জন্য পাঠাইয়াছেন, সমুদয় বর্ণনা করিলেন।

মনোরমা। ওমা, এ সংবাদ ত আমরা কিছু জানতাম না! এ কি রকম ব্যবহার!

গুপ্তমহাশয়। বুঝলে না? ডাক্তার ভদ্রের সঙ্গে নিস্তারিণীর বিয়ে হবার কথা উঠেছে কিনা, তাই তাকে সরিয়ে এনেছে।

মনোরমা। তাই ত, এখন উপায় কি?

প্রবোধ। উপায় করবার জন্যেই ত আমি এসেছি।

মনোরমা। আচ্ছা, তা হোক; তুমি গিয়ে তোমার জিনিস পত্র নিয়ে এস; তোমাকে এই প্রাতঃকাল হতেই এখানে থাকতে হবে।

প্রবোধ। (একটু হাসিয়া) আপনাদের বাড়ীতেই ত আমার থাকবার কথা; কিন্তু আমাকে দিনে দুপুরে ঘুরে বেড়াতে হবে, আমাকে

রাখা আপনাদের একটা লেঠা; থাকি না কেন যেখানে আছি, তারা আমার পরিচিত বন্ধু।

মনোরমা। কি বল, তোমাকে রাখা আমাদের একটা লেঠা! ছি ছি, এমন কথা বলো না। প্রবোধ, তুমি আমাদের কি ভালবাস, তাকি আমরা জানি না? আমাদের বহরমপুরে থাকবার সময় আমাদের জন্তে কি করেছ, তা কি আমরা ভুলে গিয়েছি? যাও যাও, এখনি গিয়ে জিনিস পত্র নিয়ে এস।

নিরুপমা। (প্রবোধের মুখের দিকে চাহিয়া) সে কি প্রবোধ বাবু! আমি মনে করেছিলাম এ বাড়ী তোমার আপনার বাড়ী; আমরা তোমার নিজের লোক।

সুরমা, রমা প্রভৃতি ছেলে মেয়েরা মা ও ভগিনীর কথায় সায় দিয়া বলিয়া উঠিল—"না, প্রবোধ বাবু, তা হবে না; আপনার অন্ত জায়গায় থাকা হবে না; এখানে আসতেই হবে; তা না হলে আমরা বড় রাগ করবো"। শুনিয়া প্রবোধ হাসিতে লাগিলেন; বলিলেন— "আচ্ছা তবে যাই, জিনিসপত্র নিয়ে আসি"।

মনোরমা। বোসো, আমাদের একটা চাকরকে তোমার সঙ্গে দিচ্ছি সে তোমার জিনিস পত্র নিয়ে আসবে।

অতঃপর সেই ভৃত্যকে সঙ্গে করিয়া, সেই বন্ধুর বাড়ীতে গিয়া, প্রবোধ নিজের জিনিস পত্র লইয়া আসিলেন এবং গুপ্তমহাশয়ের ভবনে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। মেয়েদের আনন্দ দেখে কে? প্রবোধ চাকরের মাথায় জিনিস পত্র দিয়া আসিতেছেন দেখিয়া তাহারা উপর তালার বারাণ্ডায় দাঁড়াইয়া করতালি দিয়া নাচিতে লাগিল;—"মা, মা, প্রবোধ বাবু আসচেন"। প্রবোধ না পৌছিতে পৌছিতে তাহারা দল বাঁধিয়া নামিয়া আসিল; এবং তাঁহার জন্ত যে ঘর নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল, তাহাতে তাঁহাকে লইয়া

গেল। প্রবোধ ঘরে প্রবেশ করিয়া দেখেন, ঘরটী সুন্দর রূপে সাজান ;—বিছানা, টেবল, চেয়ার, আলনা, জলের কুজা, গ্লাস, কাপড় রাখিবার একটী বাক্স, একখানি আয়না, দেয়ালে সুন্দর সুন্দর ছবি প্রভৃতি সমুদয় প্রস্তুত। দেখিয়া প্রবোধ বিস্মিত হইয়া গেলেন ; বলিলেন—"ওমা, এযে দেখি এক রাজার ছেলের জন্যে আয়োজন করে রেখেছেন! আমি গরীবের ছেলে, আমার জন্যে এত আয়োজন কেন?

নিরুপমা। দেখলে না, প্রবোধ বাবুর কথা শুনলে! "আমি গরীবের ছেলে"! এমন গরীবের ছেলে তু দশ জন হলে দেশের হাওয়া ফিরে যায়।

মনোরমা। যাও, যাও, প্রবোধ, অমন কথা বলো না ; এই ঘরটা তোমার ; আর যদি কিছু দরকার হয় বলবে, আমাদের পর ভাববে না।

প্রবোধ। আমি কি আপনাদের পর ভাবি?

মনোরমা। তা ভাব না জানি ; তবে কেন অমন কথা বল?

ইহার পর প্রবোধ সেই ঘরে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। মনোরমা ঠাকুরাণী গৃহ কর্ম্মে গেলেন ; মেয়েরা প্রবোধকে লইয়া এঘর ওঘর দেখাইতে লাগিল। দেখাইতে আর কিছু বাকি রাখিল না ; দেয়ালের ছবিগুলি, রান্নাঘর, ভাঁড়ার ঘর, তাহাদের পড়িবার ঘর, বাড়ীর তিনটী কুকুরের থাকিবার ঘর পর্য্যন্ত দেখাইল। অবশেষে বাড়ীর নিকটস্থ বাগানে লইয়া গেল। ছবিগুলি ও বাগানটী দেখিয়া প্রবোধ মনে মনে মনোরমা ঠাকুরাণীর সৌন্দর্য্য-বোধশক্তির প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

আহারের পরে প্রবোধ নিস্তারিণীর অনুসন্ধানে বাহির হইয়া, তাঁহার বন্ধু সেই ছেলেটীর কলেজে গেলেন ; এবং সেখানে হরিরামপুরের রামময় চক্রবর্ত্তীর সঙ্গে পরিচিত হইয়া কলেজের ছুটীর পর তাঁহার সঙ্গে গিরিশ-দের পাড়ায় গেলেন। রামময় তাঁহাকে পাড়ার এক দোকানে বসাইয়া

রাখিয়া একলা গিরিশের বাড়ীতে সংবাদ লইতে গেলেন। গিরিশ তখনও আদালত হইতে ফেরেন নাই; রামময় চাকর বাকরের নিকট সংবাদ লইতে চেষ্টা করিলেন; কিন্তু কেহই কোনও সংবাদ দিল না; সকলেই সাবধান। অবশেষে স্থির হইল যে তাঁহারা দুজনে সন্ধ্যার পর আসিয়া গিরিশের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবেন।

ইহার পরে প্রবোধ গুপ্ত মহাশয়ের বাড়ীতে ফিরিয়া গেলেন। সেদিন শুক্রবার, তাঁহার মনে ছিল না যে, সেদিন গুপ্ত পরিবারের বন্ধুমেয়েরা অনেকে গান বাজনা শিখিবার জন্য সে ভবনে মিলিত হন। তিনি গিয়া দেখেন, গানের ঘরে মেয়েদের গান বাজনা আরম্ভ হইয়াছে; কেহ হারমোনিয়মে বসিয়াছেন; কেহ সেতার, কেহ বেহালা, কেহ এসরাজ প্রভৃতি লইয়া বসিয়া গিয়াছেন; একপার্শ্বে এক চেয়ারে একজন ওস্তাদ বসিয়া একটী বাদ্যযন্ত্র হাতে করিয়া তাঁহাদের শিক্ষকতা করিতেছে। গান বাজনা শুনিয়া প্রবোধের মন নৃত্য করিয়া উঠিল। তিনি পাশের ঘরে বসিয়া কিয়ৎক্ষণ গান বাজনা শুনিতেছেন, এমন সময়ে নিরুপমা তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া গানের ঘর হইতে উঠিয়া আসিলেন। প্রবোধ নিরুপমাকে সন্ধ্যার পর গিরিশের বাড়ী যাইবার অভিপ্রায় জানাইলেন।

নিরুপমা। তোমার ফিরতে কত রাত হবে কে জানে? একটু ভাল করে জল খাবার খেয়ে যাও।

এই বলিয়া নিরুপমা রান্নাঘরে গিয়া সমাগত মেয়েদের জন্যে যে সকল খাবার প্রস্তুত হইয়াছিল, তাহা হইতে লুচি তরকারী প্রভৃতি আনিয়া প্রবোধকে খাইতে দিলেন এবং "এটা খাও, ওটা খাও" বলিয়া অনুরোধ করিতে লাগিলেন।

প্রবোধ। সে কি তুমি গান বাজনা ফেলে এলে কেন? তুমি যাও কৃপা আমাকে খাওয়াবে।

নিরুপমা। কেন, তুমি কি আমার এখানে বসা পছন্দ করছ না? থাক না গান বাজনা, আমি পরে যাব।

প্রবোধ। নিরুপমা, তুমি কি বল! তোমার কাছে বসা পছন্দ করি না! তোমার কাছে বসে যে আনন্দ পাই তা আর কিছুতে পাই না।

আহারান্তে প্রবোধ রামময়ের বাসাতে গিয়া তাহাকে সঙ্গে করিয়া গিরিশের নিকট গেলেন। গিরিশ তখন আদালত হইতে আসিয়া জল খাইয়া, নিজের বসিবার ঘরের একপার্শ্বে এক খাটে শুইয়া বিশ্রাম করিতেছেন এবং সেদিনকার খবরের কাগজ পড়িতেছেন। রামময় প্রবোধকে সঙ্গে করিয়া গৃহে প্রবিষ্ট হইলেই গিরিশ রামময়কে দেখিয়া বলিতে লাগিলেন—"কিহে রামময়, তুমি যে এমন সময়ে? আর একি, প্রবোধ কোথা হতে!"

রামময়। প্রবোধ আপনার কাছে এসেছে; একলা আসতে লজ্জা করে বলে আমাকে ধরে এনেছে। ও কেন এসেছে তা জানেন? আপনি নাকি নিস্তারিণী দিদীর মার ব্যারাম হয়েছে বলে, তাঁকে বহরমপুর হতে এনেছেন? তারপর মহেশদাদা চিঠিপত্র লিখে জেনেছেন যে, তাঁর মার ব্যারাম ট্যারাম কিছু নয়! তাই প্রবোধকে নিস্তারিণী দিদীর খবর নেবার জন্যে পাঠিয়েছেন।

গিরিশ। ও বুঝেছি, দাদা নিজে না এসে প্রবোধকে পাঠিয়েছেন।

প্রবোধ। তাঁর কাজের কেমন ভিঁড় তাত জানেন? তাঁর বহরমপুর হতে বা'র হওয়াই কঠিন, তাই আমাকে পাঠিয়েছেন।

গিরিশ। পাঠালে কি হবে? যে জন্যে এসেছ তার কিছু জানতে পারবে না। কি আশ্চর্য্য, তোমাকে পাঠাতে দাদার লজ্জা হলো না? করতে যাচ্ছেন দুষ্কর্ম্ম,—রামগতি বিদ্যেলঙ্কারের ছেলে, বাপের মুখে

কালি দিতে যাচ্ছেন,—আমরা তার পথে বাধা দিলাম, কোথায় চুপ করে থাকবেন, নিজের দুষ্কৃতি স্মরণ করে মুখ গুঁজে নিজের কাজ করবেন, না, আবার তোমাকে খবর নিতে পাঠিয়েছেন! খবর টবর পাবে না; নিস্তারিণী দিদী আর সে ভিটেয় পা দেবে না; তোমাদের মত অসাধু, অভদ্র ও সমাজ-বিরোধী মানুষের সঙ্গে আর মিশবে না। তোমরা আর আমার বাড়ীতে এস না; নিস্তারিণী দিদীর চিন্তা মন থেকে একেবারে ফেলে দেও।

তারপর রামময়ের দিকে ফিরিয়া গিরিশ বলিতে লাগিলেন—"রামময়, তুমিই বা কিরূপ মানুষ যে এমন লোকের সঙ্গে মিশেছ ও এইরূপ কাজে এসেছ!"

রামময়। আমি ত সব কথা জানি না; প্রবোধ বাবুর সঙ্গে আমার আগে আলাপও ছিল না; আমার একজন বন্ধু গত কল্য আলাপ করিয়ে দিয়েছেন; তারপর নিস্তারিণী দিদীর খবর জানবার জন্য উনি আমাকে আপনার কাছে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছেন।

গিরিশ। তোমার সকল খবর জেনে কাজ নেই; তুমি এমন মানুষের সঙ্গ ত্যাগ কর।

তৎপরে প্রবোধের দিকে মুখ ফিরাইয়া গিরিশ বলিলেন—"কেন অকারণ ঘুরে মরছ? যে সংবাদ চাও তা কোথাও পাবে না; দাদাকে গিয়ে বল আমাদের সঙ্গে তাঁর আর কোনও সম্পর্ক নাই।"

অতঃপর রামময় ও প্রবোধ গিরিশের ঘর হইতে উঠিয়া গৃহের বাহির হইলেন। রামময় বলিতে লাগিলেন—"তাইত, ওঁরা ত খুব বিরক্ত হয়েছেন দেখছি; ব্যাপারখানা কি? কেন ওঁরা নিস্তারিণী দিদীকে এমন করে আনলেন?"

প্রবোধ। সে অনেক কথা, আপনার শুনে কি হবে? আপনি

একবার কৈলাস চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের বাড়ীতে কি খবর নিতে পারেন? তারপর আমাকে সঙ্গে করে কি হরিরামপুরে নিয়ে যেতে পারেন?

রামময়। কৈলাস চক্রবর্ত্তীর বাড়ীতে আমি আপনার সঙ্গে যেতে পারব না। তারপর পরশু হতে রাসের ছুটী আসবে, কাল আমি একবার গ্রামে যাব; কিন্তু আপনাকে সঙ্গে নিয়ে গেলে আমি গিরিশ দাদার ও অপর সকলের অপ্রিয় হয়ে পড়বো; সুতরাং আপনাকে গ্রামে যাবার অন্য উপায় অবলম্বন করতে হবে; আমার সঙ্গে যাওয়া হবে না। আমি নিস্তারিণী দিদীর সম্বন্ধে সব কথা বুঝতে পারছি না।

প্রবোধ। তাইত, আমাকে কে নিয়ে যায়, কোথায় গিয়ে উঠি, সেও একটা ভাবনার বিষয়। আচ্ছা দেখি কি হয়।

এই বলিয়া দুইজনে দুইদিকে চলিয়া গেলেন। রামময় নিজের বাসার অভিমুখে চলিলেন; প্রবোধ তাঁর সেই বন্ধুটীর সঙ্গে পরামর্শ করিবার জন্য তাঁর বাসাতে গেলেন। দুই জনে পরামর্শ হইতে লাগিল; সে বন্ধুটী নিস্তারিণীর বিষয়ে সকল কথা জানিয়াও বিরূপ হন নাই, বরং উৎসাহ-দাতা হইয়াছেন! ভাবিতে গিয়া হরিরামপুরের আর একটী যুবকের কথা তাঁর স্মরণ হইল; তাঁহাকে তিনি উৎসাহী, পরোপকারী ও উদার-চেতা লোক বলিয়া জানিতেন। তাঁহার কথা স্মরণ হওয়াতে তিনি বলিলেন—"রোসো, রোসো, আর একটা মানুষের কথা মনে হয়েছে; লোকটার নাম দীননাথ মুখুয্যে; তারও বাড়ী হরিরামপুরে; সে কলেজ হতে বাহির হয়ে সবে আফিসে কাজে বসেছে; মানুষটা খুব উদার, উৎসাহী ও পরোপকারী; হয়ত সব কথা জেনেও সাহায্য করতে বিমুখ হবে না। কিন্তু রাসের ছুটীতে রামময়ের গ্রামে থাকবার কথা; তার মধ্যে তোমাদের সেখানে যাওয়া হবে না; তার পরের শনিবার তোমরা

সেখানে যাবে, রবিবার থেকে, কাজ সেরে, সোমবার প্রাতে চলে আসবে, —এই রকম বন্দোবস্ত করতে হবে"।

সেইরূপ করাই স্থির হইল। প্রবোধের বন্ধু পরদিন প্রাতে গিয়া দীন-নাথ মুখুয্যের সঙ্গে দেখা করিলেন; এবং তাঁহাকে সকল কথা ভাঙ্গিয়া বলিয়া, প্রবোধকে লইয়া পরের শনিবার হরিরামপুরে যাইবার জন্য রাজি করিলেন।

এইরূপে প্রবোধকে প্রায় একসপ্তাহকাল গুপ্তমহাশয়ের ভবনে আবদ্ধ হইয়া থাকিতে হইল; কিন্তু নানা কারণে এই এক সপ্তাহকাল তাঁর জীবনের একটা প্রধান সময় হইয়া দাঁড়াইল। প্রথমতঃ, তৎপরবর্ত্তী রবিবার প্রাতে প্রবোধ গুপ্তমহাশয়ের সহিত কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়ের ভবনে ব্রহ্মোপাসনাতে উপস্থিত হইলেন। সেখানে গিয়া যাহা দেখি-লেন তাহা অগ্রে কল্পনাতেও আনিতে পারেন নাই! গিয়া দেখিলেন সম-বেত মানুষেরা ভাবে উন্মত্ত-প্রায়! একজন গান ধরেন, অপরেরা কাঁদিতে থাকেন; ভাবাবেশে একজন অপরের পায়ে মাথা দিতেছেন; একজন অপরের হাত ধরিয়া—"আমার জন্য ভগবানের কাছে প্রার্থনা করুন, আমার জন্য ভগবানের কাছে প্রার্থনা করুন" বলিয়া অনুরোধ করিতেছেন; কেহ বা উঠিয়া গিয়া কেশব বাবুর পায়ে মাথা দিয়া পড়িতেছেন; একজন হেয়ার স্কুলের মাষ্টার কাঁদিয়া গড়াগড়ি দিতে আরম্ভ করিয়াছেন; অন্যেরা তাঁহার রাস্তা ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইতেছেন; তিনি গড়াইয়া ঘরের এক-পার্শ্ব হইতে অপর পার্শ্বে যাইতেছেন! এই সকল দেখিয়া এবং সেদিন-কার উপদেশ ও প্রার্থনা শুনিয়া প্রবোধের মন চমকাইয়া গেল; প্রাণে নূতন চিন্তা, নূতন ভাব ও নূতন আকাঙ্ক্ষার উদয় হইল। তিনি গভীর আধ্যাত্মিক চিন্তায় মগ্ন হইয়া গুপ্তমহাশয়ের ভবনে প্রতিনিবৃত্ত হইলেন। প্রবোধকে চিন্তান্বিত দেখিয়া নিরুপমা বলিতে লাগিলেন—"প্রবোধ বাবু,

তোমার মুখটা দেখে মনে হচ্ছে তুমি কি ভাবছ; কি দেখে এলে, কি শুনে এলে?"

প্রবোধ। সব তোমাকে ভেঙ্গে বলবো; ভালই দেখে এলাম, ভালই শুনে এলাম।

তারপর প্রবোধ মেয়েদের নিকট হইতে "ধর্ম্মতত্ত্বের" ফাইল চাহিয়া লইয়া গোপনে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ও আচার্য্য কেশবচন্দ্রের উপদেশাদি পড়িতে লাগিলেন। ইহার পরে পরবর্ত্তী মঙ্গলবার সন্ধ্যার সময় গুপ্ত-মহাশয় প্রবোধকে সঙ্গে লইয়া "সঙ্গত-সভাতে" গেলেন। এই সঙ্গত-সভা কেশবচন্দ্রের ভবনে বসিত। সেদিন রিপুদমন বিষয়ে কথা উপস্থিত হইল। আচার্য্য কেশবচন্দ্র বলিলেন—"দেখ রিপু-দমন বললে, এমন কথা ভাবতে হবে না যে, এক একটা অসাধু ইচ্ছা বা অসাধু সংকল্প তোমার মনে উঠছে, আর তুমি নিজ প্রতিজ্ঞার বলে তার ঘাড় ভাঙ্গছ। এরূপে ঘাড় ভাঙ্গতে হবে বটে, কিন্তু এটা বড় পরিশ্রমের কর্ম্ম; সময়ে সময়ে মানুষ হেরে যায়; এটা যেন বৌদ্ধ ভাব। আর একটা পথ আছে, সেই পথটা আমাদের অবলম্বন করতে হবে; সেটা এই,—প্রাণে ভগবানের প্রতি প্রেম এতটা বাড়াতে হবে, ব্যাকুল প্রার্থনাকে এতটা জাগ্রত রাখতে হবে, ঈশ্বরপ্রেমে প্রাণ মন এতটা ঢেলে দিতে হবে যে, প্রাণে নবভক্তি ও নবশক্তি এসে সকল অসাধু ইচ্ছা ও অসাধুভাবকে দূরে রাখবে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ মনে কর, তুমি একটা মধুর কলসী ঘরের কোণে রেখেছ, কিছুক্ষণ পরে গিয়ে দেখ যে তাতে শত শত পীঁপড়া লেগেছে; তখন যদি তুমি এক একটা করে পীঁপড়া মারতে বস, সে একটা উপায় বটে; কিন্তু তা না করে কলসীটা যদি উনানের উপর বসাও, গরম করে তোলো,—পীঁপড়াগুলা আপনাআপনি সরে যাবে, কোথা দিয়ে যাবে তুমি টের জানতেও পারবে না; তেমনি ঈশ্বর-প্রেমে হৃদয় মন পূর্ণ

করে তোলো, নীচ রিপুকুল কোথা দিয়ে সরে পড়বে জানতেও পারবে না"।

এই উক্তিও দৃষ্টান্তটী প্রবোধের মনে এক নূতন ভাব আনিল। প্রবোধ মনে মনে বলিতে লাগিলেন—"তাই ত, ঠিক কথা! ঈশ্বর-প্রেমে হৃদয় পূর্ণ না করলে পাপের উপর ওঠা যায় না; কিন্তু এ প্রেম কোথায় পাই?

'এ প্রেম কোথায় পাই, এ প্রেম কোথায় পাই' ভাবিতে ভাবিতে প্রবোধ গুপ্তমহাশয়ের ভবনে প্রতিনিবৃত্ত হইলেন; তখন রাত্রি প্রায় এগারটা। কেশব বাবুর সঙ্গতে বসিয়া কোথা দিয়া সময় যাইত, উপস্থিত ব্যক্তিরা যেন তাহা বুঝিতে পারিতেন না। প্রবোধ গুপ্তমহাশয়ের ভবনে পৌঁছিয়া দেখেন, পরিবার পরিজন সকলেই উপরে শয়ন করিতে গিয়াছেন; কেবল একটী চাকর লণ্ঠন লইয়া এক পাশে বসিয়া আছে; এবং বসিবার ঘরের টেবলে নিরুপমা পাঠে মগ্ন আছেন। গুপ্তমহাশয় ঘরের সম্মুখের বারাণ্ডায় দাঁড়াইয়া বলিতে লাগিলেন;—"কি নিরু-পমা! এখনও জেগে আছ, শুতে যাও নি! এ কি তোমার পড়ায় বাতিক! ওঠ, ওঠ, যাও, শোও গিয়ে"। নিরুপমা পিতার কণ্ঠস্বর শুনিয়া পুস্তক মুদিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন; এবং বাহিরের বারাণ্ডাতে আসিলেন! তাঁহাকে বাহিরে আসিতে দেখিয়া গুপ্তমহাশয় উপরে চলিয়া গেলেন। প্রবোধ নিরুপমাকে বলিলেন—"ওমা, তুমি এখনও পড়ছিলে? তোমার কি পড়ায় নেশা"!

নিরুপমা। প্রবোধ বাবু! আমি ত পড়ায় মগ্ন ছিলাম, কোথা দিয়ে সময় যাচ্চে টের পাই নি; তোমাদের ফিরতে এত বিলম্ব হ'লো কেন?

প্রবোধ। তা তোমাকে আর কি বলবো! কোথা দিয়ে সময় যাচ্চে তা আমরাও টের পাইনি! পরে সব কথা হবে, তুমি এত মন দিয়ে কি পড়ছিলে?

নিরুপমা। একখানা নূতন ভাল বইএর কথা শুনে আনতে লোক পাঠিয়েছিলাম, বইখানা আনলো রাত্রি নয়টার পরে, খুলে পড়তে বসে মগ্ন হয়ে গেলাম, আর জ্ঞান থাকলো না।

প্রবোধ। কি বই?

নিরুপমা। বিলাতের ভাল ভাল মেয়েদের একখানা জীবনচরিত বেরিয়েছে; তাঁরা স্বদেশের হিতের জন্য কি করেছেন, তাতে তার বর্ণনা আছে; বইখানার কথা শুনে আনতে পাঠিয়েছিলাম; দেখলাম, তাই বটে, এমন ভাল কথা কমই পড়েছি।

প্রবোধ। বটে, তোমার মুখে শুনে যে বইখানা পড়তে ইচ্ছে করছে!

নিরুপমা। বেশ ত, নিয়ে পড়বে। তুমি ত হরিরামপুরে কয়েক দিনের জন্য যাবে; তারি মধ্যে আমি পড়ে ফেলব; তারপর তুমি বহরমপুরে যাবার সময় নিয়ে যেও।

প্রবোধ। তুমি এতক্ষণ মগ্ন হয়ে পড়ছিলে, তাই শুনেই ত মনে হয় বইখানা খুব ভালই হবে।

নিরুপমা। ঘরের মধ্যে চল না, একটা জায়গা একটু পড়ে শোনাই।

এই বলিয়া দুইজনে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিলেন; এবং মনোরমা বই খুলিয়া একটী নারীর জীবনের একটা বিশেষ ঘটনা পড়িয়া শোনাইতে লাগিলেন; শুনিতে শুনতে প্রবোধের শরীর কণ্টকিত হইয়া উঠিতে লাগিল; প্রবোধ বলিয়া উঠিলেন—"যে দেশের মেয়েরা পর্য্যন্ত এতদূর করতে পারে, সে দেশ যে বড় হবে তা কি আশ্চর্য্য?"

নিরুপমা। আর একটু শোন।

এই বলিয়া আবার পড়িতে লাগিলেন; ইতিমধ্যে একজন চাকর উপর হইতে লণ্ঠন হাতে আসিয়া সেই ঘরের দ্বারে দাঁড়াইল; তাহাকে দেখিয়া নিরুপমা বলিলেন—"ওমা, আমরা পড়ার নেশায় ভুলে রয়েছি;

বাবা বোধ হয় আমাকে ডাকতে চাকরকে পাঠিয়েছেন ;” থাক্, বই-খানা তোমার কাছেই থাক্, ভোরে উঠে পড়তে পারবে ; কাল সকালে আমি নেব।”

অতঃপর নিরুপমা উপরে গেলেন ; প্রবোধ বইখানার পাতা উল্টাইয়া কোন্ কোন্ মেয়ের জীবনচরিত আছে তাহা দেখিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহার শয্যায় যাইতে বারটা বাজিয়া গেল।

প্রবোধ হরিরামপুরে যাইবার পূর্ব্বে যে এক সপ্তাহকাল গুপ্ত-ভবনে বাস করিলেন, তাহার মধ্যে এই পরিবারের কার্য্যের শৃঙ্খলা, জ্ঞানে রুচি, কর্ত্তব্যপালনে মতি, ধর্ম্মসাধনে দৃঢ়নিষ্ঠা দেখিয়া চমৎকৃত হইয়া গেলেন। যে নিয়মে তাঁহাদের কাজ চলিতে লাগিল তাহা এই :— প্রাতে ৫॥ টার সময় সুরমা উঠিয়া জোরে ঘণ্টা দেয়, যাহাতে সকলের ঘুম ভাঙ্গে ;—সে ভার তাহার উপর ; কোনও দিন তাহার ব্যতিক্রম হইবার যো নাই ; তারপর ৬টা ৩০ মিনিটের সময় দ্বিতীয় ঘণ্টা পড়ে, তাহা নিরুপমা দিয়া থাকেন,—তাহা উপাসনা গৃহে সমবেত হইবার ঘণ্টা ; উপাসনা গৃহে সকলে সমবেত হইলে, সকলে মিলিয়া ভগবানের নাম গান করেন ; তৎপরে মনোরমা ঠাকুরাণী কোনও ধর্ম্মগ্রন্থ হইতে কিছু পাঠ করেন এবং গুপ্তমহাশয় একটু ভগবানের নাম করেন ; তৎপরে সকলে মিলিয়া একটী বন্দনা গান করেন ; তাহা করিয়া উপাসনা শেষ হয় ; উপাসনান্তে কিঞ্চিৎ প্রাতরাশের পর মনোরমা ঠাকুরাণী গৃহকর্ম্মে ব্যাপৃত হন ; এবং মেয়েরা সমাগত দুইজন শিক্ষকের সন্নিধানে বসিয়া পাঠে মনোনিবেশ করে ; ইঁহাদের মধ্যে একজন কলেজের উচ্চপদস্থ প্রোফেসর, নিরুপমা তাঁর নিকট পড়েন ; প্রায় প্রতিদিন মনোরমা ঠাকুরাণীও গৃহকর্ম্মের ব্যবস্থা করিয়া নিরুপমার পার্শ্বে আসিয়া পড়িতে বসেন ; প্রোফেসর মহাশয়ের নিকট অনেক জ্ঞানের কথা

উপস্থিত করেন, নিজের অনেক সন্দেহভঞ্জন করিয়া লন; এবং অনেক বিষয়ে তাঁহার উপদেশ গ্রহণ করেন! এরূপ জ্ঞানানুরাগিণী নারী অতি দুর্লভ; সুরমা, রমা, বীরেন, ধীরেন ও কৃপা অপর শিক্ষকটীর কাছে গিয়া বসে; নিজেরা পড়ে এবং আবশ্যক মত সাহায্য পায়; সাতটা হইতে নয়টা পর্য্যন্ত এই পড়া চলে, তৎপরে নয়টার সময় আবার ঘণ্টা পড়ে; সে ঘণ্টা মনোরমা ঠাকুরাণী নিজে দিয়া থাকেন; ঘণ্টা পড়িলেই ছেলেমেয়েরা স্নানাহারের জন্য উত্থিত হয়; দশটার পর মেয়েদের স্কুলের গাড়ী আসে; ছেলেরাও স্কুলে কলেজে চলিয়া যায়; বাড়ী খালি হইলে আহারান্তে কিয়ৎকাল বিশ্রামের পর মনোরমা ঠাকুরাণী গভীর পাঠে নিমগ্ন হন; কোথা দিয়া সময় যায় টের পান না; তাহা দেখিয়াই নিরুপমারও জ্ঞানানুরাগ বর্দ্ধিত হইতেছে; বৈকালে ছেলেরা ঘরে আসিলে সন্ধ্যার প্রাক্কালে অপরাহ্ন সাড়ে পাঁচটা, ছয়টার সময় গৃহের কর্ত্রী ঠাকুরাণী গৃহ-সংলগ্ন বাগানে ভৃত্যের দ্বারা সকলের বসিবার আসন সাজাইয়া নিজে গিয়া ছায়াতে বসেন; ক্রমে সেখানে জনসমাগম হইতে থাকে; ছেলে মেয়েরা গিয়া বসে; কোন কোনও দিন বাদ্য যন্ত্র লইয়া বাজায়; গল্পগাছা, হাস্যপরিহাসে মাতাইয়া তোলে; মধ্যে মধ্যে পরিচিত বন্ধুবান্ধব পুরুষ ও নারীদের মধ্যে কেহ কেহ আসেন, কথাবার্ত্তা সমালোচনা প্রভৃতি চলিতে থাকে; প্রায় প্রতিদিন বৈকালে গুপ্ত মহাশয় আফিস হইতে ফিরিয়া সেখানে গিয়া বসেন; এবং হাস্য পরিহাসে দিনের শ্রম ভুলিয়া যান; এখানে বসিয়া থাকিতে থাকিতে সন্ধ্যার অব্যবহিত পরেই সায়ংকালীন উপাসনার ঘণ্টা পড়ে; তাঁহারা উঠিয়া উপাসনা গৃহে আসিয়া একটী সঙ্গীত ও ভগবানের চরণে প্রার্থনা করেন; এ প্রার্থনার ভার মনোরমা ঠাকুরাণীর উপরে

থাকে। ইহার প্রায় আধঘণ্টা পরে সায়ংকালীন আহারের ঘণ্টা পড়ে; তখন সকলে আহারের স্থানে সমবেত হন, এবং আনন্দ উল্লাসে, হাস্য পরিহাসে আহার করিতে থাকেন; সে অট্টহাস্যের ধ্বনিতে ঘর কাঁপিতে থাকে।

ঘড়ির কাঁটার মত এই কাজকর্ম্ম, পাঠ আত্মোন্নতি, হাস্য পরিহাস, আনন্দ উল্লাস প্রভৃতি দেখিয়া প্রবোধের মন একেবারে চমৎকৃত হইয়া গেল। তিনি মহেশের ভবনেও এতটা দেখেন নাই। সর্ব্বোপরি মনোরমা, নিরুপমা প্রভৃতি যে ভাবে তাঁহাকে নিজের লোক করিয়া লইলেন, তাহাতে তাঁহার মন একেবারে আনন্দে প্লাবিত হইতে লাগিল। কৃপার ত কথাই নাই; সে প্রবোধ দা, প্রবোধ দা, করিয়া তাঁহার পশ্চাতে লাগিয়াই আছে; তাঁর ঘরের টেবলে ফুল সাজাইতেছে; ঘরের কোণে খাবার আনিয়া রাখিতেছে; বিছানা ঝাড়িতেছে; কুঁজাতে জল পূরিতেছে; বাটী ঘটী মাজিয়া রাখিতেছে; সকালে বৈকালে তাঁর খবর লইতেছে; এ কয়দিন কৃপা তাঁহাতে মগ্ন রহিয়াছে! প্রবোধের দিন সুখেই কাটিতেছে।

এক সপ্তাহ পরে হরিরামপুরে যাওয়া স্থির হইলেই প্রবোধ মহেশকে সে বিষয়ে পত্র লিখিয়াছিলেন। এই সপ্তাহের মধ্যেই তাহার উত্তর আসিল। মহেশ লিখিয়াছেন :—

"প্রবোধ! তুমি যে গিরিশের বাড়ীতে গিয়া অপমানিত হইয়াছ তাহা কিছুই বিচিত্র নহে। নিস্তারিণী দিদীকে চুরি করিবার পরামর্শের মধ্যে গিরিশই প্রধান উদ্যোগী। যাহা হউক, তুমি আমার মাতুলের কাছে না গিয়া ভালই করিয়াছ; তিনি তোমাকে আরও অপমান করিতেন। দীননাথ মুখুয্যের সঙ্গে হরিরামপুরে যাওয়া যে স্থির করিয়াছ, ইহা ভালই হইয়াছে। সেখানে আমার পিতামহের সঙ্গে

দেখা করিলে-হয়ত নিস্তারিণী দিদীর কোনও সংবাদ পাইলেও পাইতে পার। আমার পত্র পাওয়ার পর তাঁহারা যে নিশ্চিন্ত আছেন, এমন মনে হয় না। হয়ত, চারিদিকে লোক পাঠাইয়া সংবাদ লইতেছেন। আমার পিসীমার সহিত দেখা হইলে তাঁহাকে নিস্তারিণী দিদীর বিবাহের বিষয় এবং ডাক্তার ভদ্রের বিষয় বলিও।

আর একটা কথা, আমাদের গ্রামে একজন বৃদ্ধ সাধু আছেন, তাঁহার নাম ব্রজনাথ দত্ত; তাঁহার ন্যায় আমার হিতৈষী বন্ধু আর নাই। শুনিতেছি তাঁহার শরীর অনেকদিন হইতে খারাপ যাইতেছে; গ্রামে পৌঁছিয়াই তাঁহার সংবাদ আগে লইবে; তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবে; তাঁহাকে আমার প্রীতি ও শ্রদ্ধা জানাইবে; এবং তিনি কেমন আছেন আমাকে সংবাদ দিবে।"

মহেশের এই চিঠি পাওয়ার পরবর্ত্তী শনিবার প্রবোধ দীননাথ মুখুয্যের সহিত হরিরামপুরে যাত্রা করিলেন; হরিরামপুরে পৌঁছিতে রাত্রি হইয়া গেল। তাঁহারা পৌঁছিয়াই শুনিলেন, ব্রজনাথ দত্ত মহাশয় মৃত্যু-শয্যাতে শয়ান; আর দুই দিন বাঁচেন কিনা সন্দেহ। শুনিয়া প্রবোধের মন বড়ই খারাপ হইয়া গেল; তিনি সেই রাত্রেই তাঁহাকে দেখিতে যাইবার জন্য ব্যগ্র হইলেন। কিন্তু দীননাথ বড় ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন; সেজন্য আর বাড়ীর বাহির হইতে চাহিলেন না। তদ্ভিন্ন বাড়ীর লোকেও বলিতে লাগিলেন যে বৃদ্ধ পীড়িত মানুষকে রাত্রে গিয়া বিরক্ত করা উচিত নয়; কাজেই প্রবোধ মনস্থির করিয়া রাত্রিটা সেই গৃহেই যাপন করিতে প্রস্তুত হইলেন। স্থির হইল যে পরদিন প্রাতে তিনি দীননাথের সহিত বাহির হইবেন; প্রথমে ব্রজনাথ দত্তকে দেখিয়া গিয়া মহেশের পিতৃস্বসার সহিত সাক্ষাৎ করিবেন, তৎপরে ফিরিবার সময় মহেশের বাড়ীতে গিয়া, সেখানে প্রতিষ্ঠিত

নগেনের সহিত দেখা করিয়া সে বাড়ী দেখিয়া আসিবেন; বৈকালে বাহির হইয়া হরিরামপুর গ্রাম প্রদক্ষিণ করিবেন; তৎপরে রাত্রিশেষে দীননাথের সহিত কলিকাতা যাত্রা করিবেন।

পরদিন প্রাতঃকালে দীননাথ ও তিনি ব্রজনাথ দত্তকে দেখিতে গেলেন। গিয়া দেখেন, গ্রামের অনেকগুলি ভদ্রলোক সেখানে সমাগত; রোগীর পার্শ্বে কয়েকজন বসিয়াছেন; অধিকাংশ বাহিরের দাবাতে বসিয়া আলাপ করিতেছেন; তাঁহারা বলিতেছেন এখনও শ্বাস দেখা দেয় নাই; কিন্তু দেখা দিতে আর অধিক বিলম্বও নাই; তিনি মধ্যে মধ্যে অচেতন হইয়া যাইতেছেন। দত্ত মহাশয়ের পুত্র যখন শুনিলেন যে প্রবোধ মহেশ বাবুর প্রেরিত লোক, বহরমপুর হইতে তাঁহার পিতাকে দেখিতে আসিয়াছেন, তখন ঐ ঘটনা পিতার গোচর করিবার জন্য ব্যগ্র হইলেন; কারণ, তাঁহার পিতা মহাশয় পীড়ার মধ্যে বহুবার মহেশের নাম করিয়াছেন; বলিয়াছেন—"যাঃ যাবার সময় মহেশের সঙ্গে দেখা হ'ল না! তার খবর কি কেউ জান?" ইত্যাদি।

এই জন্য দত্তমহাশয়ের পুত্র পিতার কর্ণের নিকট মুখ নত করিয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিলেন—"বাবা! বহরমপুর হতে মহেশবাবু তোমাকে দেখবার জন্য লোক পাঠিয়েছেন।" মহেশের নাম শুনিয়াই দত্তজমহাশয় চক্ষু খুলিলেন; ভাঙ্গা ভাঙ্গা স্বরে বলিতে লাগিলেন;—"কৈ মহেশ, কৈ মহেশ!" তাঁহার পুত্র প্রবোধকে তাঁহার কাছে লইয়া গিয়া বলিতে লাগিলেন—"বাবা, মহেশবাবু আসেন নি, তাঁর প্রেরিত এই লোক এসেছেন।' তখন দত্তজমহাশয় হাত বাড়াইয়া প্রবোধের মাথায় হাত দিলেন; আবার তিনি চক্ষু মুদিলেন। ইহার কিছুক্ষণ পরে প্রবোধ উঠিয়া দীননাথের সহিত মেয়েস্কুল ও আত্মোন্নতি-সভার ঘরগুলি দেখিয়া, জগত্তারিণীদেবীর নিকট যাইবার জন্য বাহির হইলেন।

জগত্তারিণীদেবী অগ্রেই নিস্তারিণীর পত্রে প্রবোধের পরিচয় পাইয়াছিলেন। প্রবোধ দেখা করিতে আসিয়াছেন শুনিয়াই রান্নাঘর হইতে বাহির হইয়া আসিলেন। প্রবোধ তাঁর চরণে প্রণত হইয়া পদধূলি লইয়া বলিতে লাগিলেন—"আমার নাম প্রবোধ, আমি বহরমপুরে মহেশবাবুর বাড়ীতে থাকি, আমি গরীবের ছেলে, আমাকে দেখবার কেউ নেই, তিনিই আমাকে মানুষ ক'রছেন; আমার নাম আপনি শুনে থাকবেন।

জগত্তারিণী। তোমার নাম শুনেছি বৈ কি? তুমি যে এমন সময়ে এ গ্রামে এসেছ?

প্রবোধ। আপনি বোধ হয় সব কথা জানেন না। পূজার ছুটীর মধ্যে গিরিশবাবু হঠাৎ বহরমপুরে গিয়ে বললেন যে আপনি পীড়িত, নিস্তারিণী দিদীকে আনা চাই। এই বলে তাঁকে নিয়ে এলেন; তারপর শোনাগেল, আপনার ব্যারাম ট্যারামের কথা সর্ব্বৈব মিথ্যা; তাই মহেশবাবু নিস্তারিণী দিদীর সন্ধানে আমাকে পাঠিয়েছেন; আমি কলকেতায় গিরিশবাবুর কাছে গিয়ে অপমানিত হয়ে এসেছি; তিনি কোনও সংবাদ দিলেন না; তাই ভাবলাম আপনার সঙ্গে একবার দেখা করি, যদি আপনি কিছু জানেন।

জগত্তারিণী। আমি এত কথার কিছুই জানি না; গিরিশ আমাকে কিছুই জানায় নি; কেন যে সে মিথ্যে কথা বলে আনলো তা-ও বুঝতে পারছি না।

প্রবোধ। সে সব কথা আমি আপনাকে ভেঙ্গে বলছি;—সে বিষয়ে আপনার অভিপ্রায় কি তা-ও জানা দরকার।

জগত্তারিণী। চল, ওই রান্নাঘরের দাবার পাশে গিয়ে বসে বলবে; এ সব কথা যার তার শোনা উচিত নয়।

অতঃপর প্রবোধ তাঁর সঙ্গে সঙ্গে রান্নাঘরের দাবার পার্শ্বে গিয়া বসিয়া নিস্তারিণীর প্রস্তাবিত বিবাহের বিষয় ও ডাক্তার ভদ্রের স্বভাব, চরিত্র, সদ্‌গুণ ও কার্য্য-কারিতা প্রভৃতির বিষয় ভাঙ্গিয়া বলিলেন।

জগত্তারিণী। জানই ত আমরা বিধবা-বিবাহের পক্ষ নই; নিস্তারিণীর আবার বিবাহ হবে মনে হলেই মন শিওরে ওঠে! কিন্তু তার ভার সম্পূর্ণরূপে মহেশেরই উপরে দিয়েছি; মহেশ বিদ্যেসাগরের শিষ্য, চিরদিন বিধবাবিবাহের পক্ষ; সে নিস্তারিণীকে নাচিয়ে তুলেছে; তারা যা ভাল বোঝে করুক; আমরা আর কি বলবো? আর ডাক্তার ভদ্রের বিষয় তোমার মুখে যা শুন্‌ছি তাতে ত মনে হয়, এ মানুষের আশ্রয় পেলে তার সুখেই দিন যাবে।

প্রবোধ। তাতে কি সন্দেহ আছে! তবে আমি গিয়ে মহেশবাবুকে এই কথা বলবো?

জগত্তারিণী। তা বলো; কিন্তু নিস্তারিণী গেল কোথায় তার সন্ধান ত কিছু পেলে না!

প্রবোধ। সেই একটা ভাবনার কথা! কালে বোধ হয় সন্ধান পাওয়া যাবে। আমরা মনে করেছিলাম, গিরিশবাবু তাঁকে এনে কোথায় রেখেছেন, শেষে বোধহয় আপনাকে জানিয়েছেন।

জগত্তারিণী। গিরিশ সে ছেলে নয়; পিসীমার উপর তার সে ভাব নাই।

প্রবোধ। তবে আমি যাই; আমাকে পদধূলি দিন: আমরা খবর পেলে আপনাকে জানাব।

এই বলিয়া মাটীতে মস্তক অবনত করিয়া প্রবোধ জগত্তারিণীদেবীর পদধূলি লইতে অগ্রসর হইলেন।

জগত্তারিণী। সে-কি, তুমি এর মধ্যে যাবে? কোথায় উঠেছ?

আমাদের বাড়ীতে কেন থাকলে না? এ বেলা এখানে থাক, খাও, পরে যাবে।

প্রবোধ। আমি ঐ বন্ধুটীর সঙ্গে একদিনের জন্য এসেছি; আজ শেষ রাত্রেই কলকেতায় ফিরতে হবে; এই দেখাই আপনার সঙ্গে শেষ দেখা; আমায় পদধূলি দিন, আশীর্ব্বাদ করুন যেন মহেশবাবুর সাধুতার অনুসরণ করতে পারি।

প্রবোধ এই বলিয়া পদধূলি লইয়া বিদায় হইলেন। তৎপরে তাঁহার বন্ধুর ভবনে ফিরিবার সময়, তাঁহার বন্ধুর সহিত মহেশের পাড়ায় তাঁর বাড়ী ও নগেনকে দেখিবার জন্য গেলেন। নগেনের সহিত অনেক কথা হইল; মহেশের জন্মস্থান তাঁহার চক্ষে বড় পবিত্র লাগিতে লাগিল! এবং সেখানে এমন অনেক কথা শুনিলেন যাহা পূর্ব্বে শোনেন নাই।

বৈকালে প্রবোধ একটী ছেলের সঙ্গে হরিরামপুর গ্রামটী প্রদক্ষিণ করিবার জন্য বাহির হইলেন। দ্রষ্টব্য যাহা কিছু সকলি দেখিলেন; মহেশ বালককালে যে পাঠশালে পড়িতেন তাহা দেখিতে গিয়া দেখেন যে অশীতি-বর্ষাধিক-বয়স্ক মহেশের গুরুমহাশয় তখনও বাঁচিয়া আছেন; চক্ষে ভাল দেখেন না; তাঁহার হাত ধরিয়া পাঠশালে আনা হয়; এবং হাত ধরিয়া মলমূত্র ত্যাগ করাইতে লইয়া যায়। গ্রামে ইংরাজী বাঙ্গালা স্কুল স্থাপনের পর পাঠশালের আর সে অবস্থা নাই; তথাপি একেবারে উঠিয়া যায় নাই।

এই সব দেখিতে দেখিতে ও ঘুরিতে ঘুরিতে সন্ধ্যা হইয়া গেল। প্রবোধ সন্ধ্যার পর বাড়ীতে আসিয়া শুনিলেন যে ব্রজনাথ দত্ত মহাশয় চলিয়া গেলেন। এই সংবাদ যে মহেশের পক্ষে বড় ক্লেশকর হইবে প্রবোধ তাহা অনুভব করিতে লাগিলেন; কিন্তু বৃদ্ধের যাবার বয়স হইয়াছিল।

অতঃপর শেষরাত্রে দীননাথ ও প্রবোধ কলিকাতা-যাত্রা করিলেন। কলিকাতাতে পৌঁছিয়া প্রবোধ গুপ্ত মহাশয়ের ভবনে গিয়া উঠিলেন; তাঁহাকে দেখিয়াই মেয়েরা ছুটিয়া আসিয়া ঘিরিয়া ফেলিল; এবং নিস্তারিণীর কোনও উদ্দেশ পাওয়া গেল কি না জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল; কোনও উদ্দেশ পাওয়া গেল না শুনিয়া সকলেই আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া পরস্পরের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। প্রবোধ সেই দিন বৈকালেই বহরমপুর যাত্রা করিলেন।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

প্রবোধ বহরমপুরে ফিরিয়া মহেশকে সমুদয় সংবাদ দিলেন; মহেশ মহা চিন্তার মধ্যে নিমগ্ন হইলেন। নিস্তারিণীকে কোথায় লইয়া গেল, না জানিতে পারিলে তাঁহার মন সুস্থির হয় না। প্রবোধ তাঁহার মাতুলের ভবনে যান নাই; মহেশ মনে করিলেন কলিকাতার কোন বন্ধুর দ্বারা মাতুলালয়ে সংবাদ লইতে হইবে। সেই পরামর্শ করিয়া চিঠিপত্র দ্বারা কলিকাতার একজন বন্ধুকে সেই কাজে প্রবৃত্ত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

ওদিকে প্রবোধের মনে মহা পরিবর্ত্তন আসিয়াছে! তাঁহার আচরণে, ব্যবহারে, একপ্রকার গাম্ভীর্য্য ও চিন্তাশীলতা দেখা যাইতেছে; তাঁহার স্বাভাবিক বিনয় যেন দশগুণ বর্দ্ধিত হইয়াছে! ক্ষীরদা ও সারদাসুন্দরী ডাকিলেই তিনি দৌড়িয়া আসেন; করযোড়ে তাঁহাদের সম্মুখে দণ্ডায়মান হন; এবং তাঁহারা যে কিছু আদেশ করেন, তৎক্ষণাৎ তাহা পালন করেন। প্রাতে ও সন্ধ্যার সময় দেখিতে পাওয়া যায় যে প্রবোধ নিজ-গৃহের দ্বার বন্ধ করিয়া একাকী চিন্তাতে মগ্ন আছেন।

এই বিষয় লইয়া মহেশের সহিত ক্ষীরদা ও সারদাসুন্দরীর কথা হইতে লাগিল। মহেশ বলিলেন—"ও কলকেতা হতে নূতন ভাব নিয়ে এসেছে; বোধ হয় হৃদয়ে ধর্ম্মচিন্তা জেগেছে; বিরক্ত করার প্রয়োজন নাই; যে পথ ভাল বলে মনে করে সেই পথে থাক্"।

প্রবোধ মেয়েদের নিকট নিজের মনের ভাব ব্যক্ত করিলেন না বটে, কিন্তু গোপনে ডাক্তার ভদ্রের নিকট সকল ভাব ব্যক্ত করিলেন। কলিকাতায় বাসকালে ডাক্তার ভদ্র ব্রাহ্মদের সংশ্রবে আসিয়াছিলেন;

এবং অনেকবার কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়ের ভবনে উপাসনাতে ও সঙ্গত সভায় অধিবেশনে উপস্থিত ছিলেন; কিন্তু প্রকাশুভাবে ব্রাহ্মসমাজে যোগ দেন নাই। তিনি প্রবোধের প্রাণের ভাব হৃদয়ঙ্গম করিয়া তাহার সহায় হইলেন; কয়েকখানি আধ্যাত্মিক-চিন্তা-পরিপূর্ণ বই সংগ্রহ করিয়া গোপনে তাহাকে দিলেন; এবং মধ্যে মধ্যে ধর্ম্মবিষয়ে তাহার সঙ্গে আলাপ করিতে লাগিলেন।

প্রবোধ কেবল ডাক্তার ভদ্রের নিকট নিজের মনের ভাব ব্যক্ত করিয়া ক্ষান্ত হন নাই; নিজের সমবয়স্ক কতকগুলি যুবককে ব্রাহ্মসমাজ স্থাপনের জন্য মাতাইয়া তুলিয়াছেন। একদিন ডাক্তার ভদ্রের সঙ্গে সে কথা হইল।

প্রবোধ। দেখুন, আমার অনেকগুলি বন্ধু এমন একটা জায়গা চাচ্ছে, যেখানে অন্ততঃ সপ্তাহে একদিন সকলে একত্র হয়ে ভগবানের নাম করতে পারে। আপনি কি বলেন?

ডাক্তার ভদ্র। সেত ভালই; মহেশ নিজ ভবনে যে জগদ্ধাত্রী-মন্দির রেখেছেন, সেত ধর্ম্মসাধনের জন্যই রেখেছেন; সেই ঘরটাতে একদিন সকলে একত্র হলে কেমন হয়? আমিও উপস্থিত থাকতে পারি।

প্রবোধ। দেখুন, ওঘরটা মহেশ দাদার এক বিশেষ ঘর; সে ঘরে বাইরের লোক গতায়াত করে তা বোধ হয় তিনি পছন্দ করবেন না; আর তাঁর প্রতি যুবকদলের কেমন একটা সঙ্কোচের ভাব আছে; তাঁর কাছে আসতে তাদের কেমন একটা বাঁধ বাঁধ করে; এ কাজের জন্যে আর একটা জায়গা স্থির করতে পারলে ভাল হয়; যেখানে ছেলেরা অসংকোচে যাবে আসবে।

ডাক্তার ভদ্র। আচ্ছা, আমার বসবার ঘরের পাশের ঘরটা দিলে কেমন হয়?

প্রবোধ। হাঁ, তা হতে পারে; আপনার উপর ছেলেদের সঙ্কোচ ভাব নেই।

ডাক্তার ভদ্র। আচ্ছা, তবে আমার ওই ঘরেই বসতে আরম্ভ কর।

প্রবোধ। কিন্তু আপনাকে উপস্থিত থাকতে হবে; এবং ভগবানের নাম করবার ভার নিতে হবে।

ডাক্তার ভদ্র। আমি উপস্থিত থাকব বটে, কিন্তু নামটাম করবার ভার নিতে পারব না; আমার ওসব আসে না।

প্রবোধ। তবে কি হবে?

ডাক্তার ভদ্র একটু চিন্তা করিয়া বলিলেন—"এখানে একটী সচ্চরিত্র ধার্ম্মিক, বিদ্বান মানুষ সম্প্রতি একটা কাজ নিয়ে এসে বসেছেন; আমি সেদিন তাঁর স্ত্রীকে দেখতে গিয়েছিলাম; শুনেছি তাঁর নাকি ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে যোগ আছে; আচ্ছা, তাঁর সঙ্গে কথা কয়ে দেখব; তিনি আমাদের উপাসনাতে উপস্থিত থাকতে পারেন কিনা।

ইহার পর ডাক্তার ভদ্র সেই ভদ্রলোকটীর সঙ্গে কথা কহিলেন। তিনি এই প্রস্তাব শুনিবামাত্র আনন্দের সহিত তাহাতে যোগ দিলেন। তাঁহার অনুরোধে ডাক্তার ভদ্রের ভবনে সমাজ স্থাপনের প্রস্তাব রহিত হইল। ভদ্রলোকটী আরো অনেকগুলি বন্ধুকে উৎসাহিত করিয়া একটী স্বতন্ত্র বাড়ী ভাড়া করিয়া, মহেশের বন্ধু ন্যায়রত্ন মহাশয়কে সঙ্গী করিয়া, একটী সমাজ স্থাপনে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহার সাধুতার গুণে অল্পদিনের মধ্যেই বহরমপুরে তাঁর অনেকগুলি বন্ধু জুটিয়াছেন; ন্যায়রত্ন মহাশয়ও তাঁর একজন গোঁড়া হইয়া দাঁড়াইয়াছেন। তাঁহারা সকলে ঐ কার্য্যে যোগ দিলেন।

প্রবোধ যেরূপ গোপনে গোপনে যুবকদিগকে লইয়া কাজ করিতে যাইতেছিলেন তাহা হইল না বটে, কিন্তু সমাজের কাজটা খুব উৎসাহের

সহিত আরম্ভ হইল! মহেশ সে পরামর্শে উৎসাহদাতা হইলেন। মহেশ ও ডাক্তার ভদ্রের সহিত পরামর্শে স্থির হইল যে কলিকাতা হইতে কেশবচন্দ্র সেনের দক্ষিণ হস্তস্বরূপ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়কে বহরমপুরে আনাইয়া বিধিপূর্ব্বক সমাজ স্থাপন করা হইবে।

তদনুসারে বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীমহাশয় তাঁহার পত্নী যোগমায়াকে সঙ্গে লইয়া বহরমপুরে আসিলেন; এবং মেডিকাল কলেজে পড়িবার সময় ডাক্তার ভদ্রের সঙ্গে বন্ধুতা ছিল বলিয়া তাঁহার বাড়ীতে উঠিলেন। ক্ষীরদা ও সারদাসুন্দরী গিয়া যোগমায়ার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন; এবং তাঁহাদের আহারাদি ও কাজকর্ম্মের সকল ব্যবস্থা করিয়া দিয়া আসিলেন।

যথা নির্দ্দিষ্ট দিনে সমাজের প্রতিষ্ঠা হইল। বিজয়কৃষ্ণের ভক্তিভাব দেখিয়া লোকে চমৎকৃত হইয়া গেল! তিনি কয়েকদিন বক্তৃতা, শাস্ত্র-পাঠ, কীর্ত্তন প্রভৃতি দ্বারা সমাগত ব্যক্তিদিগকে মাতাইয়া তুলিলেন! তারপর, তাঁহার আবাসভূমি শান্তিপুরে প্রতিনিবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে, দুইদিন মহেশের ভবনে সপরিবারে বাস করিয়া, শাস্ত্রপাঠ ও কীর্ত্তনাদির দ্বারা জগদ্ধাত্রী-মন্দিরকে জাগ্রত করিয়া তুলিলেন।

অবশেষে যখন তাঁহারা শান্তিপুরে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন, প্রবোধ তাঁহাদের সঙ্গে গিয়া তাঁহাদিগকে পৌঁছাইয়া দিয়া আসিবার জন্য ব্যগ্র হইলেন; তাঁহার ব্যগ্রতা দেখিয়া বিজয়কৃষ্ণ তাঁহাকে সঙ্গে লইলেন। মহেশের আদেশে ও তাঁহার যত্নে বিজয়বাবুদের যাইবার জন্য একখানি সুন্দর বড় বোট আসিল; সেই বোটে তাঁহারা যাত্রা করিলেন। ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠে, ধর্ম্মালোচনাতে ও সঙ্গীত সঙ্কীর্ত্তনাদিতে সময় সুখেই অতিবাহিত হইতে লাগিল। প্রবোধের মনে যে সকল নূতন ধর্ম্মচিন্তা আসিতেছিল, তাহার অনেকগুলি তিনি বিজয়কৃষ্ণের নিকট

করিবার সময় পাইলেন ; এবং অনেক প্রশ্নের সদুত্তর পাইয়া পুলকিত হইতে লাগিলেন। এইরূপে প্রবোধ যথাসময়ে গোস্বামী দম্পতীকে শান্তিপুরে পৌঁছাইয়া দিয়া নবভক্তি ও নবশক্তি লইয়া বহরমপুরে প্রতিনিবৃত্ত হইলেন ; আসিয়া দেখিলেন যে, সেই নবাগত ভদ্রলোকটী নবপ্রতিষ্ঠিত সমাজের উপাসনা কার্য্যের ভার লইয়া সুচারুরূপে সে কার্য্য চালাইতেছেন ; এবং তাঁহার যুবক বন্ধুরা উপস্থিত থাকিয়া বিশেষ উপকৃত বোধ করিতেছেন।

এদিকে প্রবোধের মুখে পিসীমার কথা শুনিয়া নিস্তারিণীর বিবাহবিষয়ে মহেশের একটা চিন্তার বোঝা নামিয়া গিয়াছে। কিন্তু আসল কথা, নিস্তারিণী কোথায় ? তাকে কি আর খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে ? আর খুঁজিয়া পাইলেও তার মন কি পূর্ব্বের ন্যায় থাকিবে ? এই সব চিন্তা মনে লইয়া মহেশ নিস্তারিণীর অনুসন্ধানের জন্য বিবিধ উপায় অবলম্বন করিতেছেন। কলিকাতায় পরিচিত বন্ধুবান্ধবকে তাঁহার মামার বাড়ীতে গিয়া কথাপ্রসঙ্গে নিস্তারিণীর তত্ত্ব জানিবার জন্য অনুরোধ করিতে লাগিলেন। অনেকে তাঁর অনুরোধে চক্রবর্ত্তীমহাশয় ও গিরিশের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া, কথাপ্রসঙ্গে আসল কথা জানিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন ; কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। কেহ কোন সংবাদ সংগ্রহ করিতে পারিলেন না।

মধ্যে আর এক ঘটনা উপস্থিত। ডাক্তার ভদ্র মাসিক চারি শত টাকা বেতনে কলিকাতা চাঁদনী হাসপাতালে বদলী হইলেন। তাঁহার বহরমপুর ত্যাগ করাটা এ বাড়ীর সকলের পক্ষে একটা মহা বিচ্ছেদ বলিয়া অনুভূত হইল ; সকল প্রকার দেশহিতকর কার্য্যের একটা প্রধান শক্তি অন্তর্হিত হইবে, মনে হইল। সকলে বলিতে লাগিলেন—"কেন কেন, আপনি আবার বদলী হলেন কেন ? নিস্তারিণী ঠাকুরাণীকে

ত হারিয়েছি, আপনাকেও হারাব ? আমাদের যে বহরমপুর খালি বোধ হবে ! সন্ধ্যার সময় আপনার মুখখানা দেখলে কি আনন্দই হয় ! আমাদের সে আনন্দটা চলে যাবে ?" সারদাসুন্দরী বিবাহের ঘটকালি করিয়াছিলেন, নিস্তারিণীর তিরোভাবে তিনি মহাদুঃখিত ছিলেন ; ডাক্তার ভদ্র চলিয়া যাইবেন বলাতে তাঁহার মন যেন বিষাদে মগ্ন হইল। কিন্তু উপায় কি ? ডাক্তার ভদ্র ঋণজালে জড়িত হইয়া অনেকদিন কষ্ট পাইতেছেন ; এইবার তাঁহার ঋণশোধের ও অবস্থার উন্নতির অবসর উপস্থিত ; তাঁহার পক্ষে চাঁদনীর হাসপাতালে যাওয়াই শ্রেয়ঃ ; সুতরাং তিনি বন্ধুবান্ধবের বিচ্ছেদ ক্লেশ সত্বেও যাওয়াই স্থির করিলেন। যাইবার পূর্ব্বদিন তিনি সমস্ত দিন মহেশের ভবনে মেয়েদের সঙ্গে যাপন করিলেন। নানা কথায়, হাস্য পরিহাসে, তাঁহাদিগকে উৎসাহিত করিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন ; সারদাসুন্দরী নানাপ্রকার মিষ্টান্ন প্রস্তুত করিয়া তাঁহাকে খাওয়াইলেন ; সন্ধ্যার সময় সকলে তাঁহার গীতবাদ্য শুনিলেন ; তাঁহাকেও গীতবাদ্য শোনান হইল ; দিনটা সুখেই কাটিল। পরদিন প্রাতে ডাক্তার ভদ্র যখন যাত্রা করেন, ক্ষীরদা তাঁহাকে বলিলেন —"এবাড়ী ত আপনার নিজের বাড়ী, যখনই ছুটী পাবেন, এখানে চলে আসবেন ; দুচারদিন আমাদের সঙ্গে থেকে যাবেন ; সর্ব্বদা চিঠিপত্র লিখবেন ; বন্ধুতাটা যেন বজায় থাকে ; নিস্তারিণী ঠাকুরঝীকে যদি না-ও পান, আমরা ত আপনার বন্ধু আছি।"

ডাক্তার ভদ্র। কি বল ক্ষীরদা ! তোমাদের বাড়ী যে আমার নিজের বাড়ী তাতে কি সন্দেহ আছে ? আমি যেখানেই থাকি, যে অবস্থাতেই থাকি—এই আমার জুড়োবার জায়গা রইল।

তারপর ডাক্তার ভদ্র সারদাসুন্দরীর সম্মুখে করযোড়ে দাঁড়াইয়া বলিলেন—"আপনার সাধুতার কথা আর কি বলবো ! মহেশ আপনাকার

আপনাকে পেয়েছেন! আমি যেখানেই থাকি আপনার প্রতি আমার শ্রদ্ধাভক্তি রইল।"

অবশেষে ডাক্তার ভদ্র প্রবোধের গলা জড়াইয়া বলিলেন—"ভাই প্রবোধ, তোমাকে আর কি বলবো! তুমি আমার কষ্ট দূর করবার জন্ত অনেক চেষ্টা করেছ; কিছুই হলো না, তার আর তুমি কি করবে? তুমি যা করেছ সেজন্ত চিরকৃতজ্ঞ রইলাম। তোমাকে আমার প্রতিনিধি করে রেখে যাচ্ছি; এই পরিবারের সেবা কর, সকল ভালকাজে সহায়তা কর, ব্রাহ্মসমাজটা স্থাপন করেই যেতে হলো—সেটা রক্ষা কর; আর কি বলবো?" এই বলিয়া সকলের নিকট বিদায় লইয়া যাত্রা করিলেন।

ডাক্তার ভদ্র কলিকাতাতে গিয়াই নিস্তারিণীর অনুসন্ধান আরম্ভ করিলেন; সে বিষয়ে মহেশের পরিচিত বন্ধুদের সঙ্গে পরামর্শ করিতে লাগিলেন। একদিন নিজেই গিরিশের বাসায় তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলেন। গিরিশ তাঁহাকে অকারণ অনেকক্ষণ বসাইয়া রাখিলেন; তৎপরে যখন দেখা করিতে আসিলেন, তখন তাঁহার সহিত এরূপ ব্যবহার করিলেন যে, ডাক্তার ভদ্র আপনাকে অপমানিত বোধ করিয়া বাসায় ফিরিয়া গিয়া মহেশকে সে কথা জানাইলেন। মহেশ সে সংবাদ পাইয়া গিরিশের উপর হাড়ে চটিয়া গেলেন।

ডাক্তার ভদ্রকে অপমান করিয়া গিরিশের ও মনটা বোধ হয় ভাল থাকিল না; কারণ, তিনি জ্যেষ্ঠের অনেকখানি পত্রের উত্তর অগ্রে দেন নাই, এখন তাঁহাকে পত্র লিখিলেন:—"দাদা, তোমার পত্রগুলি পাইয়াছি, উত্তর দিব দিব করিয়া এতদিন দেওয়া হয় নাই। নিস্তারিণী দিদীর জন্ত চিন্তিত হইবেন না; সে ভাল মতেই আছে, ও ভাল আছে; তোমরা তাঁর জন্ত যেরূপ পরামর্শ করিয়াছিলে, সেরূপ চিন্তা তার মনে

আর নাই। বিশেষ কারণে তাহার বাসের স্থানটা গোপন রাখিলাম।" এই পত্র পাইয়া মহেশ ক্রোধে তাহা ছিঁড়িয়া ফেলিলেন; কোনও উত্তর দিলেন না।

ডাক্তার ভয় চলিয়া যাওয়ার পর পাঁচ ছয়মাস অতীত হইল, নিস্তারিণীর উদ্দেশ নাই। এদিকে স্থানীয় লোকেরা মহেশের প্রতি যে বীতরাগ হইয়াছিল, তাহা যেন অল্পে অল্পে মন্দীভূত হইতে লাগিল। "মানুষটা কি মানুষ ভাই! কিছুতেই দমে না, কিছুতেই ভয় পায় না, কিছুতেই পিছপা হয় না!" সকলে এই কথা বলিতে লাগিল। মহেশ পূর্ব্বের ন্যায় উৎসাহে আপনার আরব্ধ কার্য্যগুলি চালাইতে লাগিলেন। সারদাসুন্দরী যে বালিকা-বিদ্যালয়ে শিক্ষয়িত্রীর কার্য্য করিতেন, তাহা ছাড়াইয়া লওয়া হইল। মহেশ বলিলেন—"তুমিত আমার দিদী, আমার বাড়ীর কর্ত্রী; তুমি আবার চাকুরী কি করবে? তবে আমি কি জন্য আছি? তুমি ও কাজ ছাড়; মহিলা-শিল্পাশ্রমে ভাল করে লাগ। নিস্তারিণী দিদী চলে গিয়েছে, ক্ষীরদা ছেলেপিলে ঘরকন্না নিয়ে ব্যস্ত; তুমি কাজটাতে একটু সময় দিতে পারবে; তুমি এটাকে ভাল করে ধর।" সারদাসুন্দরী তাহাই করিলেন। শিল্পাশ্রমে প্রতিদিন যাওয়া ও তাহার কাজকর্ম্ম দেখা, তদুপরি গৃহের কর্ত্তৃত্ব করা এই তাঁর প্রধান কাজ হইল।

শিল্পাশ্রম হইতে সারদাসুন্দরী একদিন সংবাদ আনিলেন যে, সেই যে দরিদ্র বিধবাটী জননীমাত্র সহায় করিয়া আপনার ভবনে থাকিতেন, এবং ক্ষীরদার পরামর্শ অনুসারে একজন পাড়ার দুই যুবককে ডাইকোঁটা দিয়া সৎপথে আনিয়াছিলেন,—তিনি হঠাৎ মাতৃহীন হইয়াছেন। এই বিষয় লইয়া মহেশ, ক্ষীরদা ও সারদাসুন্দরী তিনজনে অনেক আলোচনা হইল; এবং অবশেষে স্থির হইল যে যদি মেয়েটীর অমত না হয় তাহা

হইলে তাঁহাকেও অন্যের মত এই পরিবারভুক্ত করিয়া লওয়া হইবে। তাঁহাকে কাছে পাইলে শিল্পাশ্রমের কাজ আরও ভালরূপে চলিবে।

একদিন গোপনে সারদাসুন্দরী মেয়েটার নিকট এই প্রস্তাব করিলেন; শুনিয়া মেয়েটী বলিলেন—"একি ভগবানের কৃপা! আমি একলা পড়ে অন্ধকার দেখছিল্যাম, তিনি অন্ধকারের মধ্যে আলো এনে দিলেন!" তারপর সারদাসুন্দরীর সহিত সকল পরামর্শ স্থির হইল; এবং মেয়েটী আসিয়া মহেশের ভবন আশ্রয় করিলেন। দুই জনের উপর দুই ভার রহিল; সারদাসুন্দরী বীণাপাণিকে দেখিবার ভার লইলেন; নবাগতা বিন্ধ্যবাসিনী খোকার ভার গ্রহণ করিলেন; ক্ষীরদা খাওয়া দাওয়া দেখা, চাকর বাকর চালান এই কাজে প্রধানরূপে রহিলেন।

প্রবোধ সারদাসুন্দরী ও বিন্ধ্যবাসিনীর ডাইন হাত হইয়া রহিলেন; ইঙ্গিতে আদেশমাত্র অমনি সে কাজ করিয়া দেন; পরিবারের সুখ সুবিধার দিকে সজাগ দৃষ্টি রাখেন; এবং প্রতিদিন সায়ংকালীন উপাসনার পর বিন্ধ্যবাসিনীকে পড়ান। এ বাড়ীতে আসিয়া বিন্ধ্যবাসিনীর সকল দিকেই লাভ বোধ হইতে লাগিল। বিশেষতঃ সারদাসুন্দরী ও প্রবোধের সংস্রবে আসিয়া তাঁর প্রাণে ধর্মভাব জাগ্রত হইয়া উঠিল। প্রবোধ নানাপ্রকার ধর্মগ্রন্থ সংগ্রহ করিয়া রাত্রে শয়নের পূর্ব্বে তাঁহাদিগকে পাঠ করিয়া শুনাইতে লাগিলেন; দিন অতি সুখেই কাটিতে লাগিল।

শিল্পাশ্রমের কাজ দিন দিন বাড়িতে লাগিল। তাহার কারণ এই, বাবু দেবীপ্রসাদের পরিবারগণ মহেশের আফিসে যাইবার জন্য যে গাড়ী ঘোড়া মহেশের বাড়ীর আস্তাবলে রাখিয়াছিলেন, তাহার ব্যয়ভার চিরদিন তাঁহারা বহন করিয়া আসিতেছিলেন। পরে মহেশের বেতন যখন পাঁচশত টাকা করা হইল এবং বাড়ীটি তাঁহাকে দানপত্র লিখিয়া দান করা হইল, তখন হইতে মহেশ গাড়ীঘোড়ার ব্যয় নিজের স্কন্ধে

গ্রহণ করিয়াছেন। সে খানাতে তিনি আফিসে যান, বন্ধুবান্ধবের সহিত দেখা করেন, সহরের নানাস্থান পরিদর্শন করেন। মেয়েদের বেড়াইবার জন্ত এবং আর একটা কাজে লাগাইবার জন্ত আর, একটা গাড়ীর বন্দোবস্ত করিয়াছেন। সে কাজটীর বিষয়ে একদিন সন্ধ্যার সময় সারদাসুন্দরীর সহিত তাঁহার এইরূপ কথা হইল :—

মহেশ। দেখ বড়দি, শিল্পাশ্রমের কাজটা একটু সবল করা আবশুক হয়েছে, সে জন্ত একখানা গাড়ীর বন্দোবস্ত করেছি।

সারদাসুন্দরী। সে কি রকম?

মহেশ। মনেকর তোমরা শিল্পাশ্রমের কাজে বৈকালে ৪টার সময় যাও; যদি বাড়ী হতে ২টার সময় বাহির হয়ে ঐ গাড়ী করে সহরের ভদ্রলোকদের বাড়ীতে বাড়ীতে গিয়ে মেয়েদের সঙ্গে আলাপ কর, শিল্পাশ্রমের উদ্দেশু বুঝিয়ে দাও, মেয়েদিগকে শিল্পাশ্রমে আনবার চেষ্টা কর,—তা হলে কেমন হয়? যদি বেশী মেয়ে জোটে আমাদের গাড়ী তাহাদিগকে আশ্রমে আন্‌তে পারে। বাবু দেবীপ্রসাদের মা যে গাড়ী দিয়েছেন, তাতে কতকগুলি বিধবাকে ও স্কুলের মেয়েদের আনা হয়; আর একখানা গাড়ী হলে আরও অনেক মেয়ে আসতে পারে।

সারদাসুন্দরী। হাঁ, তা হতে পারে।

মহেশ। আচ্ছা, আমি তবে সেইরূপ বন্দোবস্ত করছি; তোমরা কোন্ দিন কোন্ বাড়ীতে যাবে, তা আমি স্থির করে দেব।

অতঃপর মহেশ তাঁর পরিচিত বন্ধুদের সঙ্গে কথাবার্তা কহিয়া, সারদাসুন্দরী ও বিদ্যাবাসিনী কোন্ দিন কোন্ বাড়ীতে যাইবেন, তাহা স্থির করিয়া দিতে লাগিলেন। তাঁহারা আহারান্তে বিশ্রাম করিয়া, দুইটার সময় গাড়ী করিয়া বাহির হইয়া, ভদ্রলোকদের বাড়ীতে বাড়ীতে মেয়ে-

দের সঙ্গে দেখা করিতে লাগিলেন। দুপুর বেলা পুরুষেরা ঘরে থাকে না; সুতরাং মেয়েদের সঙ্গে কথা কহিবার সুবিধা হয়। সারদাসুন্দরীর কি একপ্রকার কথা কহিবার শক্তি আছে, কি একপ্রকার প্রসন্ন সরস সদাশয়তা আছে, যাহাতে যে বাড়ীতে তিনি একবার যান, সেই বাড়ীর মেয়েরা অনুরোধ করেন—"দেখুন, আপনি আবার আসবেন, আবার আসবেন।" মহেশ বিধবা-বিবাহের পক্ষ বলিয়া অনেক মেয়ের যে একটা কুসংস্কার ছিল যে, বিধবাদিগকে আকৃষ্ট করিয়া বিবাহ দেওয়াই তাঁর প্রধান উদ্দেশ্য, সারদাসুন্দরী তাহা ভাঙ্গিয়া দিতে লাগিলেন। তিনি হাসিয়া বলেন—"আচ্ছা, আমাকে দেখনা কেন? আমাকে দেখে কি মনে হয় আমি বিবাহের চেষ্টায় ঘুরছি? আমি বিবাহ করবার ইচ্ছে করলে আমাকে বাধা দিয়ে রাখবার ত কেউ নেই। বিবাহে আমার মন নেই; আমার মন দেশের সেবা করবার দিকে। আর, এই যে বিন্ধ্যবাসিনী, ওকে ত তোমরা জান? ওকি বিবাহ করবার ইচ্ছা করলে মহেশ বিবাহ দিয়ে দিতে পারেন না? ওর সে'দিকে মন নাই; ওরও মন দেশের সেবার দিকে। তেমনি যে বিধবারা আমাদের শিল্পাশ্রমে যোগ দেবে, দেশের সেবার দিকে তাদের যাতে মন হয়, তারা যাতে স্বাধীনভাবে করে খেতে পারে,—আমরা সেই চেষ্টা করব।"

তাঁহার মিষ্ট ভাষায়, সৌজন্যপূর্ণ ব্যবহারে ও প্রেমোজ্জ্বল দৃষ্টিরগুণে নারীদের মন মুগ্ধ হইয়া যাইতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে শিল্পাশ্রমে মহিলাসংখ্যা বিশেষতঃ বিধবা-সংখ্যা বাড়িয়া যাইতে লাগিল। দুইখানা গাড়ী হওয়াতে স্কুলের মেয়েও বাড়িতে লাগিল।

মহিলাশ্রমের কাজ যখন বাড়িতেছে, তখন গঙ্গার অপর পার হইতে সংবাদ আসিল যে, সাঁওতাল পরগণার সাঁওতালদের মধ্যে ঘোর দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইয়াছে। মহেশ শুনিয়া তৎক্ষণাৎ এই বিপত্তির

যথাসাধ্য উপায় বিধান করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইলেন। সাঁওতাল-পরগণানিবাসী তাঁহার এক বন্ধুকে পত্র লিখিয়া প্রকৃত অবস্থা জানিবার জন্য প্রবোধ ও তাঁহার বন্ধুদ্বয়—প্রকাশ ও প্রসন্নকে পাঠাইয়া দিলেন। তাঁহারা যে সংবাদ আনিলেন তাহাতে মহেশের মন বড়ই উত্তেজিত হইয়া উঠিল। তিনি এক নিবেদন পত্র ছাপাইয়া ঘরে ঘরে বিতরণ করিলেন। উড়িষ্যার দুর্ভিক্ষের সময় যেরূপ ঢোল বাজাইয়া প্রকাণ্ডমাঠে চাঁদোয়া টাঙ্গাইয়া, সভা করা হইয়াছিল, সেইরূপ ঢোল বাজাইয়া, দোকানি পশারি সকলের দ্বারে দ্বারে নোটিস বিতরণ করিয়া, মাঠের মধ্যে চাঁদোয়া টাঙ্গাইয়া সভা করা হইল। সভার মধ্যে মহেশ সাঁওতালপরগণা হইতে যে চিঠি পাইয়াছিলেন তাহা পাঠ করিলেন। লোকের মন দয়াতে আর্দ্র হইয়া গেল; সেই সভাতেই অনেক টাকা উঠিতে লাগিল। তারপর ছেলেরা চাঁদার বাক্স লইয়া হাটে বাজারে দোকানে গৃহস্থদের ঘরে ঘুরিতে আরম্ভ করিল। এবার মহেশ সহরে চাঁদা তুলিয়া ক্ষান্ত থাকিলেন না। নিজের নামে একখানি নিবেদনপত্র সংবাদপত্রে প্রকাশ করিলেন; এবং অর্থ সংগ্রহ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। এদিকে আত্মোন্নতি-সভার এক সভা আহ্বান করিয়া তাহার উৎসাহী যুবক সভ্যদিগের মধ্যে চারিজনকে তিনমাসের মত দুর্ভিক্ষক্ষেত্রে কার্য্য করিবার জন্য নিযুক্ত করা হইল। তাঁহারা যেদিন সাঁওতাল পরগণায় যাত্রা করেন, সে দিন মহেশ তাঁহাদের সঙ্গে কোলাকুলি করিয়া, "ঈশ্বর তোমাদের কাজের সহায় হউন" বলিয়া তাঁহাদিগকে বিদায় দিলেন; এবং তাঁহাদের পশ্চাতে থাকিয়া তাঁহাদের কাজের বিবরণ সংগ্রহ করিতে ও অর্থ যোগাইতে নিযুক্ত রহিলেন।

মহেশের নব উৎসাহ ও নব উদ্যম ইহাতেই পর্য্যবসিত হইতেছে না। কল কারখানার শ্রমজীবিগণকে তিনি বিস্মৃত হন নাই। কয়েক রবিবার

বৈকালে প্রবোধ ও মেয়েদিগকে লইয়া সেখানে গিয়াছেন ; শ্রমজীবী-দিগের মধ্যে বসিয়া তাহাদের হৃদয়ে উচ্চভাব ও উচ্চ আকাঙ্ক্ষা উদ্দীপ্ত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন ; কয়েকবার কিলবরণ সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছে ; তাঁহার মুখে বিবাহিত দম্পতীদ্বয়ের ব্যবহারের উন্নতির কথা শুনিয়া এবং তাহাদের প্রতি লোকের নির্য্যাতনের ভাব হ্রাস হইতেছে শুনিয়া আনন্দিত হইয়াছেন।

ক্রমে রূপাদের স্কুলের গ্রীষ্মের ছুটীর সময় আসিয়া উপস্থিত হইল। মহেশের বন্ধু বিধুশেখর গুপ্তমহাশয় কলিকাতা হইতে লিখিলেন যে, ছুটীর সময় তিনি তাঁহার পুত্রদ্বয়কে অপর কোন বন্ধুর সহিত স্থানান্তরে পাঠাইবেন ; এবং নিরুপমা, সুরমা ও রমা রূপার সঙ্গে একমাসের জন্য বহরমপুরে থাকিবে। এই সংবাদে ক্ষীরদা ও সারদাসুন্দরী আনন্দিত হইলেন ; কারণ, ইঁহাদিগকে কাছে পাওয়ার অর্থ আনন্দেতে দিন কাটান। যথাসময়ে কন্যা চতুষ্টয় আসিয়া উপস্থিত। তাহাদের পদার্পণ মাত্র বাড়ী আনন্দ উল্লাসের ধ্বনিতে পূর্ণ হইয়া গেল। পূর্ব্বেই বলিয়াছি মহেশের বাড়ী গুপ্তমহাশয়ের সন্তানদিগের নিকট পরের বাড়ী মনে হয় না। তাহারা এখানে আনন্দে খায়, আনন্দে ঘুমায়, আনন্দে বেড়ায়, আনন্দে খেলা করে! তাহারা আসিয়াই একজন বীণাপাণিকে ও আর একজন খোকাকে সেই যে বুকে ধরিল, ঐ বুকে করিয়া করিয়াই বেড়াইতে লাগিল ; যেন আর নামাইতে চায় না! খোকার আদর দেখে কে! "ওমা কি ছেলে, ওমা কি ছেলে!" বলে সকলে গাল টেপে ও আর চুম্বন করে। খোকাকে লইয়া সুরমা ও রূপার মধ্যে কাড়াকাড়ি লাগিয়া গেল। রূপা বলে—"দাও, আমায় একবার দাও!" সুরমা বলে—"আঃ, রেখ এখন! একটু দেখেনি ; বাঃ, কি সুন্দর ছেলে হয়েছে!" নিরুপমা দাঁড়াইয়া ক্ষীরদা ও সারদাসুন্দরীকে কলিকাতার বাড়ীর বিবরণ দিতে

প্রবৃত্ত হইলেন ; অন্য মেয়েরা ইতিমধ্যে কলিকাতা হইতে সঙ্গে আনীত চাকরাণীর হাতে কাপড়চোপড় গহনাপত্র খুলিয়া দিয়া গঙ্গার ধারে ছুটিল। গঙ্গা দেখিয়া করতালি দিয়া নাচিয়া উঠিল,—"আঃ, আঃ, চোক জুড়ল! কি সুন্দর জায়গা!" তারপর বাগানে গিয়া ফুল তুলিয়া দোলাতে দোল খাইতে বসিয়া গেল।

এ দিকে সারদাসুন্দরীদেবী জল খাবার প্রস্তুত করিয়া কলিকাতার ঝীকে মেয়েদিগকে ডাকিবার জন্য পাঠাইলেন। খাবার দিকে তাদের মন নাই, তারা তখন আনন্দে বিভোর! বিন্ধ্যবাসিনীর পক্ষে এ দৃশ্য নূতন দৃশ্য, তিনি উপরের বারাণ্ডায় দাঁড়াইয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া ভাবিতে লাগিলেন—"ওমা, এ কি! ষোল সতের বৎসরের অবিবাহিত মেয়ে! কে বলবে ওরা এত বয়সের মেয়ে, যেন আট নয় বছরের বালিকা! খেলা ধূলায় কি মন!" ক্রমে ঝীর তাড়া খাইয়া মেয়েরা জলখাবার খাইবার জন্য বাড়ীর মধ্যে আসিল। সারদাসুন্দরী যা খাইতে দেন আনন্দধ্বনি করিয়া খায়। খাইবার সময় একজন বীণাপাণিকে আনিয়া কোলে বসাইল, অপরজন খোকাকে কোলে লইয়া বসিল ; এবং উভয়ে দুজনের মুখে অগ্রে মিষ্ট দিয়া পরে নিজেরা আহার করিতে প্রবৃত্ত হইল। আহারের পরে সন্ধ্যার পূর্ব্বে কিয়ৎক্ষণ বাগানের দোলায় গিয়া দোল খাওয়া হইল ; তৎপরে নীচের ঘরে আসিয়া কিয়ৎক্ষণ চোক বাঁধাবাঁধি খেলা হইল ; তারপর সন্ধ্যার সময় সকলে সেতার হারমোনিয়ম লইয়া বাজাইতে বসিল। বাজনা চলিতেছে এমন সময়ে মহেশ আফিস হইতে ফিরিয়া আসিলেন। যেই মহেশকে দেখা অমনি বাজনা ফেলিয়া, সকলে দৌড়িয়া গিয়া তাঁহাকে ঘিরিয়া ফেলিল ; সকলেই তাঁর পদধূলি লইল ; এবং সকলে একসঙ্গে নাকে মুখে চোখে কলিকাতার বিবরণ দিতে প্রবৃত্ত হইল। মহেশ হাসিয়া বলিলেন—"এক একজনে বল, সকলে

একসঙ্গে কথা কহিলে শোনা যায় না।" তারপর মহেশ নিরুপমাকে সঙ্গে করিয়া নিজের ঘরে গেলেন; এবং তাহার মুখে কলিকাতার বাড়ীর বিবরণ শুনিতে লাগিলেন।

সন্ধ্যা অতীত হইলে সকলে মিলিয়া জগদ্ধাত্রী দেবীর পূজার ঘরে গিয়া বসিলেন। মেয়েরা ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়া স্বীয় স্বীয় স্থানে আসন পরিগ্রহ করিল। মহেশ প্রথমে বিষ্ণুপুরাণ হইতে ধ্রুবোপাখ্যানের কিয়দংশ পাঠ ও ব্যাখ্যা করিয়া শুনাইলেন; তৎপরে সংস্কৃত ভাষাতে ভগবানের একটী স্তুতিপাঠ করিয়া তাহার বাঙ্গালাটা আবৃত্তি করিলেন; অবশেষে সারদাসুন্দরী ভগবানের কৃপার বিষয়ে একটী সঙ্গীত আরম্ভ করিলেন, মেয়েরা সকলে তাহাতে যোগ দিল; সে কি সুন্দর স্বরতরঙ্গই উঠিল! শুনিলে কাণ জুড়াইয়া যায়! সঙ্গীতের পর সারদাসুন্দরী ও মেয়েরা উঠিয়া জগদ্ধাত্রী দেবীর ছবির কাছে গিয়া উদ্দেশে তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। প্রণামান্তে সকলে বাহির হইয়া গেলেন; মহেশ নিজস্থানে আসীন হইয়া ধ্যানমগ্ন রহিলেন। প্রায় একঘণ্টাকাল ধ্যানস্থ থাকার পর তিনি বাহিরে আসিলেন। তখন আবার আহারের সময় পর্য্যন্ত মেয়েদের সেতার হারমোনিয়ম প্রভৃতি বাজনা চলিল।

মেয়েরা যে কয়দিন থাকিল বাড়ীটা যেন মাথায় করিয়া তুলিল! তাহাদের অট্টহাস্যে ঘর কাঁপিয়া যাইতে লাগিল; ছুটাছুটীতে চারিদিক প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। প্রতিদিন গাড়ী করিয়া সহর দেখা, বাগানে ফুলতোলা, দোলায় দোল খাওয়া, গঙ্গায় সাঁতার দেওয়া এইরূপে আমোদ প্রমোদের আর অন্ত রহিল না। অবশ্য এ কথা বলা বাহুল্য মাত্র যে, মায়ের আদর্শে নিরুপমা জ্ঞানানুরাগিণী মেয়ে হইলেও, খেলার সময় তিনি ভিনীদের সঙ্গে খেলা করেন,—বাজাবার সময় বাজান; কিন্তু পাঠে

তাঁর ভারি মনোযোগ; সমস্ত দুপুর বেলা এবং রাত্রে শয়নের পূর্ব্বে কলিকাতা হইতে আনীত পুস্তক পাঠে মগ্ন থাকেন।

একদিনকার একটা হাসির ব্যাপার উল্লেখযোগ্য। সে দিন বৈকালে মেয়েরা এক নূতন খেলা আবিষ্কার করিয়াছে। তাহারা স্থির করিয়াছে যে, এক একজন এক একটা জানোয়ার হইবে এবং তার স্বরে ডাকিবে; কেহ বিড়াল, কেহ কুকুর, কেহ খরগোষ, কেহ ছাগল, কেহ বাছুর ইত্যাদি। নিরুপমা এই খেলার অধিনেত্রী হইলেন; এবং কে কি হইবে তাহা স্থির করিয়া দিতে লাগিলেন। বীণাপাণিকে করা হইল কুকুর, এবং বলিয়া দেওয়া হইল "তুমি চার পায়ে চলিবে ও 'ভ্যাক ভ্যাক' করিয়া ডাকিবে"। সেটা বীণাপাণির মনঃপূত হইল না। সে সম্বন্ধে যে কথাবার্ত্তা হইল তাহা এই:—

বীণাপাণি। আমি তুতু অবোনা।

নিরুপমা। কেন, কুকুর ত ভাল, কুকুরকে সকলে ভালবাসে, খেতে দেয়। ভ্যাক্ ভ্যাক করে ডাকাত কঠিন নয়; লক্ষ্মীমেয়ে কুকুর হও!

বীণাপাণি। না! আমি তুতু অতে পাব্বো না!

নিরুপমা। তবে তুমি কি হবে?

বীণাপাণি। আমি বাদ অবো।

নিরুপমা। বাগ কি জানোয়ারের সঙ্গে খেলা করে? সে যে জানোয়ার মেরে খায়!

বীণাপাণি। তবে আমি খরদোচ অবো।

নিরুপমা। আচ্ছা, তবে খরগোষ হও; কিন্তু খরগোষ কি করে ডাকে, তা-ত জানিনে; আমি শুনেছি বলে মনে হয় না! ইহা লইয়া মুস্কিল বাধিয়া গেল। অবশেষে পাশের বাড়ীর এক চাকরকে ডাকিয়া খরগোষের ডাক শিখিয়া লওয়া হইল। সে খরগোষের ডাক জানিত; তাহার

তাদের বাড়ীতে খরগোষ আছে; বীণাপাণি তার সঙ্গে খেলিতে ভাল বাসে। মহেশ আফিস হইতে আসিয়া এই সকল বিবরণ শুনিয়া হাসিয়া আকুল।

গ্রীষ্মাবকাশের পর মেয়েরা চলিয়া গেলে বাড়ী আবার খালি হইয়া গেল; কারুকর্ম্ম পূর্ব্বের ন্যায় ধীর মন্দ গতিতে চলিতে লাগিল। এই সময়ে একদিন ক্ষীরদা, সারদাসুন্দরী ও বিন্ধ্যবাসিনীর সহিত শিল্পাশ্রমের বিষয়ে কথা হইতে হইতে মহেশের মনে হইল যে, মেয়েরা অপরাহ্ণ ৪ টার সময়ে আসিবেন, একঘণ্টা দেড়ঘণ্টাকাল থাকিয়া চলিয়া যাইবেন, এ নিয়ম থাকিলে তাঁহাদের পড়াশুনার সময় হইবে না, বিশেষ উন্নতি দেখা যাইবে না। হিন্দু বিধবাদিগকে একত্র রাখিয়া এক বাড়ীতে পড়াইবার ও কারুকর্ম্ম শিখাইবার যদি উপায় করা যায় তাহা হইলে বিশেষ উপকার হইতে পারে; তাঁহারা উত্তরকালে কিছু কিছু উপার্জ্জন করিয়া খাইতে পারেন। এই বিষয়ে গুরুতর চিন্তায় নিমগ্ন হইয়া মহেশ অনুভব করিতে লাগিলেন যে যদি তাঁহার জননী জগদ্ধাত্রী দেবীর নামে "জগদ্ধাত্রী-সদন" নাম দিয়া একটী বিধবাশ্রম স্থাপন করা হয়, এবং নানাস্থান হইতে বিধবাদিগকে সংগ্রহ করিয়া সেখানে স্থান দেওয়া যায়, ও তাঁহাদের শিক্ষার সমুচিত বন্দোবস্ত করা হয় তাহা হইলে একটী বড় কাজ হয়। কিন্তু ইহা বহুব্যয়সাধ্য ও বিশেষ আয়োজন সাপেক্ষ, লঘুভাবে এরূপ কাজে অগ্রসর হওয়া উচিত নয়। এইরূপ মানসিক আন্দোলনের মধ্যে তিনি যখন আছেন, তখন বারাণসী হইতে নিস্তারিণীর নিম্নলিখিত পত্র পাইলেন :—

"প্রিয় ভ্রাতঃ

এই আট দশমাস আমি কাশীতে কষ্টে আছি। না জানি তোমরা আমাকে কতই খুঁজে বেড়াচ্চ। গিরিশ যে এমন মিথ্যেবাদী মানুষ তা

আগে জানতাম না। বহরমপুর হতে কলকাতায় এসেই শুনলাম গিরিশ আমাকে মিথ্যে কথা বলে নিয়ে এসেছে; আমার মায়ের ব্যাম ট্যাম সব মিথ্যে! গিরিশ আমাকে বল্‌লে যে আমাকে ডাক্তার ভদ্রের হাত হতে ছাড়াবার জন্যই এরূপ করেছে; কয়েকদিন কাছে রেখে বোঝাতে চায়! সত্যি কথা বলে আনতে গেলে তুমি আনতে দেবে না, তাই মিথ্যে কথা বলেছে। তার পরদিনে রাত্রে আমার পিছনে লাগল—'কি করতে যাচ্চ ভেবে দেখ, কি করতে যাচ্চ ভেবে দেখ, ওপথে পা দিও না' ইত্যাদি।

"দুদিন পরেই তোমার মামার শাশুড়ী ও আমার জেঠিমা কাশীতে আসবার জন্য কলকেতায় এলেন। গিরিশ তাঁদের সঙ্গে আসবার জন্য কোমর বাঁধলো, বল্‌লে—'আমার পূজার ছুটীত এখনও কিছুদিন থাকবে, একবার কাশীটা দেখে আসি। চল, নিস্তারিণী দিদি, তুমিও কাশীটা দেখে আসবে; ফিরে এসে যা হয় কোরো।' এই বলে আমাকে এখানে নিয়ে এল; তখন জানি নাই এখানে আমাকে কয়েদ করে রেখে যাবে! আমাকে এখানে রেখে খবর না দিয়ে চলে গেল! পাণ্ডার বাবুদের সঙ্গে গোপনে ঠিক করে গিয়েছে যে, কারু চাকর আমার চিঠি ডাকে দেবে না। আমি তা জানতাম না; এই আট দশ মাসের মধ্যে তোমাকে পাঁচ ছয় খানা পত্র লিখেছি, কোন খানাই ডাকে দেয় নাই। অবশেষে নিরাশ হয়ে পত্রলেখা ছেড়ে বসে রয়েছি;—যদি তোমরা খুঁজে বার করতে পার। তোমরা বোধ হয় চেষ্টা করতে ত্রুটি কর নাই।

"অবশেষে সেদিন গঙ্গাতে নাইতে গিয়ে একটী বারো তের বছরের বাঙ্গালীর ছেলের সঙ্গে আলাপ হয়। ছেলেটি বড় ভাল; সে আমাকে সাহায্য করবে বলেছে; তার নামও ঠিকানা এই সঙ্গে দিচ্চি; গোপনে রাখবে। খামের উপরে তার নাম লিখে সেই খামের

ভিতরে আমার নামের খাম দেবে; সে গোপনে সেই চিঠি আমাকে দেবে।

"ডাক্তার ভদ্র কেমন আছেন? তাঁকে বলবে যে আমি পিছপা হই নাই; তাঁর গুনাবলী স্মরণে রেখেছি; এক দিন তাঁর পাশে দাঁড়াব আশা করি। বাড়ীর মেয়েদিগকে আমার ভালবাসা দিও। তুমিও আমার প্রীতি ও শ্রদ্ধা লও।"

মহেশ সেই ছেলেটীর নামের খামের মধ্যে এই পত্রের উত্তর দিলেন। ডাক্তার ভদ্র কলিকাতায় চাঁদনী হাসপাতালে চারি শত টাকা বেতনে বদলী হইয়া গিয়াছেন সে সংবাদ দিলেন; এবং আর আর যে কিছু জ্ঞাতব্য বিষয় ছিল তাহাও জানাইলেন। সময়ে সে পত্রের উত্তর আসিল।

ইহার কিছু দিন পরেই পূজার ছুটী আসিয়া পড়িল। মহেশ প্রবোধকে তাঁহার গোপনীয় পরামর্শের মধ্যে লইয়া, তাঁহাকে নিস্তারিণীর উদ্ধারের জন্য কাশী পাঠাইবার পরামর্শ করিলেন। এইরূপ বন্দোবস্ত হইল যে, প্রবোধ গুপ্তমহাশয়ের নিকট হইতে তাঁহার কাশীবাসী এক বন্ধুর নামে পত্র লইয়া, কাশীতে গিয়া তাঁর বাড়ীতে উঠিবেন; উঠিয়া সেই ছেলেটীর সঙ্গে গোপনে দেখা করিবেন এবং নিস্তারিণী পত্র তাহাকে দিবেন; তৎপরে নিস্তারিণীর অভিপ্রায় জানিয়া কাশীবাসী বন্ধুর সাহায্যে পলাইবার দিন, সময় ও গাড়ী ঠিক করিয়া মহেশকে জানাইবেন; সেই দিন সেই সময়ে নিস্তারিণী এক বিশেষ স্থানে আসিলে, তাঁহাকে লইয়া পলাইবেন; পলাইবার পূর্ব্বে মহেশের বন্ধু গুপ্তমহাশয়কে টেলিগ্রাম করিবেন, তিনি গিয়া ষ্টেশন হইতে তাঁহাদিগকে আনিবেন।

এদিকে গুপ্ত মহাশয়কে লিখিয়া রাখা হইল যে, তিনি নিস্তারিণীকে আনিয়াই তাঁহার কোন বন্ধুর ভবনে লুকাইয়া রাখিবেন; এবং তৎপরে

মহেশকে সংবাদ দিলেই তাঁহারা কলিকাতায় গিয়া বিবাহ দিয়া আসিবেন।

যেরূপ বন্দোবস্ত ছিল সেইরূপই কাজ হইল। প্রবোধ গিয়া গুপ্ত মহাশয়ের বন্ধুর ভবনে উঠিয়া, সেই ছেলেটার সঙ্গে মিলিয়া, গঙ্গার ঘাটের নিকট নিস্তারিণীর সঙ্গে দেখা করিলেন; মহেশের চিঠি তাঁকে দিলেন; এবং কাশীর ভদ্রলোকটার পরামর্শ অনুসারে পলায়নের ব্যবস্থা জানাইলেন; এবং যথাসময়ে নির্দ্দিষ্ট প্রণালী অনুসারে তৎপরদিন নিস্তারিণীকে লইয়া কাশী হইতে কলিকাতায় প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। ভাগ্যক্রমে গিরিশ পূজার ছুটীতে সহরে ছিলেন না; তাঁহার কাশীস্থ বন্ধুরা টেলিগ্রাম করিলেন, চিঠি লিখিলেন, তাহার কোনও ফল হইল না।

ডাক্তার ভদ্র আসিয়া গুপ্ত মহাশয়ের ভবনে নিস্তারিণীর সহিত সাক্ষাৎ করিলেন; দুজনে একান্তে অনেক কথা হইল; বিবাহান্তে কোথায় থাকিবেন, কি ভাবে থাকিবেন, কি কি করিবেন, সে সকল পরামর্শ হইল। ডাক্তার ভদ্র চলিয়া গেলে, নিস্তারিণীকে কয়েকদিনের জন্য আর এক ভবনে রাখিয়া আসা হইল। এ দিকে তাড়াতাড়ি বিবাহের আয়োজন হইতে লাগিল। বিবাহের দিন স্থির হইল; কেবল মাত্র কতিপয় বন্ধুকে গোপনে নিমন্ত্রণ করা হইল। এদিকে গিরিশ ছুটীতে যেখানে গিয়াছিলেন সেখানে কাশীর টেলিগ্রাম ও চিঠি পাইয়া ছুটিয়া সহরে আসিলেন; আসিয়া নিস্তারিণীর অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন। শুনিতে পাইলেন যে বহরমপুরের বাড়ীতে নিস্তারিণী নাই। গুপ্ত মহাশয়কে মহেশের প্রিয় বন্ধু বলিয়া জানিতেন, সেখানে গোপনে লোক পাঠাইয়া জানিলেন, নিস্তারিণী সেখানেও নাই; অপরাপর স্থানে খবর লইতে লাগিলেন, কোথাও তাঁর উদ্দেশ পাইলেন না।

এইরূপ অনুসন্ধান যখন চলিতেছে তখন একদিন প্রাতে মহেশ

ক্ষীরদা, সারদাসুন্দরী, বিন্ধ্যবাসিনী প্রভৃতিকে সঙ্গে করিয়া কলিকাতায় আসিয়া উপস্থিত। সেইদিন সন্ধ্যার সময় গুপ্ত মহাশয়ের ভবনে, কতিপয় বন্ধুর সমক্ষে, নিস্তারিণীর বিবাহ হইয়া গেল। ডাক্তার ভদ্র কলিকাতায় আসিয়া বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী ও অন্যান্য ব্রাহ্মগণের সহিত খুব মিশিয়াছেন; তাঁহার অনুরোধে বিজয়কৃষ্ণ ব্রাহ্মধর্ম্মমতে সে বিবাহ দিলেন। গুপ্ত মহাশয় নিমন্ত্রিত বন্ধুদিগকে উত্তমরূপে খাওয়াইলেন; সে ব্যয়ভার তাঁহারাই বহন করিলেন। সে রাত্রে বিবাহিত দম্পতী ও বহরমপুর হইতে আগত ব্যক্তিগণ সেই গৃহেই রহিলেন। তাঁহারা পরদিন প্রাতে নিস্তারিণীকে তাঁহার নিজের ভবনে বসাইয়া দিয়া বহরমপুরে যাত্রা করিলেন।

মহেশ বহরমপুরে ফেরার দুই দিনের মধ্যে নিস্তারিণীর বিবাহের সংবাদ সহরে রাষ্ট্র হইয়া গেল। দোকানি পশারি সকলেরই মুখে ঐ এক কথা। কেহ বলে—"শুনেছ হে, মহেশ বাবু আপনার বোনের বিধবা-বিবাহ দিয়ে এসেছেন!" কেহ বলে—"এ আবার নূতন কথা কি? উনিত চিরদিনই বিধবা-বিবাহের পক্ষ; সেদিন কলকারখানায় দুইটী বিধবা মেয়ের বিয়ে দিয়ে এসেছেন; পরের মেয়ের বিয়ে যদি দিতে পারেন, নিজের বোনের বিয়ে কেন দেবেন না!" এই সব সমালোচনার মধ্যে মহেশের অন্তরঙ্গ বন্ধুগণের মধ্যে অনেকে আসিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে লাগিলেন। ডাক্তার ভদ্র বহরমপুরে সুপরিচিত মানুষ; তাঁহার প্রতি অনেকের শ্রদ্ধা ও প্রীতি আছে; ডাক্তার ভদ্রের সহিত বিবাহটা হওয়াতে তাঁহাদের অনেকেই আনন্দিত। নিস্তারিণীকে কোথায় আবদ্ধ রাখিয়াছিল এবং কিরূপে তাঁহাকে উদ্ধার করিলেন, সেই বিবরণ শুনিয়া সকলেই আশ্চর্য্যান্বিত হইতে লাগিলেন। তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই বলিতে লাগিলেন—"বাপরে বাপ! আপনার

অসাধ্য কর্ম্ম নাই দেখচি! কোথায় কাশীতে গিয়ে লুকিয়ে রাখলো, আর সেখান থেকেও উদ্ধার করে এনে বিয়ে দিলেন! আপনার ভগিনীর দৃঢ়তাও ত কম নয়! তিনি যে ডাক্তার ভদ্রকে বিবাহ করবার সঙ্কল্প করেছিলেন, কিছুতেই তা হতে পিছপা হলেন না!" অপর একজন বলিলেন,—"তবে আর ভালবাসা কি? বাল্যবিবাহের মধ্যে আমরা বর্দ্ধিত হয়েছি, মেয়ের ভালবাসা ফোটবার আগেই তার হাত পা বেঁধে বিয়ে দিয়ে ফেলি; মেয়েরা ভালবাসার জন্য যে কি করতে পারে তা দেখবার আমাদের সময় হয় না; মেয়েদিগকে স্বাধীনভাবে ফুটতে দেও, দেখবে ভালবাসার খাতিরে তারা কতদূর করতে পারে!" এই সূত্রে বাল্যবিবাহ লইয়া তর্ক বিতর্ক হইয়া গেল; মহেশ যেন শুনিয়াও শুনিলেন না; তিনি কতিপয় বন্ধুর সহিত ডাক্তার ভদ্রের বিষয়ে কথায় মগ্ন রহিলেন।

নিস্তারিণীর বিবাহ জনিত আন্দোলন বাবু দেবীপ্রসাদের গৃহেও ব্যাপ্ত হইল। দেবীপ্রসাদের জননী গৃহিণী ঠাকুরাণী মহেশকে আফিস হইতে নিজভবনে ডাকিয়া পাঠাইলেন। অগ্রে যেমন তিনি গরদের চাদরে আপাদ মস্তক আচ্ছাদিত করিয়া বাবু গোপাললালের সমক্ষে মহেশের সহিত দেখা করিতেন, ক্রমে সে সঙ্কোচটা অন্তর্হিত হইয়াছে। মহেশ স্বাধীনভাবে গিয়া তাঁহার বৈঠক ঘরে বসেন ও তাঁর সঙ্গে কথা কহেন; ইহাতে বাবু দেবীপ্রসাদ বা গোপাললালের আর আপত্তি নাই। মহেশের সাধুতাতে তাঁহাদের প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ও তাঁর ধর্ম্মপরায়ণতাতে অবিচলিত বিশ্বাস! গৃহিণী ঠাকুরাণীর ত কথাই নাই; পূর্ব্বেই বলিয়াছি তিনি মহেশের গোঁড়া। তিনি মহেশের নিন্দা সহ্য করিতে পারেন না; তাঁকে আদর্শ মানুষ ও তাঁহার পরিবারকে আদর্শ পরিবার বলিয়া মনে করেন। নিস্তারিণীর বিবাহ সম্বন্ধে কতকগুলি কুৎসিত কথা রটনা

হওয়াতে তিনি মহেশকে ডাকিয়াছেন; অভিপ্রায় এই, তাঁহার মুখে সমুদয় কথা শুনিবেন। মহেশ গিয়া তাঁহার বৈঠক ঘরে বসিয়া আছেন, এমন সময়ে গৃহিণী দাসীসঙ্গে হাসিতে হাসিতে আসিয়া উপস্থিত। তাঁহাকে দেখিয়াই মহেশ উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

গৃহিণী ঠাকুরাণী। দাঁড়ালেন কেন? বসুন, বসুন।

মহেশ। আপনি বসুন, আমি বসচি।

গৃহিণী আসন পরিগ্রহ করিয়া বলিলেন—"আপনি নাকি আপনার ভগ্নী নিস্তারিণীর বিধবা-বিবাহ দিতে কলকেতায় গিয়েছিলেন?"

মহেশ। হাঁ, ডাক্তার ভদ্রের সঙ্গে তাঁর বিয়ে দেওয়া গেল।

গৃহিণী। ওমা, আপনাদের অসাধ্য কাজ নেই! অত বড় মেয়ের বিধবা-বিবাহ!

মহেশ। আমার পক্ষে ও আর নূতন কথা কি? আপনারা ত সব জানেন। তারা অনেক দিন পরস্পরকে ভালবেসে আসছিল, শেষে যখন বিবাহের অভিপ্রায় জানাল, তখন আর না দিয়ে থাকা যায় কি করে?

গৃহিণী। ওমা, বুঝতে পেরেছি, ঐ জন্যেই লোকে বিশ্রী কথা বলচে!

অতঃপর মহেশ নিস্তারিণীর ইতিহাস আনুপূর্ব্বিক বর্ণন করিলেন। কিরূপে ডাক্তার ভদ্রের সঙ্গে তাঁর আলাপ হলো, কিরূপে দুজনে মনের ভালবাসা লুকাইয়া রাখিলেন, কিরূপে সারদাসুন্দরীর অনুরোধে অবশেষে সেই ভালবাসা পরস্পরকে জানিতে দিলেন, কিরূপে তার পরেই তাঁকে নিয়ে গিয়ে কাশীতে কয়েদ করিল, কিরূপে তাঁকে উদ্ধার করা হইল, ইত্যাদি সমুদয় ভাঙ্গিয়া বলিলেন। অবশেষে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি ত নিস্তারিণীদিদীকে ভালবাসেন, তিনি ডাক্তার ভদ্রকে পেয়ে সুখী হয়েছেন, এটা আপনার কেমন লাগচে?"

গৃহিণী। ওতে আমি যে সুখীই হয়েছি, তা আর জিজ্ঞাসা করেন কেন? তবে এ রকম বিবাহ আমাদের লোকে ধর্ম্মে ভাল বলে না।

মহেশ। তাত আমি জানি; আমরা যে প্রাচীন সংস্কার ভেঙ্গে দিচ্চি।

গৃহিণী। তাত দেখচি; আপনাদের যা ভাল বোধ হয় করুন।

মহেশ। এই নিয়ে সহরে খুব আন্দোলন চলেছে।

গৃহিণী। লোকে যা বলে বলুক; আপনি দৃঢ় থাকবেন।

মহেশ। আপনাকে তা বলতে হবে না; ভগবানের উপর নির্ভর করে আমি দৃঢ় আছি; আমার কর্ত্তব্য যা তা করে যাচ্চি তাতে যে যায় যাক্, যে থাকে থাক্!

গৃহিণী। এই দৃঢ়তা থাকাতেই ত আপনি মানুষ হতে পেরেছেন! আমাদের যথাসর্ব্বস্ব আপনার হাতে দিয়ে আমরা নিশ্চিন্ত আছি।

ইহার পরে রবিবার বৈকালে কলকারখানার সেই দুইজন শ্রমজীবী আসিয়া উপস্থিত। নিস্তারিণীর বিবাহের সমাচার লোকের মুখে মুখে কলকারখানাতে গিয়াছে; এবং সেখানে সমালোচনা উপস্থিত করিয়াছে। নিস্তারিণী প্রধানতঃ ইহাদিগের স্ত্রীদিগকে বিবাহ করিবার জন্ত উত্তেজিত করিয়াছিলেন; ইহারা নিস্তারিণীকে বিবাহিত অবস্থায় দেখিতে আসিয়াছে এবং তাঁহাকে একবার কলকারখানাতে যাইবার জন্ত অনুরোধ করিতে আসিয়াছে। বেচারারা যখন শুনিল যে নিস্তারিণী কলিকাতায় আছেন তখন নিরাশ হইল; কিন্তু মহেশ তাহাদিগকে কাছে পাইয়া তাহাদিগকে উৎসাহিত করিয়া তুলিলেন; তাহাদের কাজকর্ম্ম কিরূপ চলিতেছে সে সংবাদ লইলেন; কিলবরণ সাহেবের অনুগ্রহ তাহাদের প্রতি পূর্ব্ববৎ রহিয়াছে জানিয়া আনন্দিত হইলেন; এবং একদিন মেয়েদিগকে লইয়া তাহাদিগকে দেখিতে যাইবেন বলিয়া আশা দিলেন; আরও

শুনিয়া সুখী হইলেন যে লোকে যে তাহাদিগকে একঘরে করিয়া রাখিয়াছিল, কেহ তাহাদের সঙ্গে কথা কহিত না, সেটা অনেক কমিয়াছে; লোকে এখন তাহাদের সঙ্গে কথা কহিতেছে, মিশিতেছে, তবে একসঙ্গে খায় না। মহেশ শুনিয়া হাসিয়া বলিলেন—"আমার সঙ্গেও লোকে খায় না; তাতে আর কি?" তাহারা দুজনে উত্তমরূপে জলযোগ করিয়া ফিরিয়া গেল; মহেশ আবার নিজ কার্য্যে নিমগ্ন হইলেন।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

(০)

ক্রমে মহেশের কার্য্যক্ষেত্র বড় বিস্তৃত হইয়া পড়িল। নানা কার্য্য-সূত্রে সহরের ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের সঙ্গে তাঁহার অনেকবার দেখা সাক্ষাৎ হইয়াছে; সাহেব তাঁহার প্রতি বিশেষ সৌজন্য দেখাইয়া আসিতেছেন; বোধ হয় কলকারখানার কিলবরণ সাহেব ম্যাজিষ্ট্রেটের এই সদ্ভাবের পশ্চাতে আছেন। ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব দুই বৎসর হইতে মহেশকে মিউনিসিপালিটীর কাজে যোগ দিবার জন্ম অনুরোধ করিয়া আসিতেছেন; মহেশ তাহাতে মন দিতেছেন না। অবশেষে সাহেব তাঁহাকে ভাইস-চেয়ারম্যান হইবার জন্ম ধরিয়া বসিলেন; এবং নূতন আইন অনুসারে তাঁহাকে ঐ পদে নিযুক্ত করিলেন। মহেশের খাটুনি বড় বাড়িয়া গেল। তিনি ত নাম মাত্র কাজের ভার লইবার মানুষ নন। তিনি সহরের অবস্থাটা পরিবর্ত্তন করিবার জন্ম বদ্ধ-পরিকর হইলেন। প্রাতে ৭টার সময় বাড়ী হইতে বাহির হইয়া প্রথমে মিউনিসিপাল আফিসে যান; সেখানে কাজকর্ম্মের ব্যবস্থা দেখিয়া, তারপর বাবু দেবীপ্রসাদের ভবনে নিজের আফিসে গিয়া বসেন; সেখান হইতে বাড়ীতে আসিয়া আহারান্তে কিয়ৎকাল বিশ্রামের পর, আবার মিউনি-সিপালিটীর কাজ দেখিতে বাহির হন; চারিটা পর্য্যন্ত সেই কাজ দেখিতে নিযুক্ত থাকেন; চারিটার পর সেকাজ হইতে উঠিয়া, নিজ আফিসে গমন করেন। মিউনিসিপালিটীর কাজের ভার লইয়া সহরের স্বাস্থ্যের অবস্থা দেখিবার জন্ম তিনি পাড়ায় পাড়ায় ঘুরিতে আরম্ভ করিলেন। গরীব দুঃখীদের পাড়াতে গিয়া, তারা কিরূপ ঘরে থাকে, কিরূপে তাদের দিন যায়, কিরূপ অস্বাস্থ্যকর অবস্থার মধ্যে তারা বাস করে, তাহা দেখিয়া

তাঁহার মন বড়ই চিন্তিত হইতে লাগিল। তিনি স্থানগুলি যথাসাধ্য স্বাস্থ্যকর করিবার জন্ত উপায় অবলম্বন করিতে লাগিলেন ; মিউনিসিপালিটীর খরচে জল নির্গমনের জন্য নূতন নূতন নর্দ্দামা করিয়া দিতে লাগিলেন ; এবং মিউনিসিপালিটীর লোক দিয়া বহুদিনের সঞ্চিত আবর্জ্জনারাশি পরিষ্কার করাইতে লাগিলেন। তৎপরে বাড়ী বাড়ী ঘুরিতে গিয়া দেখিতে পাইলেন যে, বহুসংখ্যক ভগ্নকুটীরে দরিদ্র স্ত্রীলোকেরা নানাপ্রকার দুরারোগ্য রোগে ভুগিতেছে, পড়িয়া গোঙাইতেছে, হামাগুড়ি দিয়া আছাড় খাইতে খাইতে গিয়া ছেলে পিলের জন্ত খাবার প্রস্তুত করিবার চেষ্টা করিতেছে, তাহাদের পতিরা তখন হয়ত বাহিরে বাহিরে কর্ম্ম করিতে গিয়াছে। দেখিয়া তাঁহার প্রাণে বড় ক্লেশ হইতে লাগিল। মনে হইতে লাগিল, সহরের হাসপাতালে মেয়েদের জন্ত থাকিবার ভাল বন্দোবস্ত আছে কি না, বাড়ীতে ফিরিবার সময় হাসপাতাল হইয়া দেখিয়া আসিবেন। ডাক্তার ভদ্রকে দেখিবার জন্য তিনি পূর্ব্বে কয়েকবার ঐ হাসপাতালে গিয়াছেন ; কিন্তু এরূপভাবে যান নাই ; গিয়া দেখিলেন মেয়েদের জন্ত স্বতন্ত্র বাড়ী বা স্বতন্ত্র বিভাগ নাই ; মেয়ে রোগী আসিতে পারে এরূপ বন্দোবস্ত করিয়া হাঁসপাতাল করা হয় নাই। সেখানকার কর্ম্মচারীরা বলিলেন—"মেয়ে প্রায় আসে না ; যদি আসে পুরুষদের পাশের ঐ কোণের ঘরে রাখা হয়।" সেটা তাঁর বড় অসন্তোষকর বলিয়া মনে হইল। অনুসন্ধান করিয়া জানিলেন তখন পাঁচছয়টীর অধিক মেয়ে নাই। তিনি এই চিন্তা লইয়া বাড়ীতে ফিরিলেন।

সন্ধ্যার সময় জগদ্ধাত্রীদেবীর পূজাগৃহে সমবেত হওয়ার পর, তিনি কীরদা ও সারদাসুন্দরীর সহিত ঐ কথা আরম্ভ করিলেন। মেয়েদের যে রূপ অবস্থা ও যেরূপ ক্লেশ দেখিয়া আসিয়াছেন তাহা বর্ণন করিতে গিয়া তাঁর চক্ষে জলধারা বহিতে লাগিল ; বলিলেন—"এই সহরে এত

গরীবের মেয়ে বিনা চিকিৎসায় এরূপে মরছে, তা আমি আগে এমন করে দেখি নাই।”

সারদা-সুন্দরী। কেবল কি কুঁড়ে ঘরে গরীবের মেয়েরা বিনা চিকিৎসায় মরছে? আমরা যে দুপুর বেলায় বাড়ী বাড়ী যাই, এসে তোমাকে সকল কথা বলি না; গরীবের মেয়ে বিধবাদের যে অবস্থা দেখে আসি, তা আর বলবার নয়। বাড়ীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা ছোট বায়ুহীন একটা ঘরে তারা প'ড়ে আছে; রোগে যাতনায় ছটফট করছে; ডাক্তার ডাকা দূরে থাক, কেউ একবার উঁকিও মারে না! রেলওয়ে হয়ে এবং শিক্ষার বিস্তার হয়ে হিন্দু গৃহস্থের ঘরে পূর্ব্ব নিয়ম সব ভেঙ্গে যাচ্ছে; পরিবার ছিন্ন ভিন্ন হয়ে পড়ছে; বিধবারা অসহায় নিরুপায় হয়ে হাবুডুবু খাচ্ছে!

মহেশ। আচ্ছা, আমার একটা কথা মনে হচ্ছে; এখানকার হাসপাতালের সঙ্গে একটা "ফিমেল ওয়ার্ড" অর্থাৎ মেয়ে হাসপাতাল যদি করা যায় ত কেমন হয়? সেখানে ত গরীবের মেয়েরা এবং এই সব ভদ্রলোকের মেয়েরা আশ্রয় পেতে পারে।

সারদাসুন্দরী। ভদ্রলোকের মেয়েরা কি হাসপাতালে যাবে? হাসপাতালের উপর আমাদের দেশের লোকের বড় কুসংস্কার!

মহেশ। মেয়ে হাসপাতালটা মেয়ে ডাক্তারের অধীন থাকবে; পুরুষ হাসপাতাল হতে দূরে হবে; তাদের প্রবেশের দোর আলাদা হবে; পরিচর্য্যার ভার মেয়ে নার্সদের উপরে থাকবে;—তা হলে কি গরীব ভদ্রলোকের মেয়েরা আসবে না?

সারদাসুন্দরী। এ সব নিয়ম যদি করা যায়, তা হলে বোধ হয় ক্রমে ক্রমে মেয়ে যুটতেও পারে।

ইহার পরে মহেশ সহরের ভদ্রলোকদের সঙ্গে এ বিষয়ে কথা কহিতে

আরম্ভ করিলেন; সকলেই একটা মেয়ে হাসপাতালের আবশ্যকতা স্বীকার করিতে লাগিলেন; এবং মহেশ সেই কার্য্যসাধনে দেহ মন নিয়োগ করিলেন। সে বহুব্যয়সাধ্য ব্যাপার! হাসপাতালের যে বাড়ীটা আছে, তাহাতে কুলাইবে না, আর একটী বাড়ী নির্ম্মাণ করিতে হইবে; একজন মেয়ে ডাক্তার ও কয়েকজন নার্স নিযুক্ত করিতে হইবে; তাঁহাদের বেতনের টাকার বন্দোবস্ত করিতে হইবে; ইত্যাদি, ইত্যাদি—প্রতি পদেই খরচ। সে টাকা আসে কোথা হইতে? মহেশের আহার নিদ্রার মধ্যে সেই চিন্তা জাগিতে লাগিল। তিনি একদিন পরামর্শের জন্য ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের কাছে গেলেন। ম্যাজিষ্ট্রেট হাসপাতালের সঙ্গে একটা মেয়ে হাসপাতাল করার প্রস্তাব শুনিয়া আনন্দিত হইলেন। তাঁহাদের যে কথোপকথন হইল তাহা এই ঃ—

ম্যাজিষ্ট্রেট। Well, I see, a female ward attached to the present hospital will be really a good thing.—অর্থাৎ, আমি বুঝতে পারছি যে, বর্ত্তমান হাসপাতালের সঙ্গে একটি মেয়ে হাসপাতাল করতে পারলে ভালই হবে।

মহেশ। Will you kindiy help me in getting it up?—অর্থাৎ, আপনি কি ইহা করা বিষয়ে আমার সহায় হবেন?

ম্যাজিষ্ট্রেট। In what way do you want me to help you?—অর্থাৎ, তুমি কিরূপে আমাকে সাহায্য করতে বল?

মহেশ। A new house is to be erected; a lady doctor is to be engaged; female nurses are to be secured; and the expenses of the establishment to be met;—can the Government undertake all that?—অর্থাৎ, একটা নূতন বাড়ী নির্ম্মাণ করতে হবে; একজন লেডী ডাক্তার নিযুক্ত করতে হবে; মেয়ে

নার্স নিযুক্ত করতে হবে ও খরচটা চালাতে হবে ;—গবর্ণমেন্ট কি এই সমুদয় ব্যয়ভার বহন করতে পারবেন ?

মাজিষ্ট্রেট। (একটু চিন্তা করিয়া) Well, my suggestion is this—You raise money and construct the house ; let our municipality bear the expenses of maintaining the institution and let us move Government to pay the lady doctor and the nurses.—অর্থাৎ, আচ্ছা, আমার পরামর্শ এই—বাড়ীটা নির্ম্মাণ করবার টাকা তুমি তোল ; আমাদের মিউনিসিপালিটী হাসপাতালটা চালাবার ভার নিক ; এবং গবর্ণমেন্টকে বলিয়া লেডী ডাক্তার ও নার্সদের বেতনের বন্দোবস্ত করি।

মহেশ। That is an excellent plan ; I shall think over it.—অর্থাৎ, এ প্রস্তাবটা বড় ভাল, আমি ভেবে দেখব।

তারপর মহেশ সেই প্রস্তাবটা মাথাতে লইয়া বাড়ীতে আসিলেন ; এবং কিরূপে সেটা কাজে পরিণত করা যায় চিন্তা করিতে লাগিলেন ; সেটা তাঁর মনকে ঘিরিয়া ধরিতে লাগিল ; মেয়েহাসপাতাল তাঁহার ধ্যানেজ্ঞানে প্রবেশ করিতে লাগিল। তিনি মনে মনে স্থির করিলেন যে, হাসপাতালের বাড়ীর জন্য নিজে পাঁচ শত টাকা দিবেন ; বাবু দেবী প্রসাদের পরিবার পরিজনদিগের নিকট হইতে কয়েক হাজার টাকা তুলিবেন ; অবশিষ্ট কয়েক হাজার টাকা সহরের ভদ্রলোকদিগের এবং নিকটবর্ত্তী স্থানসমূহের বড়লোকদিগের নিকট হইতে সংগ্রহ করিবেন। এইরূপ স্থির করিয়া তিনি একদিন বাবু গোপাললাল, বাবু দেবীপ্রসাদ ও গৃহিণী ঠাকুরাণী এই তিনজনের সমক্ষে ঐ প্রস্তাব উপস্থিত করিলেন। তিনি গরীব মেয়েদের বাড়ীতে বাড়ীতে ঘুরিয়া যাহা দেখিয়াছেন তাহা যখন বর্ণনা করিতে লাগিলেন, তখন একবার চক্ষু তুলিয়া দেখেন যে

গৃহিণী ঠাকুরাণী.চক্ষু মুছিতেছেন। বর্ণনা শেষ করিয়া তিনি বলিলেন —"ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের সঙ্গে পরামর্শ হইয়াছে যে, গরীব মেয়েদের জন্ত একটা স্বতন্ত্র হাসপাতাল বাড়ী নির্ম্মাণ করা হইবে; সে হাসপাতাল একটী মেডা ডাক্তার ও কয়জন নার্সের হাতে থাকিবে; বাড়ীটা আমাদিগকে নির্ম্মাণ করে দিতে হবে; ডাক্তার প্রভৃতির বেতন গবর্ণমেণ্টের নিকট হতে নিতে হবে; অন্ত খরচ পত্র মিউনিসিপালিটী দেবেন। বাড়ী নির্ম্মাণের বন্দোবস্ত করার ভার আমার উপর পড়েছে। আমি মনে করেছি নিজে একমাসের বেতন পাঁচ শত টাকা দেব। আপনারা কত দিতে পারবেন, জানালে বাধিত হব।"

গৃহিণী ঠাকুরাণী। আপনার পাঁচশ' টাকা অন্ত কাজের জন্ত রাখুন; মেয়ে হাসপাতালের বাড়ী আমরা নির্ম্মাণ করে দেব।

বাবু গোপাললাল ও দেবীপ্রসাদ একবার পরস্পরের মুখের দিকে চাহিলেন; বোধ হইল তাঁহারা এতটা দায়িত্ব মাথায় লইতে ভয় পাইতেছেন। কিন্তু গৃহিণী ঠাকুরাণী যখন বলিয়া ফেলিয়াছেন তখন আর উপায় নাই। তৎপরদিনই বাবু গোপাললাল মহেশকে কিরূপ বাড়ী হইবে জানাইবার জন্ত পত্র লিখিলেন। মহেশ গিয়া ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন এবং এই সংবাদ দিলেন। দুই দিনের মধ্যেই মুর্শিদাবাদ হইতে একজন একজিকিউটিব ইঞ্জিনিয়ারকে আনাইয়া, ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব ও মহেশ তাঁহার সঙ্গে দাঁড়াইয়া, হাসপাতালের ডাক্তার বাবুর পরামর্শানুসারে নূতন বাড়ীর একটা 'প্লান' স্থির করিলেন। দুইদিন পরে বাবু দেবীপ্রসাদের ভবনে সেটা প্রেরিত হইল। তাঁহারা তাঁহাদের পরিচিত কণ্ট্রাক্টর আনাইয়া হাসপাতালের বাগানের মধ্যে নূতন হাসপাতাল বাড়ী নির্ম্মাণের বন্দোবস্ত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

এদিকে ম্যাজিষ্ট্রেট নূতন মেয়ে হাসপাতালের প্রস্তাব মিউনিসি-

পালিটীতে উপস্থিত করিয়া পাস করাইয়া লইলেন; এবং লেডী ডাক্তার প্রভৃতির বেতনের জন্য গবর্ণমেণ্টের নিকট পত্র লিখিলেন।

এইরূপে যখন একদিকে নূতন গৃহ নির্ম্মাণের ব্যবস্থা হইতে লাগিল, তখন অপরদিকে মহেশ একজন উপযুক্ত লেডী ডাক্তার ও কয়েকজন নার্সের যোগাড় করিবার জন্য তাঁর কলিকাতাবাসী বন্ধু গুপ্ত মহাশয়কে লিখিতে লাগিলেন। লেডী ডাক্তারটী তাঁদের জানা শোনা একটী ভাল মেয়ে হওয়া চাই; এবং নার্সগুলিকে লেডী ডাক্তার পছন্দ করিয়া লইবেন। কলিকাতার বন্ধুরা অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন; ক্যাম্বেল মেডিক্যাল স্কুলে যে সকল মেয়ে পড়িতেছেন, তাঁহাদের বিষয়ে সংবাদ লইতে লাগিলেন; যে সকল মেয়ে ডাক্তার হয়ে নানাস্থানে কাজে বসিয়াছেন, তাঁহাদের বিষয়ে ও সংবাদ লইতে লাগিলেন।

এদিকে নূতন বাড়ী দিন দিন উঠিয়া দাঁড়াইতে লাগিল। মহেশ প্রতিদিন প্রাতে আফিসে যাইবার পূর্ব্বে সেখানে গিয়া দাঁড়ান; এবং কণ্ট্রাক্টর বাবুর সহিত নানা বিষয়ে পরামর্শ করেন।

যথা সময়ে বাড়ী নির্ম্মাণ শেষ হইয়া গেল। মহেশের অনুরোধে একদিন ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব সহরের ভদ্রলোকদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া হাসপাতাল প্রতিষ্ঠার কার্য্য শেষ করিলেন। তাহাতে তিনি বাবু দেবীপ্রসাদের পরিবারদিগকে সমুচিত প্রশংসা করিলেন; এবং মহেশের অনুরোধে দেবী প্রসাদের জননীর নামে তাহার নাম "মীরা হাসপাতাল" রাখিলেন। গৃহিণী ঠাকুরাণীর পিতা সুপ্রসিদ্ধ ভক্তিমতী মীরাবাই-এর গোঁড়া ছিলেন; এবং তাঁহার নাম অনুসারে নিজ কন্যার নাম করণ করিয়াছিলেন; সেই নাম এখন হাসপাতালের নামে বসিল। কল কারখানার ক্লিনবরণ সাহেব সেদিন উপস্থিত ছিলেন; তিনি মহেশের স্বদেশ-প্রেমের অনেক প্রশংসা করিলেন; এবং মীরা হাসপাতালের জন্য আনন্দ প্রকাশ

করিতে লাগিলেন। মাসিক ৮০৲ টাকা বেতনে একজন লেডী ডাক্তার ও তিন জন নার্স সেই দিনই আসিয়াছিলেন, সভা ভঙ্গ হইলেই তাঁহারা স্বীয় স্বীয় কাজে বসিয়া গেলেন। লেডী ডাক্তার দুই চারি দিনের মধ্যেই মহেশের পরিবার পরিজনের সহিত ঘনিষ্ঠ প্রীতিসূত্রে বদ্ধ হইয়া পড়িলেন।

হাসপাতাল খুলিলে কি হয়, সেবার বন্দোবস্ত করিলে কি হয়, রোগের সময় হাসপাতালে যাওয়া এদেশের লোকের চক্ষে বড়ই নিন্দনীয়। গরীব লোকেরা নর্দ্দামায় পড়িয়া মরিবে সেও স্বীকার, তথাপি হাসপাতালে যাবে না! লোকদিগকে লওয়ান মহেশের পক্ষে কঠিন কাজ হইয়া পড়িল; যাহাদের বাড়ীতে স্ত্রীলোক পীড়াতে ক্লেশ পাইতেছে, এরূপ কতিপয় ব্যক্তিকে লইয়া তিনি হাসপাতালে গিয়া, স্ত্রীলোকদের জন্য কেমন একান্তে থাকিবার বন্দোবস্ত আছে, কিরূপে মেয়ে ডাক্তার মেয়ে নার্সের হাতেই থাকিবে—এই সকল দেখাইয়া দিলেন; তৎপরে নিজ ব্যয়ে কয়েকটী মেয়েকে আনিলেন। উৎসাহের সহিত চিকিৎসা ও সেবা আরম্ভ হইল। ক্রমে দুই চারিটি করিয়া গরীব মেয়ে আসিয়া জুটিতে লাগিল। মীরা হাসপাতাল গরীব মেয়েদের আকর্ষণের স্থান হইয়া উঠিল।

মহেশ লেডী ডাক্তারকে বলিয়া দিয়াছিলেন, থাকিবার নিয়মাদিতে ও আহারাদির বন্দোবস্তে জাতিভেদ প্রথা মানিয়া চলিতে হইবে; ব্রাহ্মণ মেয়েরা যদি আসে, তাহাদের জন্য স্বতন্ত্র ঘর ও স্বতন্ত্র খাবার ব্যবস্থা করিতে হইবে; সেইরূপে কার্য্য চলিল। মহেশ নিজে যেমন নিম্ন-শ্রেণীর গরীবের মেয়ে সংগ্রহ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন, তেমনি অপরদিকে ব্রাহ্মণ কায়স্থের বাড়ীর গরীব মেয়ে জুটাইবার জন্য শারদাসুন্দরীকে লাগাইলেন। তিনি যে গাড়ী করিয়া বাড়ী বাড়ী যাইতেন, পীড়িত

মেয়েদিগকে হাসপাতালে আনা তাঁর এক প্রধান কাজ হইয়া দাঁড়াইল। তিনি ভদ্র ঘরের গরীব বিধবাদিগকে বলিতে লাগিলেন,—"তোমরা কি কর! ঘরের কোণে পড়ে 'গ্যাঁ গ্যাঁ' করবে, কেউ উঁকি মেরে দেখবে না, সেই কি ভাল? আমি হাসপাতালে নিয়ে যাচ্ছি, চল না; সেখানে পুরুষের মুখও দেখতে হবে না; মেয়ে ডাক্তার, মেয়ে সেবিকা, সব মেয়ে পাবে; আর আমরা পিছনে আছি, সারলেই বাড়ীতে দিয়ে যাব।" তারপর মহেশের দ্বারা বাড়ীর পুরুষদিগকে রাজী করিয়া কয়েক জনকে হাসপাতালে লওয়া হইল। তাঁহারা ফিরিয়া আসিয়া যে বিবরণ দিলেন, তাহাতে হাঁসপাতালের প্রতি লোকের কুসংস্কার কমিয়া যাইতে লাগিল; মেয়ের সংখ্যা ক্রমশঃ বাড়িতে লাগিল।

মীরা হাসপাতালে যে লেডী ডাক্তারটী আসিয়াছেন তাঁর নাম সরোজিনী; তিনি ক্ষীরদার সমবয়স্কা। সরোজিনী একদিন দুপুর বেলা মহেশের বাড়ীতে আসিয়া এক অনাথা হিন্দু বিধবার গল্প শুনাইলেন, যাহা শুনিয়া সকলেই অতিশয় দুঃখিত হইলেন। মহেশের চক্ষু অশ্রুজলে সিক্ত হইল। সেই বিধবা পতির সহিত তাঁহার পিত্রালয় চুঁচড়া সহরে ছিলেন; কিছুদিন হইল তাঁহার পতি পরলোক গত হইয়াছেন; যাইবার সময় পৈতৃক বিষয়ের সামান্য আয় ও কয়েকখানি গহনা ব্যতীত অধিক কিছু রাখিয়া যাইতে পারেন নাই; তাঁর দুইজন দেবর আছেন; একজন চুঁচড়াতে আছেন, আর এক জন মুর্শিদাবাদে সামান্য কর্ম্ম করেন; উভয়েরই অবস্থা মন্দ। তাঁহার পতির মৃত্যুর কিছুদিন পরে তাঁহার চুঁচড়াবাসী দেবর বলিলেন—"আমার এই অবস্থাতে আমি কিরূপে তোমার এবং তোমার দুই মেয়ে ও এক ছেলের ভার নিতে পারি? তুমি একটা উপায় দেখ।" সে সময়ে ঐ বিধবার পিত্রালয় বাসী গ্রামে কেহ থাকিতেন না; তাঁহার দুই ভ্রাতার মধ্যে একজন এলাহাবাদে ৮০

টাকা বেতনে কর্ম করেন, আর একজন কানপুরে কর্ম করেন। বিধবাটী প্রথমে এলাহাবাদের ভ্রাতাকে নিজের অবস্থা জানাইয়া উপর্য্যুপরি পত্র লিখিলেন; উত্তর না পাইয়া কানপুরের ভ্রাতাকেও পত্র লিখিলেন, সেখান হইতেও উত্তর নাই! অবশেষে উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া এলাহাবাদে গিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে দেখিয়াই তাঁহার ভ্রাতার ও ভ্রাতৃবধূর মন বিরক্ত হইল। ভ্রাতা বলিলেন, "এসে যখন পড়েছ তখন কিছুদিন থেকে যাও, কিন্তু আমি চিরদিনের মত ভার নিতে পারব না; দেখছ ত আমার ছেলে পিলে কত এবং ব্যয়-বাহুল্য কিরূপ!" তারপর কিছুদিন পরে বেচারী কানপুরে দ্বিতীয় ভ্রাতার কাছে গিয়া উপস্থিত হইলেন। সে ব্যক্তি বলিল—"দাদার আশি টাকা বেতনে দাদা স্থান দিতে পারলেন না, আমি পঞ্চাশ টাকা বেতনে কিরূপে দি! আচ্ছা, কয়েকদিন থাক, তারপর তোমাকে চুঁচড়াতে শ্বশুর বাড়ী গিয়ে দেবরের কাছেই থাকৃতে হবে।" অতঃপর সেই ভ্রাতা টাকা দিয়া বিধবাটীকে চুঁচড়ায় পাঠাইয়া দিলেন। বেচারী কাঁদিতে কাঁদিতে চুঁচড়ায় আসিলেন। চুঁচড়ার দেবর দেখিয়াই জ্বলিয়া গেল—"আমার অবস্থা ত তোমার জানা আছে, কি ভেবে ফিরে এলে? তুমি যেখানেই থাক, পৈতৃক সম্পত্তির কয়েক টাকা আমি তোমাকে পাঠাব; কিন্তু আমি তোমার সমুদয় ভার নিতে পারব না।" অবশেষে নিরুপায় হইয়া বিধবাটী মুর্শিদাবাদের দেবরের কাছে আসিলেন; সে বেচারা ভাল মানুষ, কিন্তু তার সামান্ত আয়ে তারই চলে না; সে মহা বিপদের মধ্যে পড়িয়া গেল। ইতিমধ্যে বিধবাটীর একটী কন্যার গুরুতর পীড়া উপস্থিত। দেবরের পত্নী ভয়ানক দুশ্চিন্তা ও বিরক্তির মধ্যে পড়িয়া গেলেন। এই অবস্থায় বহরমপুরের মীরা হাসপাতালের সংবাদ কাণে যাওয়াতে, বিধবাটী মেয়ে দুটী ও ছেলেটী সঙ্গে লইয়া সেখানে

উপস্থিত হইয়াছে। সরোজিনী নিরুপায় দেখিয়া মেয়েটীকে হাঁসপাতালে রাখিয়া, তাহার মা, বোন ও ভাইকে নিজের বাসভবনের এক অংশে রাখিয়া, অন্য কোনও উপায় না হওয়া পর্য্যন্ত, তাহাদিগকে খাওয়াইবার ভার লইয়াছেন।

শুনিতে শুনিতে সারদাসুন্দরী মহেশকে সম্বোধন করিয়া বলিয়া উঠিলেন,—"দেখেছ, বিধবাদের কি অবস্থাই দাঁড়িয়েছে! আমি সেদিন যা বলছিলাম তা হাতে হাতে দেখ।"

মহেশ। বলোনা, বলোনা; জোয়ারের কাঠখানার ন্যায় হিন্দু বিধবারা এ চড়া হতে ও চড়াতে ভেসে ভেসে বেড়াচ্চে! "আয়" বলে ডাকবার কেউ নাই।

সরোজিনী। দেখুন, ইংরেজী শিক্ষা যত বিস্তার হচ্চে, ভদ্রলোকেরা কাজে কর্ম্মে যত ছড়িয়ে পড়চেন, বিধবাগুলির মাথা রাখবার জায়গা চলে যাচ্চে।

সারদাসুন্দরী। ঐ কথাই আমি সেদিন বলছিলাম।

ক্ষীরদা। মাথা রাখবে কোথায়! বৌদের গঞ্জনা খেয়ে খেয়ে কতদিন থাকতে পারে?

মহেশ। বিধবাদের শিক্ষা দেওয়ার ও করে খাবার বন্দোবস্ত করা অতীব আবশ্যক; তা হলে তাদের অনেকে দাঁড়াবার একটা উপায় পেতে পারে।

সারদাসুন্দরী। ঐ জন্যেই ত শিল্পাশ্রম করেছিলে; তাতেও অনেক বিধবা ঘরে বসে বসে কিছু উপার্জ্জন করতে পারছে।

মহেশ। শিল্পাশ্রমে ত এখানকার কয়েকজন মেয়ে আসে; এমন একটা জায়গা থাকা উচিত যেখানে অন্য স্থান হতে বিধবারা এসে থাকতে পারে; তাদের লেখাপড়ার বন্দোবস্ত করা যেতে পারে, এবং কাজ শেখান যেতে পারে।

সারদাসুন্দরী। তুমি যে একবার জগদ্ধাত্রী-সদনের কথা বলছিলে, সেরূপ একটা স্থান করা যায় কিনা দেখ না।

মহেশ। সেইটে মনে জাগচে; এই মীরা-হাঁসপাতালটা এসে পড়াতে সে পরামর্শটা পিছিয়ে দিয়েছে; এইবার সেইটা করবার সময় এসেছে।

তৎপরে মহেশ লেডী ডাক্তার সরোজিনীকে জানাইলেন, যে বর্ত্তমান শিল্পাশ্রমের সন্নিকটে তাঁহার স্বর্গীয়া জননীর নামে জগদ্ধাত্রী-সদন বলিয়া একটী বাড়ী নির্ম্মাণ করিবার ইচ্ছা আছে; তাঁহার নিজের ব্যয়ে সে বাড়ী নির্ম্মাণ করিবেন; নিরাশ্রয় অসহায় বিধবাদিগকে তাহাতে রাখিয়া তাহাদিগকে শিক্ষা দেওয়া হইবে, কাজ শেখান হইবে, স্বাবলম্বনের পথ দেখাইয়া দেওয়া হইবে। সরোজিনীর কাছে যে বিধবাটী আসিয়াছে সে এখন তাঁহার কাছেই থাক্, তার ব্যয়ভার মহেশ নিজে বহন করিবেন; বাড়ীটা প্রস্তুত হইয়া গেলে সে সেই বাড়ীতে আসিয়া থাকিবে; সে তাঁহাদের প্রথম বিধবা।

সরোজিনী। আমাকে আপনি 'আপনি আপনি' করেন কেন? আমি যে ক্ষীরদার সমবয়স্ক ও বন্ধু। যাক ও কথা, তার ব্যয় আপনি দেবেন সে কিরূপ? আমি কি সে ভার নিতে পারি না? সেটা কি আমার পক্ষে এতই ভার?

মহেশ। কথাটা কি জান, জগদ্ধাত্রী-সদন যখন খোলা হবে তখন "জগদ্ধাত্রী ফণ্ড" নামে একটা ফণ্ড থাকবে; তা হতে বিধবাদের ব্যয় নির্ব্বাহ করা হবে; সে ফণ্ড আমি যোগাব; সাধারণের কাছে চাঁদা আদায় করব না; এই বিধবাটিকে ব্যয় দিতে চাচ্ছি সেই "জগদ্ধাত্রী ফণ্ড" হতে; কাজটা এখনি আরম্ভ হলো এই আর কি; জননী-দেবীর নামে অধম পুত্রের দান এখন হতেই আরম্ভ হোক!

সরোজিনী। এমন অধম পুত্র যেন সকল মায়ে পায়!

সারদাসুন্দরী। ঠিক বলেছ! এমন ছেলে কটা মায়ে পায়?

মহেশ আর স্থির থাকিতে পারিতেছেন না, প্রশংসা তাঁর ভাল লাগিতেছে না, উঠিবার উপক্রম করিতেছেন।

ক্ষীরদা। তোমরা ওসব কথা বোলো না, উনি পালাবেন। (মহেশের প্রতি) ও গো, বসো বসো, একটা কথা আছে।

মহেশ। (আসনে ধীর ভাবে বসিয়া) কি কথা?

ক্ষীরদা। কথাটা কি জান, কৃপাত এণ্ট্রান্সে বোধ হয় ফেল হয়ে গেল! সে যে বাড়ীতে আসচে, যদি ফেল হয়, তাকে কি আর কলকেতায় পাঠাবে?

মহেশ। সে কথা তোমার সঙ্গে আর এক সময়ে হবে; তার বিষয়ে আমি একটা ভেবে রেখেছি পরে বলবো।

ইহার পরে সরোজিনী চলিয়া গেলেন; মজলিস ভাঙ্গিয়া গেল; মহেশ আফিসে বাহির হইয়া গেলেন।

জগদ্ধাত্রী-সদনের ভাবটা ক্রমেই গড়িয়া উঠিতে লাগিল; তাহা মহেশের হৃদয়কে প্রবলরূপে অধিকার করিল; তিনি সে সদন নির্ম্মাণের সমুদয় ব্যয় নিজে দিবেন, এবং "জগদ্ধাত্রী ফণ্ড" স্থাপন করিয়া বিধবাদের ভরণ পোষণের ব্যয় নিজে বহন করিবেন, এই সঙ্কল্পে দৃঢ় রহিলেন। কিন্তু শিবাশ্রমের সন্নিকটে বাড়ী নির্ম্মাণ করিতে হইলে, বাবু দেবীপ্রসাদের পরিবারদিগের নিকট হইতে জমি ক্রয় করিয়া লইতে হইবে; তাঁহারা কি জমি বেচিবেন?—তিনি এই চিন্তাতে মগ্ন হইতে লাগিলেন। তাঁহার সহায় ও হিতৈষিণী আছেন গৃহিণী ঠাকুরাণী; একদিন তাঁহার সঙ্গে কথা কহিবার জন্য গেলেন; মহেশ নিজের ব্যয়ে জগদ্ধাত্রী-সদন নামে বিধবাদের জন্য একটী বাড়ী নির্ম্মাণ করিবেন শুনিয়া, গৃহিণী ঠাকুরাণী

বলিয়া উঠিলেন,—"বাঃ ছেলেত বটে! এমন ছেলে কটা হয়? কিন্তু আপনি কি এত ব্যয় নির্ব্বাহ করতে পারবেন?"

মহেশ। খুব বড় বাড়ী বা দোতালা বাড়ী করব না; বিধবা ত অধিক জুটবে না; পাঁচ ছয়টা ঘর থাকলেই হবে; মনে করছি টালি খোলা দিয়ে সুন্দর স্বাস্থ্যকর একতলা একটী বাড়ী করব; হিসাব করে দেখা গিয়েছে, তিন হাজার টাকাতেই হবে।

গৃহিণী ঠাকুরাণী। আপনি কি এত টাকা যোগাতে পারবেন?

মহেশ। আপনাদের কৃপায় তা পারব; সে ত আপনাদেরই টাকা।

গৃহিণী ঠাকুরাণী। বাড়ীটা করবেন কোথায়?

মহেশ। সেই কথাই কইতে এসেছি; শিল্পাশ্রমের জন্যে আপনারা যে বাড়ী দিয়েছেন, তার গায়েই জমি পড়ে আছে; সেই জমি খানিকটা আমাকে যদি বিক্রয় করেন, তাহলে সেই জমিতে করতে পারি; বাবু গোপাললাল ও বাবু দেবীপ্রসাদের সঙ্গে কথা হয়েছে, তাঁরা বিক্রয় করতে রাজি আছেন; এখন কেবল আপনার মত পেতে চাই।

গৃহিণী ঠাকুরাণী। সে কি রকম কথা! আচ্ছা আপনার যদি একজন বোন থাকতেন, তিনি যদি আপনার সঙ্গে জুটে একটু জমি দিতেন, তাহলে কি আপনি নিতেন না? আপনার মাকে আমি শ্রদ্ধা ভক্তি করতাম, আপনাকে নিজের ভাইএর মত দেখি; আমাকে একটু জমি দিতেও দেবেন না!

মহেশ। আর আমার কথা নেই; আপনার কাছে ত সর্ব্বদাই হেরে যাই।

ইহার পরেই শিল্পাশ্রমের পশ্চাতে, কয়েক কাঠা জমি দান-পত্রে পাইয়া, মহেশ সেই ভূমি খণ্ডের উপর অনাথাশ্রম-সদন নির্ম্মাণে প্রবৃত্ত হইলেন। উঁচু প্লোরের উপর, এক এক গৃহে চারিজন করিয়া মেয়ে

থাকিতে পারে, এরূপ বড় বড় সুন্দর ছয়টী গৃহ নির্ম্মিত হইতে লাগিল। তদ্ভিন্ন একটী বৈঠক ঘর, একটী পাঠাগার, একটী সাধন-গৃহ, একটী রন্ধনশালা, একটী ভাঁড়ার ঘর, একটী ভোজনগৃহ—এ সকলের বন্দোবস্ত করা হইল; তৎপরে ঘরগুলি সুন্দর টালি খোলার দ্বারা আবৃত করিয়া বাসোপযোগী করা হইল; সম্মুখের উঠানে বাগান, পশ্চাতে বাগান, দক্ষিণে বামে বাগান, চারিদিকে বাগানের ব্যবস্থা করা হইল।

একদিকে বাড়ীটীর নির্ম্মাণ কার্য্য চলিতে লাগিল, অপর দিকে জগদ্ধাত্রী-সদন চালাইবার কিরূপ বন্দোবস্ত হইবে, ব্যয় কিরূপে নির্ব্বাহ হইবে, এই সকল আলোচনা চলিল; অবশেষে স্থির হইল, যে, সারদা-সুন্দরী ও বিন্ধ্যবাসিনী গিয়া জগদ্ধাত্রী-সদনের ভার লইয়া সেখানে থাকিবেন।

এইরূপে সমুদয় পরামর্শ স্থির করিয়া, একদিন বন্ধুবান্ধবদিগকে ডাকিয়া, ভগবানকে ধন্যবাদপূর্ব্বক, মহেশ জগদ্ধাত্রী-সদনের দ্বার খুলিলেন। সেদিন জগদ্ধাত্রীদেবীর ছবি সে ভবনে লইয়া যাওয়া হইয়াছিল; মেয়েরা ধরিয়া বসিলেন জগদ্ধাত্রী দেবীর ছবিটা সেখানে থাকা চাই; মহেশ বলিলেন "সেখানা মার পূজার ঘরের ছবি, আর এক-খানা ছবি করাইয়া তোমাদের দেওয়া হবে"। তদনুসারে আর একখানা ছবি করাইয়া দেওয়া হইল; সেখানা জগদ্ধাত্রী-সদনে সাধনগৃহে স্থাপিত হইল।

মহেশ ডাক্তার ভদ্র ও নিস্তারিণীকে জগদ্ধাত্রী-সদনের প্রতিষ্ঠার দিনে উপস্থিত থাকিবার জন্য নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। ডাক্তার ভদ্র হাস-পাতালের কাজে ব্যস্ত থাকাতে আসিতে পারেন নাই; নিস্তারিণী আসিয়া কয়েকদিন ক্ষীরদা ও কৃপার সঙ্গে বাস করিয়া গেলেন। এই কয়দিনের মধ্যে এক রবিবার বৈকালে নিস্তারিণী মহেশ ও সারদাসুন্দরীর

সঙ্গে কলকারখানায় বিবাহিত বিধবাদ্বয়কে দেখিতে গেলেন; তাঁহাকে দেখিয়া তাহাদের যেন আনন্দের আর সীমা পরিসীমা রহিল না; আরও কয়েকটী বিধবা বিবাহ করিবে বলিয়া তাঁহাকে সংবাদ দিল; তিনি তাহাদিগকে খুব উৎসাহ দিয়া আসিলেন।

এদিকে সারদাসুন্দরী ও বিন্ধ্যবাসিনী বদ্ধপরিকর হইয়া জগদ্ধাত্রী-সদনের কাজে লাগিলেন। সরোজিনীর বাড়ী হইতে মেয়েটীকে আনিয়া সেই সদনে স্থাপন করা হইল। তাঁহার মেয়ে দুটীর একটীর নাম নলিনী, অপরটীর নাম ননীবালা, ছেলেটীর নাম মুনীন্দ্র; তাহাদের তিন জনকে মহেশ আনিয়া নিজভবনে স্থাপন করিলেন। মেয়ে দুটী বীণাপাণির সহিত শিল্পাশ্রম-সংলগ্ন বালিকা-বিদ্যালয়ে পড়িতে যাইতে লাগিল; তাহাতে মাতার সহিত তাহাদের প্রতিদিন সাক্ষাৎ হইতে লাগিল; মুনীন্দ্রকে মহেশ স্কুলে দিলেন; সে স্কুল হইতে ফিরিবার সময় জননীর সঙ্গে দেখা করিয়া আসিত; তাহাদের লেখাপড়া ও কাজকর্ম্ম শিখিয়া বাহির না হওয়া পর্য্যন্ত তিন চারি বৎসর এই ভাবেই কাজ চলিবে এই-রূপ স্থির হইল।

নলিনী, ননীবালা ও মুনীন্দ্রকে দেখিবার ভার প্রধানরূপে প্রবোধের উপরেই পড়িল। মুনীন্দ্র তাঁহারই ঘরের একপার্শ্বে স্থান পাইল; তাঁর সঙ্গে খায়, তাঁর সঙ্গে ঘুমায়, তাঁর সঙ্গে বেড়ায়; তাহাতে ছেলেটীর বড়ই কল্যাণ হইতে লাগিল। নলিনী ও ননীবালা উপরে ক্ষীরদার পার্শ্বের ঘরে স্থান প্রাপ্ত হইল; এবং বীণাপাণির খেলার ঘরের সঙ্গিনী হইল। প্রবোধ বীণাপাণির সহিত তাহাদিগকেও পড়াইতে লাগিলেন। ওদিকে অল্পদিনের মধ্যে জগদ্ধাত্রী-সদনে আরও তিন চারিটি বিধবা আসিয়া জুটিল; তাহাদিগকে লইয়া সারদাসুন্দরী ও বিন্ধ্যবাসিনী কাজে মগ্ন হইলেন।

কৃপার বিষয়ে ক্ষীরদা যে আশঙ্কা করিয়াছিলেন সৌভাগ্য-ক্রমে তাহা ঘটিল না ; সে এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইল, কিন্তু তৃতীয় বিভাগে ; জগদ্ধাত্রী-সদনের প্রতিষ্ঠার সময় তাহাকে নিস্তারিণীর সঙ্গে আনা হইয়াছিল ; সে আসিয়া বাড়ীতে দুইটী নূতন মেয়ে পাইয়া বড়ই আনন্দিত হইল এবং পড়াশুনার জন্ত তাহাদিগকে উৎসাহিত করিয়া তুলিল। মহেশ তাহার বিষয়ে গুরুতর চিন্তায় পড়িলেন ; একবার মনে হইল তাহাকে আর কলিকাতায় পাঠাইবেন না, বাড়ীতেই রাখিয়া ক্ষীরদার সহকারিণী ও বীন্নাপাণির তত্বাবধায়িকা করিয়া দিবেন ; কিন্তু গুপ্ত মহাশয়ের পত্নীর এক পত্র পাইয়া সে সঙ্কল্প ত্যাগ করিলেন ; তিনি লিখিয়াছেন, "কৃপাকে আমাদের বাড়ীতে পাঠান ; তাহার পড়াশুনার প্রতি বিশেষ মন রাখব এবং যাতে ভবিষ্যতে পরীক্ষাতে আরো ভাল হয় তা করবো" ; মহেশ ক্ষীরদার সহিত পরামর্শ করিয়া তাহাকে কলিকাতায় গুপ্তমহাশয়ের ভবনে পাঠাইলেন।

এদিকে কয়েকমাস পরেই প্রবোধ বি-এ পরীক্ষাতে প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হইলেন ; তাঁর পড়াশুনাতে বড় মনোযোগ ; তিনি নানা কাজের মধ্যে যে প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হইতে পারিয়াছেন এজন্ত সকলের আদর ও অভ্যর্থনা পাইলেন ; কিন্তু সংবাদ পাওয়া গেল যে তিনি বহরমপুর কলেজের পরীক্ষোত্তীর্ণ যুবকদের মধ্যে তৃতীয় স্থান অধিকার করিয়াছেন ; এজন্ত তাঁহার মন সম্পূর্ণ আনন্দিত হইল না, কারণ তিনি বৃত্তি পাইলেন না ; তাঁহাকে এম-এ, দিবার জন্ত কলিকাতায় থাকিতে হইবে ; কোথায় থাকেন, কিরূপে ব্যয় নির্ব্বাহ করেন, এই সকল চিন্তা তাঁহার মনে উদয় হইতে লাগিল ; জগদ্ধাত্রী-সদন স্থাপনের পর আর মহেশের গলগ্রহ হইয়া কলিকাতায় থাকাটা ইচ্ছা করেন না ; অথচ কলিকাতায় থাইতেই হইবে ; মহেশ তাঁহার মনের এই ভাব বুঝিতে পারিয়া বলিলেন,

—"কি আশ্চর্য্য, তুমি ত আমাদের আপনার লোক, বাড়ীর ছেলে! আমাদের কত সেবা করেছ; তোমার জন্ম সামান্য ব্যয় করা আমার পক্ষে কিছুই নয়"। যাহা হউক প্রবোধের প্রথম শ্রেণীতে বি-এ, পাশের সংবাদ পাইয়া মহেশের বন্ধু গুপ্তমহাশয় লিখিলেন, যে প্রবোধকে তাঁহারা নিজভবনে রাখিবেন এবং তাঁহার সকল ভার বহন করিবেন, সে যেন তাহাতে অমত না করে; যদি পরের উপর ভার-স্বরূপ হইতে তার মনে বাধে, তাহা হইলে ছেলেদের পড়ানোর ভার তাহার উপরে দিবেন। প্রবোধের চিন্তার কারন ঘুচিয়া গেল; কলিকাতায় গিয়া গুপ্তমহাশয়ের ভবনে থাকা স্থির করিলেন।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

কৃপা ও প্রবোধ আসিয়া কলিকাতায় গুপ্তমহাশয়ের ভবনে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। প্রবোধ একটী নীচের ঘর আশ্রয় করিলেন। নিরুপমা ও কৃপা সে ঘরটীকে টেবল, চেয়ার, আলনা, আয়না, ছবি প্রভৃতি দিয়া সুন্দররূপে সাজাইয়া দিলেন; সে ঘরটী বাড়ীর পূর্ব্বদিকের ঘর; তার বাহিরেই কর্ত্রীঠাকুরাণীর স্বহস্ত-রোপিত সুন্দর বাগান; নানা স্থান হইতে আনীত বৃক্ষলতাতে পূর্ণ, দেখিলে চক্ষু জুড়াইয়া যায়! বাগানের মধ্যস্থলে একটী গোলাকৃতি, শান দিয়া বাঁধান, বসিবার স্থান আছে; সে স্থানটী অতি সুন্দর ও উৎকৃষ্ট ফলফুলের গাছ ও লতা পাতার দ্বারা ঘেরা; উপরে লোহার চাল, তাহাও সুন্দর ফুলের লতার দ্বারা আবৃত! এই ঘরের মধ্যে মনোরমা ঠাকুরাণী, বন্ধুবান্ধবদিগকে লইয়া বসিয়া থাকেন। প্রাতে উঠিয়া প্রবোধের গৃহের জানালাতে দাঁড়াইলেই উদীয়মান সূর্য্যের অরুণ কান্তি নয়নগোচর হয়; এবং নিকটস্থ বৃক্ষসমূহে নানাজাতীয় পক্ষীর সুস্বর শুনিয়া কর্ণ জুড়াইতে থাকে! বাগানটী মনোরমা ঠাকুরাণীর সৌন্দর্য্য-বোধশক্তির ও উদ্ভিদ-বিদ্যানুরাগের উজ্জ্বল দৃষ্টান্তস্বরূপ! এক এক দিন প্রাতে প্রবোধ বাগান দেখিয়া যেন মগ্ন হইয়া যান! আর যেন চক্ষু তুলিতে পারেন না।

এই সুন্দর ঘরে প্রতিষ্ঠিত হইয়া প্রবোধ ইংরাজীতে এম-এ দিবার সঙ্কল্প করিয়া পাঠে মনোনিবেশ করিলেন। তিনি প্রাতে বীরেন ও ও ধীরেনকে নিজের ঘরের একপার্শ্বেই পড়িতে বসান, এবং নিজের পাঠের মধ্যেই তাহাদের পাঠে সাহায্য করেন। তাহারা এরূপ চোখে

চোখে কখনও থাকে নাই; তাহাদের দিন দিন উন্নতি হইতে লাগিল। বৈকালে কলেজ হইতে আসিয়া কিঞ্চিৎ জলযোগের পর প্রবোধ একটু বেড়াইয়া আসেন; আসিয়াই সুরমা ও রূপাকে লইয়া বসিয়া যান। রূপার উপরে তাঁর প্রধান দৃষ্টি। রূপাকে তিনি বলিয়াছেন—"তুমি তৃতীয় বিভাগে এণ্ট্রান্স পাশ করেছ, তাতে আমি দুঃখিত আছি; আমি মনে করেছিলাম, তুমি ভাল করে পাশ করবে, স্কলাসিপ পাবে, মহেশবাবুর ও গুপ্তমহাশয়ের মাথার বোঝা তুলে নেবে, কিন্তু তা হোলো না, তুমি সকলের পিছনে পড়লে! যা হোক, যা হবার হয়েছে; এখন ত আমি এ বাড়ীতে রইলাম, তুমি প্রাতে ও সন্ধ্যাতে আমার ঘরে বসে পড়বে; আমি তোমার পড়াশুনা দেখব; যাতে এল, এ, পরীক্ষাতে প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হও তা করবো।"

রূপা বলিল, "প্রবোধ দা! তুমি ত এ বাড়ীতে রইলে, এইবার আমার বিশেষ সাহায্য হবে; তোমার কাছে বসে আমি পড়বো, তুমি যা যা করতে বলবে তাই করবো, তা হলে আমার সকল দিকে ভাল হবে।

প্রবোধ। লক্ষ্মি মেয়ে! সাধে তোমাকে ভালবাসি, তোমার উন্নতির খুব ইচ্ছা আছে; এতদিন তেমন করে দেখবার লোক পাওনি তাই তেমন ভাল হয়ে দাঁড়াতে পারনি, এইবার আমি দেখব।

রূপা। প্রবোধ দা! তোমাকে কাছে পেয়ে আমার কি আনন্দই হচ্চে।

ইহার পর রূপা প্রবোধের ঘর আশ্রয় করিয়াছে; বীরেন ধীরেনের টেবলের ন্যায় একপার্শ্বে রূপার জন্য আর এক টেবল দেওয়া হইয়াছে; রূপা তাহাতে আপনার পুস্তকাদি সাজাইয়াছে; এবং প্রাতে ও সন্ধ্যাতে সেখানে বসিয়া মনোযোগপূর্ব্বক পড়ে; পড়িতে পড়িতে মাথা তুলিয়া চাহিয়া দেখে, প্রবোধ পাঠে একেবারে নিমগ্ন, যেন তিনি এ জগতে নাই!

যেটা বড় কঠিন লাগে, বুঝিতে পারে না, উঠিয়া গিয়া প্রবোধকে জিজ্ঞাসা করে; প্রবোধের পাঠানুরাগ ও আত্মোন্নতির স্পৃহা দেখিয়া তাহার মনে আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন আসিতেছে! নিজের ভাব বদলাইবার জন্য দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ হইয়াছে।

প্রবোধ এ বাড়ীতে আসার পর আর একজনের মনে ও ব্যবহারে বিশেষ পরিবর্ত্তন দেখা যাইতেছে! তিনি গুপ্তমহাশয়ের প্রথমা কন্যা নিরুপমা। নিরুপমাকে গুপ্তমহাশয় এন্ট্রান্স প্রভৃতির জন্য প্রস্তুত করেন নাই; কিন্তু শিক্ষক নিযুক্ত করিয়া ও নিজে উৎসাহ দিয়া উত্তমরূপ ইংরাজী ও বাঙ্গলা শিখাইয়াছেন; মনোরমা ঐ দুই ভাষাতে পরিপক্ক; উত্তমরূপ লিখিতে পারেন; ঐ দুই ভাষায় রাশি রাশি বই পড়িয়াছেন; বিশেষতঃ বাঙ্গালা সাহিত্যে বিশেষ অভিজ্ঞ। প্রবোধ এই বাড়ীতে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর মনোরমারও মনে পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। অগ্রেই বলিয়াছি প্রবোধ বি-এ পরীক্ষাতে ইংরাজী ভাষাতে বিশেষ পারদর্শিতা দেখাইয়াছেন; পরীক্ষাতে উত্তীর্ণ ছাত্রদের মধ্যে তৃতীয় স্থান অধিকার করিয়াছেন। কিন্তু ইংরাজী ভাষাতে সুদক্ষ হইলেও তাঁর আর দুইটী বিষয়ে মনের বিশেষ নিষ্ঠা আছে। তিনি মহেশের ও ন্যায়রত্ন মহাশয়ের সংশ্রবে থাকিয়া সংস্কৃত-বিদ্যানুরাগী হইয়াছেন; তদ্ভিন্ন মনোরমা ঠাকুরাণীর প্রভাবে সৌন্দর্য্য-বোধশক্তিতে এবং পদার্থ-বিদ্যানুরাগে বিশেষ অগ্রসর হইয়াছেন। তিনি যেখানে যান, নিরুপমার ন্যায় গাছপালা সংগ্রহ করিয়া উদ্ভিদবিদ্যার আলোচনাতে নিযুক্ত হন। এখানে আসিয়া গৃহের কর্ত্রীঠাকুরাণীর প্রতিষ্ঠিত বাগানটী পাইয়া তাঁর উদ্ভিদবিদ্যা আলোচনার বড় সুবিধা হইয়াছে; এ বিষয়ে নিরুপমার সহিত তাঁহার সর্ব্বদা কথা হয়; গাছপালা আনিয়া নিরুপমাকে দেখান; তাঁহার নিকট অনেক তত্ত্ব বুঝিয়া লন, তাঁহাকেও বুঝাইবার চেষ্টা করেন;

নিরুপমা প্রবোধকে দিয়া অনেকগুলি উদ্ভিদবিদ্যাবিষয়ক গ্রন্থ আনাইলেন; এবং সেই সকল গ্রন্থপাঠে ও গাছপালা পরীক্ষাতে মনোনিবেশ করিলেন। কেবল তাহা নহে, বঙ্গসাহিত্য বিষয়ে তাঁর বিশেষ অভিজ্ঞতা ত আছেই, তদুপরি প্রবোধের সংশ্রবে আসিয়া তাঁহার সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করিবার বাসনা প্রবল হইয়া উঠিল; তিনি পিতাকে বলিয়া একজন সংস্কৃতভাষা-পারদর্শী পণ্ডিত নিযুক্ত করিলেন; পণ্ডিত মহাশয় প্রাতে আসিয়া প্রবোধের পার্শ্বের ঘরে বসিয়া নিরুপমাকে সংস্কৃত পড়াইতে লাগিলেন; প্রবোধও সংস্কৃত বিদ্যাবিষয়ে পণ্ডিত মহাশয়ের সাহায্য পাইতে লাগিলেন।

প্রবোধের উদ্যোগে ও কর্ত্রীঠাকুরাণীর সাহায্যে আরও দুইটী নিয়ম প্রতিষ্ঠিত হইল। প্রথম, প্রবোধ এই নিয়ম করিলেন যে মধ্যে মধ্যে রবিবার প্রাতঃকালের আহার ও বিশ্রামের পর তিনি নিরুপমা, সুরমা ও রুপাকে সঙ্গে করিয়া বোটানিক্যাল গার্ডেনে যাইবেন এবং সন্ধ্যাপর্য্যন্ত সেখানে গাছপালা পরিদর্শন করিবেন। অগ্রেই বলিয়াছি কোম্পানির বাগানটী পূর্ব্ব হইতেই কর্ত্রীঠাকুরাণীর প্রিয় স্থান; তিনি মধ্যে মধ্যে সন্তানদিগকে লইয়া সেখানে গিয়া থাকেন; সুতরাং এই প্রস্তাবে তিনি আনন্দের সহিত সম্মত হইলেন; এবং মধ্যে মধ্যে ছেলে মেয়েদিগকে লইয়া তাহাদের সঙ্গে যাইতে লাগিলেন। ইহাও এখানে উল্লেখযোগ্য, যে প্রবোধ ও নিরুপমা বাগানে একসঙ্গে বেড়াইবার ও নানা বিষয়ে মুক্তচিত্তে আলোচনা করিবার সুবিধা পাইয়া বড়ই আনন্দিত হইতে লাগিলেন।

প্রবোধের প্রবর্ত্তিত দ্বিতীয় নিয়মটী এই; তিনি নিয়ম করিলেন যে প্রতিদিন সায়ংকালীন উপাসনার পর, আহারের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত, আধ-ঘণ্টার অধিক কাল, তাঁহার ঘরে বসিয়া, ছেলেমেয়েদিগকে নানাদেশীয় ও

নানাযুগের ভক্ত সাধুদের জীবনচরিত পড়িয়া শুনাইবেন; তৎপরে আহারে বসিয়া সে বিষয়ে একটু আলোচনা হইবে। এইরূপে স্বদেশ বিদেশের ভক্ত সাধু মহাজনগণের এবং নানক, কবীর, চৈতন্য প্রভৃতি ভক্তগণের সংক্ষিপ্ত জীবনচরিত যখন পঠিত ও ব্যাখ্যাত হইতে লাগিল, তখন কি এক অপূর্ব্বভাবের উদয় হইতে লাগিল! বাড়ীর হাওয়া যেন বদলাইয়া যাইতে লাগিল! ছেলে মেয়েদের মনে একপ্রকার গাম্ভীর্য্য ও ভক্তিভাব দেখা দিতে লাগিল। গুপ্তমহাশয় ও তাঁহার গৃহিণী এই সভাতে উপস্থিত থাকিয়া এমনি মুগ্ধ হইতে লাগিলেন, যে প্রতিদিন আসিয়া সেই গৃহে বসিতে লাগিলেন। বিশেষতঃ কর্ত্রীঠাকুরাণীর ভাব দেখিয়া প্রবোধের মন চমৎকৃত হইতে লাগিল? অনেকদিন এরূপ হয় যে প্রবোধ মুখ তুলিয়া তাঁহার দিকে চাহিলেই দেখিতে পান যে তিনি বস্ত্রাঞ্চলে চক্ষু মুছিতেছেন। প্রবোধের সর্ব্বাপেক্ষা সুখের বিষয় এই যে নিরুপমার ধর্ম্মভাব দিন দিন জাগিয়া উঠিতে লাগিল! নিরুপমা প্রাতে ও রাত্রে শয়নের পূর্ব্বে ভক্তিভরে ঈশ্বরচরণে প্রার্থনা আরম্ভ করিলেন; এবং প্রবোধের নিকট হইতে সাধু ও সাধ্বীদের চরিত চাহিয়া লইয়া দুপুরবেলা মনোযোগপূর্ব্বক পাঠ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। কি বিনয়, কি সৌজন্য, কি স্বার্থনাশের বাসনা, নিরুপমার মনে জাগিতে লাগিল! তিনি পূর্ব্বে সকল সময় পিতামাতার সঙ্গে কেশব-চন্দ্র সেনের ভবনে ব্রহ্মোপাসনাতে যাইতে চাহিতেন না; কিন্তু তাঁহার হৃদয়ে কি নবভাব আসিল যাহাতে তিনি রীতিমত সে উপাসনাতে যাইতে লাগিলেন।

এইরূপে গুপ্তমহাশয়ের ভবনে প্রবোধের দিন সুখেই কাটিতে লাগিল। তাঁহার এম্.এ, পরীক্ষার দিন নিকটে আসিতেছে দেখিয়া, গৃহিণীর পরামর্শে, গুপ্তমহাশয় বীরেন ও ধীরেনকে পড়াইবার ভার তাঁহার

উপর হইতে তুলিয়া লইলেন; এবং সুরমা ও রমার মাষ্টারের উপর তাহাদের পড়া দেখিবার ভার দিলেন। কৃপা প্রবোধের হাতেই রহিল। গুপ্ত মহাশয় সে ভারটাও তুলিয়া লইতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু প্রবোধ তাহা করিতে দিলেন না; বলিলেন—"কৃপার কোন্ বিষয়ে কি করা দরকার আমি বুঝে নিয়েছি, ওকে আমিই ভাল করে দেখতে পারব।"

ইহার কিছুদিন পরে আর এক কাজের সূত্রপাত হইল। বলা বাহুল্যমাত্র যে প্রবোধ কলিকাতায় আসিয়াই গুপ্তমহাশয়ের সঙ্গে কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়ের ভবনে সঙ্গত-সভায় যাইতেছেন এবং নিয়মমত তাঁহাদের মন্দিরে উপাসনাতে উপস্থিত হইতেছেন; সঙ্গত-সভাতে কতিপয় ধর্ম্মানুরাগী যুবকের সহিত তাঁহার পরিচয় হইয়াছে; ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ তাঁহার সহিত ধর্ম্মালাপ করিবার জন্য গুপ্তমহাশয়ের ভবনে যাতা-য়াত আরম্ভ করিয়াছেন; তাঁহারা প্রাতে ও সন্ধ্যাতে আসেন, যখন তখন আসেন, তাঁহাদের সহিত আলাপে অনেক সময় যায়, প্রবোধের পড়া-শুনার ক্ষতি হয়, এইজন্য প্রবোধ তাঁহাদের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া স্থির করিলেন যে শনিবারের বৈকালটা বন্ধুগণের সহিত ধর্ম্মালাপের জন্য রাখা হইবে। তাহার ফল এই হইল, যে, ধর্ম্মালাপ-প্রয়াসী যুবকের সংখ্যা বাড়িয়া গেল; এবং তাঁহারা শনিবার বৈকালে নিয়মমত আসিতে লাগিলেন; যেন আর একটা সঙ্গত-সভার অধিবেশন আরম্ভ হইল! যুবকবন্ধুগণ সমবেত হইলে, প্রবোধ সপ্তাহের মধ্যে যে যে ধর্ম্মগ্রন্থ পড়িয়াছেন এবং যে যে স্থান বড় ভাল লাগিয়াছে তাহা বলেন, এবং পাঠ করিয়াও শুনান; তৎপরে সমবেত বন্ধুদের মধ্যে যাঁর মনে যে ধর্ম্মচিন্তা প্রবল আছে তিনি তাহা ব্যক্ত করেন; হৃদয়ে হৃদয়ে সম্মিলন হইয়া মহোৎসাহের উদয় হয়, এবং সকলেই আপনাকে লাভবান মনে

করিয়া গৃহে প্রতিনিবৃত্ত হন। এই যুবকদলের মধ্যে একজনের সহিত প্রবোধ ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তাসূত্রে বদ্ধ হইলেন। তাঁহার নাম ক্ষিতীশচন্দ্র সেন। ইনি দূর পারিবারিক সম্বন্ধে কলুটোলার সেন পরিবারের সহিত সম্বদ্ধ। এই যুবকটী সেই বারে বি-এল, পরীক্ষাতে উত্তীর্ণ হইয়া গবর্ণমেণ্টের অধীনে একটী মুনসেফী কর্ম্ম পাইবার জন্ম দরখাস্ত করিয়াছেন। তাঁহার একজন পদস্থ আত্মীয় তাঁহার হইয়া সেই চেষ্টা করিতেছেন। প্রবোধ আপনার সকল কথা ক্ষিতীশকে বলিয়াছেন; বহরমপুরে মহেশের কার্য্যাদির কথা শুনাইয়াছেন; ইতিমধ্যে একবার সঙ্গে করিয়া বহরমপুরে লইয়া গিয়া মহেশের সঙ্গে পরিচিত করিয়া আনিয়াছেন; এবং মহেশের ভগিনীও নিজের প্রিয় বালিকা বলিয়া কৃপাকেও নিকটে ডাকিয়া তাঁহার সহিত আলাপ পরিচয় করিয়া দিয়াছেন। ক্ষিতীশ এ বাড়ীতে আসিলেই কৃপার কাছে গিয়া বসেন; একটা সুন্দর জিনিস কিছু পাইলেই কৃপাকে আনিয়া দেন; এবং প্রায় প্রতিদিন বৈকালে আসিয়া কৃপার সঙ্গে বাগানে বেড়ান। কৃপা যে তাঁর প্রধান আকর্ষণের বিষয় তাহা বুঝিতে বাড়ীর লোকের বাকি থাকিতেছে না; কৃপাও তাঁর সঙ্গে মিশিতে ও কথা কহিতে ভালবাসে; কেবল তাহা নহে; কর্ত্রীঠাকুরাণী নিজের সন্তানদিগকে তাঁহার সহিত পরিচিত করাইয়া দিয়াছেন। এইরূপে ঐ বাড়ীটী ক্ষিতীশচন্দ্রের একটী প্রিয়স্থান হইয়া উঠিয়াছে।

প্রবোধের অপরাপর যুবক বন্ধুরা শনিবার বৈকালে আসেন; কিন্তু ক্ষিতীশের সম্বন্ধে সে নিয়ম নাই; ক্ষিতীশ যখন ইচ্ছা এবাড়ীতে পদার্পণ করেন, এবং পরিবারস্থ ব্যক্তিদিগের সহিত বাক্যালাপেও হাস্য পরিহাসে আনন্দে কালযাপন করেন। শুক্রবার বৈকালে যখন সঙ্গীতসম্মিলনে মহিলাগণের সমাগম হয়, তখন অনেকদিন ডাক্তার ভদ্রের ভবন হইতে নিস্তারিণীও আসিয়া থাকেন। সেই সূত্রে গৃহের কর্ত্রীঠাকুরাণীর উদ্যোগে

নিস্তারিণীর সঙ্গেও ক্ষিতীশের আলাপ পরিচয় ও আত্মীয়তা হইয়াছে। তাঁহাকে দেখিয়াও তাঁহার সহিত আলাপ করিয়াই নিস্তারিণী তাঁহার সবিশেষ বিবরণ সংগ্রহ করিয়াছেন; এবং ইহা তাঁহার বুঝিতে বাকি নাই যে কৃপা সে গৃহে তাঁর এক প্রধান আকর্ষণের বিষয়। কৃপা সতের আঠার বৎসরের মেয়ে; ছেলেটীর বয়স একুশ বাইশ বৎসর; তাঁহার পিতা একজন গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারী ছিলেন, পেনসন লইয়া বসিয়াছেন; মাতাঠাকুরাণীও বড় ধার্ম্মিকা নারী। তাঁহারা উভয়ে ব্রাহ্মসমাজে যোগ দেন নাই বটে, কিন্তু ব্রাহ্মসমাজের লোকেরা তাঁহাদের নিকট সুপরিচিত এবং তাহাদিগকে তাঁহারা ভালবাসেন; এবং ছেলে যে ব্রাহ্মসমাজের দিকে আকৃষ্ট হইয়াছে সেজন্য উভয়েই সন্তুষ্ট আছেন। এই কথা শুনিয়া নিস্তারিণীর মনে আশা হইয়াছে যে তাহা হইলে ক্ষিতীশের সঙ্গে কৃপার বিবাহ দেওয়া যাইতে পারে। এই ভাবটা মনে আসাতে তিনি গুপ্তগৃহিণীর সহিত পরামর্শ করিয়া একদিন ক্ষিতীশকে নিজভবনে যাইবার জন্য নিমন্ত্রণ করিলেন; এবং তাঁহার সহিত মন খুলিয়া কৃপার বিষয়ে কথাবার্ত্তা কহিলেন। ক্ষিতীশ তাঁহার সহিত কৃপার বিবাহের প্রস্তাব শুনিয়াই পুলকিত হইয়া উঠিলেন, বলিলেন—"আপনি যে প্রস্তাব করছেন তাতে আমার সম্পূর্ণ সম্মতি আছে; কৃপাকে কাছে পেলে আমি সুখী হব তাহাতে আর সন্দেহ নাই; কিন্তু আমার পিতা মাতাকে বলতে হবে এবং তাঁদের মত নিতে হবে; তাঁরা বড় ভাল লোক; ব্রাহ্মদের বড় ভালবাসেন; আমি যে কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়ের নিকট দীক্ষিত হয়েছি, তাতে তাঁরা আপত্তি করেন নি; খুব সম্ভব এ বিবাহে তাঁরা মত দেবেন; কিন্তু তাঁদের নিকট প্রস্তাব উপস্থিত করে কে? আমার লজ্জা করবে।"

নিস্তারিণী। আমি প্রবোধকে দিয়ে তোমার বাবাকে ধরবো; এবং

তোমার মার সঙ্গে যদি কোনওরূপে দেখা হয় তবে তাঁকে নিজে ধরবো।

ক্ষিতীশ। আচ্ছা, আর এক কাজ করলে হয়; আমি একদিন বৈকালে মাকে "চাঁদনীর হাঁসপাতাল দেখবে চল" বলে এখানে আনবো, তখন আপনি তাঁকে দেখতে পাবেন; নিজের ঘরে ডেকে নিয়ে যেয়ে দেখাবেন; এবং তাঁকে এই কথা বলবেন।

নিস্তারিণী। বাঃ, বেশ উপায় বের করেছ ত! তুমি কি বুদ্ধিমান ছেলে! আচ্ছা বেশ, তা হলে আর তোমার বাবার কাছে প্রবোধকে পাঠাবার প্রয়োজন নাই; আমি কৃপাকে এনে কয়দিনের জন্য আমার কাছে রাখব; তারি মধ্যে তোমার মাকে এন; এখনি ঠিক কর কবে আনবে।

তৎপরে কথাবার্ত্তা কহিয়া স্থির হইল যে দুইদিন পরে ক্ষিতীশ তাঁর মাতাঠাকুররাণীকে হাঁসপাতালে আনিবেন। নিস্তারিণী সেই দিনই সন্ধ্যার সময় সঙ্গীত-সম্মিলন হইতে ফিরিবার সময় কৃপাকে নিজেদের বাড়ীতে আনিলেন। কৃপা বেচারী কিছুই জানে না; তার জন্য যে ফাঁদ পাতা হইতেছে, তার কিছুই বুঝিতে পারিল না। নিস্তারিণী সেই দিন রাত্রেই আহারের পর নির্জ্জনে কৃপাকে লইয়া বসিয়া, ক্ষিতীশের প্রতি তার কি ভাব তাহা বুঝিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তখন যে কথাবার্ত্তা হইল তাহা এই :—

নিস্তারিণী। শুনেছি প্রতি শনিবার বৈকালে প্রবোধের কাছে কতকগুলি ছেলে আসে; তাদের সঙ্গে কি তোর আলাপ হয়েছে?

কৃপা। দু তিন জনের সঙ্গে প্রবোধ দাদা আলাপ করিয়ে দিয়েছেন; যখন তাঁরা আসেন আমি সে ঘরে থাকি না, উপরে চলে যাই।

নিস্তারিণী। যাঁদের সঙ্গে আলাপ হয়েছে, তাঁদের মধ্যে কাে সকলের চেয়ে ভাল মনে হয়?

কৃপা। সকলকে ত ভাল করে দেখবার সময় পাই না; কেব ক্ষিতীশ বাবুই সর্ব্বদা আসেন, তাঁকে বড় ভাল লোক মনে হয়।

নিস্তারিণী দেখিলেন, এই কথা বলিতে কৃপার মুখটা লাল হইয় উঠিল! যেন ঢোক গিলিয়া এই কথাগুলি বলিল। নিস্তারিণীর বুঝিতে বাকি রহিল না যে, কৃপার প্রাণেও প্রেম জাগিয়াছে। নিজের ভা গোপন করিয়া বলিলেন,—লোকে বলে, তোকে ভাল বাসেন বলেই ক্ষিতীশ সে বাড়ীতে এত আশা যাওয়া করেন; তোর কি মনে হয়?"

কৃপা। (মস্তক অবনত করিয়া, হাতের আঙ্গুলে আঙ্গুল বাঁধিয়া) আমারও তা মনে হয়।

নিস্তারিণী। তা হলে ক্ষিতীশ তোকে ভালবাসে?

কৃপা। হাঁ, ভালবাসেন।

সেদিন এই পর্য্যন্তই কথা হইল। নিস্তারিণী কৃপার নিকট বিবাহের প্রস্তাবটা উপস্থিত করিলেন না। ক্ষিতীশের মাতার সঙ্গে কথা কহিয়া, এবং তাঁহাকে কৃপাকে দেখাইয়া, তবে উপস্থিত করিবেন বলিয়া স্থির করিলেন।

দুই দিন পরে রবিবার বৈকালে ক্ষিতীশ তাঁহার জননী ও দুই ভগিনীকে সঙ্গে করিয়া হাঁসপাতাল দেখাইবার জন্য আসিয়া উপস্থিত। নিস্তারিণী ক্ষিতীশের জননী ও ভগিনীদ্বয়কে মহা সমাদরে অভ্যর্থনা করিয়া লইলেন; এবং কৃপাকে সঙ্গে করিয়া তাঁহাদিগকে লইয়া হাঁসপাতাল দেখাইতে লাগিলেন। ক্ষিতীশের জননী কৃপাকে দেখিয়া বলিলেন—বাঃ বেশ সুন্দর মেয়েটী ত! এটী কার মেয়ে?"

নিস্তারিণী। ও সম্পর্কে আমার বোন হয়; কয়দিনের জন্য আমাদের বাড়ীতে এসে আছে; আপনি ওকে কেমন দেখছেন?

ক্ষিতীশ-জননী। তাই ত বলছি, কি সুন্দর বড় বড় চোখ দুটী! কি সুন্দর নাক! মুখখানি যেন নিখুঁত! বেশ মেয়েটী ত কাছে পেয়েছেন!

নিস্তারিণী। (হাসিয়া) ও আমার ঘরে না থেকে যদি আপনার ঘরে গিয়ে থাকতো তাতে কি সুখী হতেন?

ক্ষিতীশ-জননী। তাতে কি সন্দেহ আছে! এমন মেয়ে ঘরে পেলে কে না সুখী হয়?

হাঁসপাতাল দেখান শেষ হইলে নিস্তারিণী ক্ষিতীশের মাতাকে আপনার শয়নঘরে আনিয়া বসাইলেন; এবং কৃপা ও ক্ষিতীশের ভগিনীদ্বয়কে কৌশলে বাগান ও বাড়ী দেখিবার জন্য সরাইয়া দিয়া, কৃপার সহিত তাঁহার পুত্রের বিবাহের প্রস্তাব উপস্থিত করিলেন ভদ্রলোকের মেয়ে এই প্রস্তাব শুনিয়া প্রথমে ইতস্তত: করিতে লাগিলেন; কারণ তাঁহারা বৈদ্যজাতীয়, মেয়ে ব্রাহ্মণ-কন্যা; ছেলে অসবর্ণ বিবাহ করিলে জ্ঞাতি কুটুম্ব কি বলিবে, লোকে এক-ঘরে করিবে, এ সকল চিন্তা করিতে লাগিলেন।

নিস্তারিণী তাঁহার মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া বলিলেন, আমি বুঝ্‌তে পেরেছি, জেতে জেতে বিবাহ হবে না, লোকে কি বলবে তাই আপনি ভাবছেন; কিন্তু আমি বলি আপনাদের ছেলে ত আর কিছু দিনের মধ্যে মুনসেফ হয়ে কোথাও গিয়ে বসবে, তখন আমার বোনকে নিয়ে যাবে; আপনারা যেমন আছেন তেমনি থাকবেন; লোকে কিছু বললে বলবেন—'কি করবো, ছেলে যাকে ভাল বেসেছে তাকেই বিয়ে করেছে, আমাদের মুখ ত রেখেনি'।

ক্ষিতীশ-জননী। ক্ষিতীশ কি মেয়েকে দেখেছে?

নিস্তারিণী। আপনারা ত সব কথা জানেন না; কৃপা যে বাড়ীতে থাকে, আপনার ছেলে সপ্তাহের অধিকাংশ দিন সেখানে যায়; আমর টের পেয়েছি যে ওকে দেখতেই যায়; ওকে খুব ভালবাসে।

ক্ষিতীশ-জননী। তবে আর আমাদের কথা কি? সে ত নিজে সব ঠিক করেছে! মেয়ে কি তাকে চায়?

নিস্তারিণী। হাঁ, মেয়েও তাকে ভালবাসে; তবে আপনাকে ন বলে তার কাছে বিয়ের প্রস্তাব করবো না বলে, তাকে এখনো বলি নাই; আপনার মত হলেই তাকে বলবো।

ক্ষিতীশ-জননী। আমার মতের জন্য আর অপেক্ষা কি? সব ত ঠিক হয়েছে!

নিস্তারিণী। ক্ষিতীশের মনের ভাব জেনেছি; সে মেয়েটীকে চায় বটে, কিন্তু আপনারা যদি অমত করেন, যদি সেজন্য মনে ক্লেশ পান, তা হলে এ কাজে সে সুখী হবে না, প্রাণে বড় ক্লেশ পাবে।

ক্ষিতীশ-জননী। না, না, সে যেন ক্লেশ না পায়; মেয়েটীকে যদি ভালবাসে তবে বিয়ে করুক; আমাদের বংশে এত নূতন কাজ নয়? আমার একজন ভাসুরপো এমনি একটা বিয়ে করেছে।

নিস্তারিণী। আপনি যে বিবাহে সম্মতি দিলেন, এতে আমি বড়ই সন্তুষ্ট হলাম; আমার বোনের সৌভাগ্য বলতে হবে! তবে আপনি ক্ষিতীশের বাবাকে এ কথা বুঝিয়ে বলবেন।

ক্ষিতীশ-জননী। তা বলবো, তিনি এমন অনেক বিয়েতে উপস্থিত থেকেছেন; তিনি আপত্তি করবেন না।

ইহার পরে সেইদিন রাত্রেই নিস্তারিণী কৃপার নিকট বিবাহের প্রস্তাব উপস্থিত করিলেন; এবং তাহার সম্মতি জানিয়া কবে বিবাহ হইবে ক্ষিতীশের সঙ্গে সেই পরামর্শে প্রবৃত্ত হইলেন। স্থির হইল যে,

ক্ষিতীশ মুনসেফী কাজে বসিলেই যাইবার সময় বিবাহ করিয়া কৃপাকে সঙ্গে লইয়া যাইবেন; ততদিন কৃপা তাঁহার বাড়ীতেই থাকিবে; ক্ষিতীশ আসিয়া মধ্যে মধ্যে দেখা করিবেন।

এইরূপেই কাজকর্ম্ম চলিল। নিস্তারিণী বহরমপুরে মহেশ ও ক্ষীরদাকে এই সংবাদ দিলেন; যথাসময়ে তাঁহাদের আনন্দ-সূচক পত্র পাইলেন। অতঃপর একদিন সন্ধ্যার সময় গুপ্ত পরিবারের বন্ধুদিগকে ডাকিয়া, ভগবানের নাম করিয়া দুইজনকে বাগ্দান-সূত্রে আবদ্ধ করা হইল। কৃপা হাসপাতাল ভবনে নিস্তারিণীর কাছেই রহিল; এবং ক্ষিতীশ আসিয়া দেখা করিতে লাগিলেন।

এই ঘটনার এক মাসের মধ্যেই ক্ষিতীশের নিয়োগপত্র আসিয়া উপস্থিত; তিনি মাসে আড়াই শত টাকা বেতনে যশোহর জেলায় এক সহরে মুনসেফের কাজ পাইয়াছেন। ইহার পরে নিস্তারিণীর ভবনেই কৃপার বিবাহ হইল।

প্রবোধ মহানন্দে বিবাহের আয়োজনে নিস্তারিণীর সাহায্য করিতে প্রবৃত্ত হইলেন; কৃপাকে বলিতে লাগিলেন,—"দেখ কৃপা! বোন! তোমাকে আর কাছে পাব না, সেটা একটা কষ্টের কথা, কিন্তু যে মানুষের সঙ্গে তোমার বিয়ে হচ্ছে সে আমার বন্ধু, সে খুব ভাল লোক; তুমি সুখী হবে ভেবে আনন্দ হচ্ছে। অতঃপর বিবাহান্তে প্রবোধ কৃপাকে কয়েকখানি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ ওএকটী মার্ব্বেলের বাক্স উপহার দিলেন।

মহেশ সপরিবারে সারদাসুন্দরীর সমভিব্যাহারে বহরমপুর হইতে আসিয়া কন্যাকর্ত্তার কার্য্য করিয়া গেলেন। বিন্ধ্যবাসিনী বেচারীকে বিধবাশ্রমেই আবদ্ধ থাকিতে হইল; আসিবার ইচ্ছা থাকিলেও আসিতে পারিলেন না।

কৃপার বিবাহের দিন, বোধ হয় বিবাহটা অসবর্ণ বিবাহ বলিয়া,

ক্ষিতীশের পিতা বা ভ্রাতারা কেহ বিবাহস্থলে উপস্থিত থাকিলেন না; কিন্তু তৎপরদিন প্রাতেই ক্ষিতীশ পত্নীসহ নিজগৃহে গেলেন। তাঁহার পিতামাতা বৌকে আদরে গ্রহণ করিলেন; ক্ষিতীশের ভগিনীরা কৃপার কণ্ঠালিঙ্গন করিয়া দুকপোলে চুম্বনের উপর চুম্বন দিতে লাগিলেন; সকলের প্রেমালিঙ্গন পাইয়া কৃপার আর ভয় ভাবনা রহিল না; পাশের বাড়ীর দুই চারিটী মেয়ে, বৌ দেখিতে আসিয়া কৃপাকে দেখিয়া বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া বলিতে লাগিলেন—"ওমা, কি সুন্দর মেয়ে! কি বড় বড় চোখ! কি নাক মুখ! ক্ষিতীশবাবু যে একে দেখে ভুলেছেন সেটা আশ্চর্য্যের বিষয় নয়।"

কৃপা এইরূপে শ্বশুরের গৃহে প্রতিষ্ঠিত হইলেন; সে জন্য তাঁহার শ্বশুর শাশুড়ীকে কিছু সংগ্রামের মধ্যে পড়িতে হইল; স্বজাতীয় লোকদের মধ্যে কাণাকাণি ও সমালোচনা উপস্থিত হইল; তাঁহারা বলিতে লাগিলেন,—"ছেলে বামনের মেয়ে বিয়ে করে আনলো, সেনজা কি করে তাকে বাড়ীতে নিলেন?" তাহার উত্তরে পরিবারের বন্ধুরা বলিতে লাগিলেন—"তার আর কি? তাঁরা ত বিয়ে দিতে যান নি; বৌ এসে ত আর রান্নাঘরে যায় না; অন্য জেতের মেয়ে কি গৃহস্থের বাড়ীতে আসে না বা থাকে না?"

এইরূপ সমালোচনার মধ্যে ক্ষিতীশের কর্ম্মস্থানে যাবার দিন নিকটে আসিল। বৌ-এর সঙ্গে কে যাবে সেনজা মহাশয়ের পরিবারে এই আলোচনা উপস্থিত হইল। ক্ষিতীশের একটী বিধবা ভগ্নী আছেন, তাঁর অপেক্ষা চারি পাঁচ বছরের বড়; তিনি বিধবা হওয়ার পর পতি-গৃহে কেহ না থাকাতে একটী কন্যা লইয়া পিতৃগৃহ আশ্রয় করিয়াছেন; ক্ষিতীশের প্রতি তাঁর প্রগাঢ় ভালবাসা; ক্ষিতীশ একটী প্রাপ্তবয়স্ক অন্য জাতীয় মেয়ে বিবাহ করিয়া আনিতেছেন শুনিয়া তিনি

দুঃখিত ও চিন্তিত হইয়াছিলেন। কিন্তু কৃপা বাড়ীতে আসার পর, তাঁহার সে ভাব অন্তর্হিত হইয়াছে; তিনি কৃপাকে দেখিয়া ও তাঁহার সহিত কথা কহিয়া বড়ই প্রীত হইয়াছেন; তাঁহার ভয় ভাবনা চলিয়া গিয়াছে; এই কয়েক দিনের মধ্যেই কৃপার উপর ভালবাসা জন্মিয়াছে। ক্ষিতীশের যাইবার দিন যখন সন্নিকট হইল, তখন একদিন তিনি ভগিনী রাজলক্ষ্মীকে বলিলেন—"মেজদি, একাকী সপরিবারে বিদেশে গিয়ে বসতে মনে কেমন ভাবনা আসচে; তোমাকে সাহস করে সঙ্গে যেতে বলতে পারি না; যে রকমে বিয়ে হয়েছে, তাতে তোমাদের সকলেরই আপত্তি, নতুবা হয়ত তোমাকে সঙ্গে যেতে বলতাম; তোমার ত এখানে কাজ নেই, তুমি অনায়াসে যেতে পারতে; তোমায় গৃহের কর্ত্রী করে আমি নিশ্চিন্ত হতে পারতাম; তুমি আমাকে ও কৃপাকে দেখতে; তোমার মেয়েকে আমি মানুষ করতাম।"

রাজলক্ষ্মী। সে কি, বিয়ে ঠিক বাড়ীর লোকের মনের মত হয়নি, তাতে কি? আমি কার ভয় করি? আমার ত কেউ কোথাও নাই; তোমাকে আমি ভালবাসি; তোমার কাছে থাকলে আমি সুখেই থাকব; বৌ বড় ভাল মেয়ে, ওকে কাছে পেলে আমি সুখীই হব।"

ক্ষিতীশ। তবে কি তুমি সঙ্গে যাবে, সেইরূপ আয়োজন করবো?

রাজলক্ষ্মী। রসো, বাবা মাকে একবার জিজ্ঞাসা করি।

ইহার পর রাজলক্ষ্মী পিতামাতার সঙ্গে পরামর্শ করিয়া ক্ষিতীশের সঙ্গে যাওয়াই স্থির করিলেন। এই সংবাদে কৃপা আনন্দিত হইয়া রাজলক্ষ্মীকে বলিলেন,—"ঠাকুরঝি! আমি বাঁচলাম, আপনার উপরে সংসারের ভার দিয়ে আমি খাব আর ঘুমাব; আর বিনোদিনীকে আমি পড়াব; সে আমার একটা বেশ কাজ হবে।"

রাজলক্ষ্মী। সে ত বেশ কথা! যেখানে আমরা যাচ্ছি সে খানে

মেয়েস্কুল বোধ হয় নেই; তোমার কাছে পড়লে ওর সময়টা বৃথা যাবে না।

ইহার পরে ক্ষিতীশের যাত্রার দিন আসিল। তৎপূর্ব্ব দিন বৈকালে নিস্তারিণীর নিমন্ত্রণে ক্ষিতীশ, কৃপা, রাজলক্ষ্মী ও তাঁর কন্যাকে লইয়া চাঁদনী হাসপাতালে গিয়া কয়েকঘণ্টা যাপন করিয়া আহার করিয়া আসিলেন। পরদিন তাঁহারা ক্ষিতীশের কর্ম্মস্থানের অভিমুখে যাত্রা করিলেন; সেখানে গিয়া রাজলক্ষ্মী ঘর গুছাইয়া বসিলেন; কৃপা যাহা বলিয়াছিলেন তাহাই করিতে লাগিলেন; খাওয়া, ঘুমান ও বিনোদিনীকে পড়ানই তাঁহার প্রধান কাজ হইল।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

কৃপার যশোহর যাত্রা করার কিছুদিন পরেই প্রবোধের পরীক্ষার দিন উপস্থিত হইল। তিনি ইংরাজী ভাষাতে এম, এ, পরীক্ষা দিলেন; এবং প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হইলেন। তিনি প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হইয়াছেন জানিয়া গুপ্তমহাশয়ের পরিবার মধ্যে আনন্দ-ধ্বনি উত্থিত হইল। তাঁহারা সে জন্য একদিন সন্ধ্যার সময় প্রবোধের অন্তরঙ্গ বন্ধু কয়েক জনকে নিমন্ত্রণ করিয়া ঈশ্বরকে ধন্যবাদ করিলেন; তাহাদিগকে গান বাজনা শুনাইলেন; এবং জলযোগ করাইলেন।

ওদিকে প্রবোধের প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হওয়ার সংবাদে বহরমপুরে মহেশের গৃহে আনন্দ! সেই সময়েই মহেশ সংবাদ পাইলেন যে বহরমপুর কলেজের ইংরাজী প্রোফেসরের পদ খালি হইয়াছে; অমনি কোমর বাঁধিয়া সেই কর্ম্মটী প্রবোধের জন্য যোগাড় করিবার চেষ্টাতে লাগিয়া গেলেন। সহরের বড় বড় ইংরাজেরা, কলেজ কমিটীর সভ্যেরা সকলেই তাঁর বন্ধু; সুতরাং কর্ম্মটী যোগাড় করিতে তাঁহাকে বিশেষ ক্লেশ পাইতে হইল না। বিশেষতঃ প্রবোধ বহরমপুর কলেজেরই ছাত্র, সেখান হইতেই এম, এ, দিয়াছিলেন, সুতরাং ঐ পদটী অপরের অগ্রে তাঁহারই প্রাপ্য। কয়েক দিনের মধ্যেই নিয়োগপত্র প্রবোধের নিকট গেল। তিনি সেই নিয়োগপত্র পাইয়া বহরমপুরে পৌঁছিয়াই দেখিলেন যে, তাঁহার অভ্যর্থনার জন্য মহেশ তাঁহার যুবক বন্ধুদিগকে সেই দিনই সন্ধ্যার সময় সমবেত হইবার জন্য নিমন্ত্রণ করিয়াছেন; যথাসময়ে তাঁহারা সমবেত হইলেন; ওদিকে সারদাসুন্দরী ও বিন্ধ্যবাসিনী আসিলেন; কথাবার্ত্তা আমোদ আহ্লাদে সময়টা সুখেই অতিবাহিত

হইল। সকলে চলিয়া গেলে, প্রবোধ কোথায় থাকিবেন, কি করিবেন, কিরূপে কলেজের কাজ করিবেন, এই সকল বিষয়ে মহেশের সঙ্গে পরামর্শ হইল। এই স্থির হইল যে প্রবোধ বিবাহিত হইয়া গৃহধর্ম্মে না বসা পর্য্যন্ত মহেশের ভবনেই থাকিবেন এবং স্থানীয় ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক হইয়া, সমাজের কাজে ও আত্মোন্নতি সভার কাজে বিশেষ মন দিবেন। সেই পরামর্শ অনুসারেই কার্য্যারম্ভ হইল।

এদিকে প্রবোধের প্রাণে এক সংগ্রাম উপস্থিত! কলিকাতায় গুপ্ত মহাশয়ের ভবনে অবস্থানকালে প্রবোধ তাঁহার জ্যেষ্ঠা কন্যা নিরুপমার সহিত পাঠ সদালোচনা প্রভৃতিতে বিশেষভাবে মিশিয়াছেন। নিরুপমার প্রতি প্রগাঢ় প্রীতি ও শ্রদ্ধা জন্মিয়াছে। নিরুপমা প্রায় তাঁহার সমবয়স্ক, সুতরাং চিন্তা ও ভাবের বিনিময় আশ্চর্য্যরূপে ঘটিয়াছে। অনেক বার প্রবোধের মনে হইয়াছে, এই মেয়েকে যদি জীবনের সঙ্গিনীরূপে পাই, আমার জীবনটা ধন্য ও কৃতার্থ হয়। কিন্তু নিজের দারিদ্র্য ও পরমুখাপেক্ষিতার কথা স্মরণ করিয়া এরূপ চিন্তা হৃদয় হইতে বার বার বিদায় করিয়া দিয়াছেন।

বহরমপুর কলেজের প্রোফেসরি পাওয়ার পর সেই চিন্তা আবার হৃদয়ে উঠিয়াছে। কলিকাতা ত্যাগ করিবার পূর্ব্বে নিরুপমা ও তাঁহার জনকজননীর কাছে এরূপ প্রস্তাব উপস্থিত করিবেন মনে করিয়া লজ্জাবশতঃ করিতে পারেন নাই; আরও ভাবিয়া চিন্তিয়া, নিজের সংসার পাতিয়া বসিয়া ভবিষ্যতে করিবেন বলিয়া চলিয়া আসিয়াছেন। আসিবার সময় মনে করিয়া আসিয়াছিলেন যে, আর মহেশের ভবনে থাকিবেন না, নিজের এক বাসা ভাড়া করিয়া চাকর বাকর লইয়া বসিবেন; নিরুপমা যদি বিবাহ করিতে রাজি হন, বিবাহান্তে তাঁহাকে সেখানে আনিবেন; কিন্তু মহেশ তাঁহাকে স্বতন্ত্র বাসা করিতে দিলেন না। যাহা হউক

যদি নিরুপমা বিবাহ করিতে রাজি হন, তবে বিবাহের পর অন্যত্র যাইবেন, এই স্থির করিয়া মহেশের প্রস্তাব শিরোধার্য্য করিলেন। এই বার নিরুপমার নিকট নিজের মনের ভাব প্রকাশ করিবার সময় আসিল। প্রবোধ নিম্নলিখিত পত্র লিখিলেন :—

"নিরুপমা,

কলিকাতা ত্যাগ করিবার কয়দিন পূর্ব্বে হইতে তোমাকে একটা কথা বলিব বলিব ভাবিয়া কয়েকবার তোমার কাছে গিয়াছি; আসিবার দিন প্রাতে তোমার সঙ্গে একান্তে বসিয়াছি, কিন্তু লজ্জাবশতঃ কিছুই বলিতে পারি নাই। সে কথাটা কি জান?—বহুদিন একত্রে বাস করিয়া তোমাতে যাহা দেখিয়াছি, তাহাতে আমার মন মুগ্ধ হইয়া গিয়াছে! কি জ্ঞানানুরাগ, কি সত্যনিষ্ঠা, কি ধর্ম্মপরায়ণতা, কি পরোপকারস্পৃহা! আমার চক্ষে সকল বিষয়ে তুমি আদর্শ নারী! তোমাকে যদি আমার জীবনের সঙ্গিনীরূপে পাই, তবে আমার জীবন ধন্য হইবে। যতদিন আমি নিজে জীবন-সংগ্রামের মধ্যে ছিলাম, পরমুখাপেক্ষী ছিলাম, ততদিন তোমার কাছে এরূপ প্রস্তাব করিতে সাহসী হই নাই; আসিবার দিন বলি বলি করিয়াও বলিতে পারি নাই; আজ এই দূর হইতে বলিতে সাহসী হইতেছি। তোমাকে জিজ্ঞাসা করি, আমি যদি তোমাকে জীবনের সঙ্গিনী করিয়া লইতে চাই, তুমি কি তাহাতে প্রস্তুত আছ? বিশেষ চিন্তা করিয়া, ঈশ্বরচরণে বসিয়া প্রার্থনা করিয়া, এই প্রস্তাবের উত্তর দিবে। জীবনের কোনও কাজে, কোনও মুহূর্ত্তে, যদি ভগবানের চরণে আত্মসমর্পণ করিতে হয় ও তাঁর প্রেরণার অপেক্ষা করিতে হয়, তাহা এইরূপ কাজে। এরূপ সম্বন্ধ ছেলে খেলা নয়! এরূপ স্থলে ভগবানের প্রেরণা ভিন্ন কে তোমাকে বল দিতে পারে!

আমি যে তোমার কাছে এরূপ প্রস্তাব করিতেছি, একদিকে

দেখিতে গেলে এটা আমার ধৃষ্টতা ; আমি তোমার উপযুক্ত নই। তুমি সম্ভ্রান্ত ধার্ম্মিক পরিবারে জন্মগ্রহণ করিয়া, সেই পরিবারের মধ্যেই বর্দ্ধিত হইয়াছ, চিরদিন সাধু সদাশয় মানুষের সঙ্গলাভ করিয়াছ, চিরদিন মানসম্ভ্রম লাভ করিয়া আসিয়াছ ; অপরদিকে আমি এক দরিদ্রের সন্তান, বাল্যকাল হইতে পিতৃমাতৃহীন, পরাশ্রয়ে ও পরের সাহায্যে মানুষ হইয়াছি ;—আমাতে সেই সৌজন্য, পদমর্য্যাদা, সুনীতি সুরীতি নাই, যাহা তোমাতে আছে। আমাকে বিবাহ করা তোমার পক্ষে অবনত হওয়া। নিরুপমা! আমি ইহা বিলক্ষণ জানি যে, আমি তোমার উপযুক্ত নই। তথাপি যে এ প্রস্তাব করিতেছি তাহার কারণ এই, আমার মন অনিবার্য্য গতিতে তোমার দিকেই ধাবিত হইতেছে ; আমি ধরিয়া রাখিতে পারিতেছি না। তুমি যদি বিবাহ করিতে না চাও, আমার কোনও কথা নাই। আমি ভাবিব আমি যে প্রত্যাখ্যানের উপযুক্ত তাহাই পাইলাম ; আর তোমাকে মুখ দেখাইব না ; কাহাকেও বলিব না ; কাহারও প্রতি বিরাগ বা বিদ্বেষ রাখিব না ; আমি যাহার উপযুক্ত তাহাই পাইলাম মনে করিয়া নিজকার্য্যে মগ্ন থাকিব। ইতি

"তোমাদেরই প্রবোধ।"

এই পত্রখানি কলিকাতায় পৌঁছিলে, তাহা পাঠ করিবার সময় নিরুপমার হাত কাঁপিতে লাগিল! ভাবাবেশে চক্ষে জলধারা বহিল! তিনি বার বার উহা পাঠ করিলেন ; পত্রখানি টেবলের উপর রাখিয়া, উঠিয়া চক্ষু মুছিয়া ঘরের জানালার নিকট দাঁড়াইলেন ; সম্মুখের বাগানের দিকে চাহিয়া রহিলেন ; সকল সৌন্দর্য্য যেন নূতন লাগিতে লাগিল! পক্ষীদিগের ডাক যেন মধুবর্ষণ করিতে লাগিল! চারিদিক মধুময় বোধ হইতে লাগিল! তিনি সকলকার মধ্যে ভগবানের বিধাতৃত্ব অনুভব করিতে লাগিলেন ; এবং মনে মনে তাঁর চরণে প্রার্থনা করিতে লাগিলেন।

ভিতরকার কথাটা এই, প্রবোধের উপরে তাঁহার প্রগাঢ় প্রীতি জন্মিয়াছে; প্রবোধের সহিত তাঁহার এক ভাব, এক প্রাণ, এক আকাঙ্ক্ষা। প্রবোধ বহরমপুরে কাজ লইয়া চলিয়া গেলে তাঁহার মন যেন ছিন্নপদ্ম মৃণালের ন্যায় জলের তলে নিমগ্ন হইতেছিল; এই পত্র পাইয়া আবার ভাসিয়া উঠিল! পত্রখানি পাইয়া তাঁহার অন্তরাত্মা যেন বলিতে লাগিল, ঠিক, ঠিক, এই ত আমার স্থান। এমন মানুষের সঙ্গিনী হওয়ার ন্যায় সৌভাগ্য আর কি আছে! তিনি তৎক্ষণাৎ স্থির করিলেন যে পত্রোত্তরে সম্মতি জানাইবেন। কিন্তু পরেই মনে হইল যে, জনক-জননীকে ঐ পত্র দেখান কর্ত্তব্য এবং তাঁহাদের অভিপ্রায় জানিয়া উত্তর দেওয়া উচিত। এই স্থির করিয়া সেইদিন দুপুর বেলা আহারের পর মাতার শয়ন ঘরে গিয়া, দ্বার বন্ধ করিয়া নির্জ্জনে তাঁহার হস্তে ঐ পত্র দিলেন। কর্ত্রীঠাকুরাণী প্রবোধকে অতিশয় ভাল বাসেন ও শ্রদ্ধা করেন; তাঁহার নিকট হইতে ঐ প্রস্তাব আসাতে তাঁহার মন আনন্দে নৃত্য করিয়া উঠিল। তিনি বলিলেন,— ‘কি আশ্চর্য্য, আমার মনে যে ভাবটা আসছিল, সেইটা কাজে দাঁড়াল! প্রবোধ বহরমপুরে আড়াইশ টাকার কাজে গিয়ে বসাতে আমি ভাবছিলাম, তার সঙ্গে যদি তোমার বিয়ে হয় তা হলে ভাল হয়; সেই ভাব তারও মনে জেগেছে, এই বড় আশ্চর্য্য ব্যাপার! আচ্ছা, চিঠিখানা আমার কাছে থাক, ওঁকে একবার দেখাব; ওঁরও যে মত হবে তাতে আর সন্দেহ নেই।”

নিরুপমা। পত্রের উত্তর কি আমি দেব, না তোমরা দেবে?

মাতা। আচ্ছা, আমিই প্রবোধকে লিখব।

ইহার পরে গুপ্ত মহাশয়কে সে পত্র দেখান হইল; তিনিও পত্র পাঠ করিয়া খুব আনন্দিত হইলেন। তৎপরে কর্ত্রীঠাকুরাণী প্রবোধকে নিম্নলিখিত পত্র লিখিলেন:—

"প্রবোধ! তুমি নিরুপমাকে যে পত্র লিখেছ তা আমরা দেখেছি; দেখে আনন্দিত হয়েছি। তুমি ভাল ছেলে;—সৎ, ধার্ম্মিক, বিদ্বান, বুদ্ধিমান ও কাজের লোক; তুমি আমাদের জামাই হবে, তার চেয়ে সুখের বিষয় আর কি আছে? এ প্রস্তাবে নিরুপমার সম্পূর্ণ সম্মতি আছে জানবে। তোমার সংস্রবে এসে তার মন জেগে উঠেছে; পড়ায় বেশি মন হয়েছে; ভাল কাজে উৎসাহ বেড়েছে; ধর্ম্ম-সাধনে মতি হয়েছে; তোমার কাছে থাকলে তার আত্মার কল্যাণ হবে। অতএব এ বিবাহে আমাদের সকলের মত আছে জানবে। মহেশ বাবু ও ক্ষীরদাকে এই সংবাদ দিবে এবং সুবিধামত এক শনিবার কলকেতায় আসবে; সাক্ষাৎ এ সকল কথা হবে।

তোমার শুভানুধ্যায়িনী

মনোরমা।

এই পত্র পাইয়া প্রবোধের মন আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিল। তিনি যে নিরুপমাকে পত্র লিখিয়াছিলেন সে কথা ক্ষীরদাকে জানাইয়া কর্ত্রীঠাকুরাণীর পত্রখানা তাঁহার হাতে দিলেন। ক্ষীরদা মহেশকে সেই সংবাদ দিলেন ও পত্রখানা দেখাইলেন। তাঁহারা উভয়েই অতিশয় আনন্দিত হইলেন। পরের শনিবার প্রবোধ কলিকাতায় গুপ্ত মহাশয়ের ভবনে গেলেন। তাঁহাকে পাইয়া বাড়ীর সকলে আনন্দধ্বনি করিতে লাগিল! কেবল নিরুপমার যেন কিছু গম্ভীর ও সলজ্জভাব; তাঁহার মনও আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিল; কিন্তু তিনি যেন ততটা বাহিরে প্রকাশ করিলেন না। গুপ্ত মহাশয় ও তাঁহার পত্নী প্রবোধের সহিত একান্তে বসিয়া, বিবাহের স্থান, দিন, প্রকার, প্রণালী সমুদয় স্থির করিলেন; এবং বিবাহান্তে বহরমপুরে তাঁহারা কোথায় কি ভাবে থাকিবেন তাহাও নির্দ্দেশ করিলেন। তৎপরদিন প্রাতে আহারান্তে

বিশ্রামের পর গৃহিণীঠাকুরাণী সকলকে লইয়া বোটানিকাল গার্ডেনে গেলেন। যাইবার সময় পূর্ব্বকার বন্দোবস্ত অনুসারে নিস্তারিণী আসিয়া তাঁহাদের সঙ্গে জুটিলেন। বাগানে গিয়া ছেলে মেয়েদিগকে খেলিতে দিয়া গৃহিণীঠাকুরাণী ও নিস্তারিণী একসঙ্গে বেড়াইতে লাগিলেন এবং প্রবোধ ও নিরুপমাকে একসঙ্গে বেড়াইতে পাঠাইলেন। তাঁহারা দুজনে মন খুলিয়া আপনাদের ভবিষ্যৎ জীবন কিভাবে চলিবে; কোথায় কিরূপে থাকিবেন, কি কি কাজে হাত দিবেন ইত্যাদি কথাতে মগ্ন রহিলেন; কোথা দিয়া সময় যাইতে লাগিল তাহা জানিতেও পারিলেন না! বিবাহের বিষয় সমুদয় স্থির হইয়া গেল। পর দিন প্রাতে প্রবোধ বহরমপুরে ফিরিলেন।

নির্দ্দিষ্ট দিনে মহেশ সপরিবারে, সারদাসুন্দরী ও বিন্ধ্যবাসিনীকে সঙ্গে করিয়া, প্রবোধকে লইয়া আসিয়া বিবাহ দিলেন। ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের ভক্ত শিষ্য সাধু অঘোরনাথ গুপ্ত মহাশয় আসিয়া ঐ বিবাহ দিলেন। মহা সমারোহে বিবাহ কার্য্য সমাধা হইল। বিবাহের পরদিন মহেশ নিরুপমাকে লইয়া বহরমপুরে গেলেন। মহেশ বন্ধু-বান্ধবকে নিমন্ত্রণ করিয়া সমারোহে বৌভাতের উৎসব সম্পন্ন করিলেন।

ইহার পর কয়েকদিন প্রবোধ ও নিরুপমা ক্ষীরদার নিকটেই রহিলেন; তৎপরে তাঁহাদের বাড়ীর সন্নিকটে একটা বাড়ী ভাড়া করিয়া সেখানে উঠিয়া গেলেন; এবং সেখানে সংসার পাতিয়া গৃহ ধর্ম্মে প্রবৃত্ত হইলেন।

মানুষের উপর দায়িত্বভার না পড়িলে তার ভিতর কি আছে তাহা সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ পায় না। নিরুপমা মায়ের কোলে আমোদে আহ্লাদে কাল কাটাইতেন; তখন তাঁহাকে দেখিলে কেহ মনে করিতে পারিত না যে, তাঁর ভিতরে এতটা বুদ্ধি বিবেচনা আছে, বা এতটা কার্য্যের শক্তি আছে। নূতন স্থানে, নূতন গৃহে, যখন তিনি গৃহিণী হইয়া

নিজগৃহে বসিলেন, তখন তাঁহার গৃহিণীপনা দেখিয়া বন্ধুবান্ধব আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া যাইতে লাগিলেন! নিরুপমার প্রশংসা আর সারদা-সুন্দরীর মুখে ধরে না! তিনি দুই একদিন দুপুর বেলা, তাঁর বাড়ীতে আসেন এবং ঘর কন্না কিরূপ চলিতেছে, তাহা দেখেন। তাঁহারা মনে করিয়াছিলেন যে নিরুপমা চিরদিন সুখের অবস্থাতে থাকিয়াছেন, পিতা মাতার আদরে মানুষ হইয়াছেন, যথেচ্ছ ব্যয় করিবার মত অর্থাদি পাইয়াছেন; এখন গৃহের কর্ত্রী-রূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়া মাসে আড়াই শত টাকা হাতে পাইবেন, বোধ হয় হিসাব করিয়া ব্যয় করিতে পারিবেন না; অতিরিক্ত ব্যয় করিয়া প্রবোধকে ঋণগ্রস্ত করিয়া ফেলিবেন। কিন্তু সারদা-সুন্দরী দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইতে লাগিলেন, যে নিরুপমা ভারী হিসাবী, অতিরিক্ত ব্যয়ের দিকেত গতিই নাই, বরং অত্যাবশ্যক ব্যয়ও অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া করেন। এদিকে তিনি তাঁহার জনক জননীর প্রকৃতি ও গুণাবলী বহুল পরিমাণে পাইয়াছেন; সামান্য বাড়ীটীর সংলগ্ন প্রাঙ্গণ টুকুকে অল্পদিনের মধ্যে সুন্দর বাগানে পরিণত করিয়াছেন; মাতাকে লিখিয়া নিজের অঙ্কিত ও ক্রয় করা ভাল ভাল ছবি আনাইয়া ঘর গুলিকে সুসজ্জিত করিয়াছেন; এবং প্রবোধের যুবক বন্ধুগণের সাহায্যে পাঠ ও সদালোচনার জন্য একটি ছোট খাটো লাইব্রেরী গড়িয়া তুলিতেছেন; জননীর অনুকরণে নিজগৃহে প্রাতে সর্ব্বপ্রথম কার্য্য পতির সহিত ভগবানের নাম করার নিয়ম প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন; এবং বিবিধ ধর্ম্মগ্রন্থ আনাইয়া পাঠে নিমগ্ন হইতেছেন।

নিরুপমার ঘর কন্না কলের মত চলিয়াছে! তিনি জগদ্ধাত্রী-সদন হইতে একটী বিধবাকে আনিয়া আপনার গৃহে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন; তাঁহাকে ঘর কন্না বুঝাইয়া দিয়াছেন; সে বিষয়ে আর তাঁহাকে ব্যস্ত হইতে হয় না। তবে সকল বিষয়ে চোক আছে; প্রাতে উঠিয়া

গৃহস্থালীর বন্দোবস্ত করিয়া, চাকরচাকরাণীকে স্বীয় স্বীয় কাজে লাগাইয়া দিয়া, তিনি ন্যায়রত্ন মহাশয়ের নিকট সংস্কৃত পড়িবার জন্য প্রস্তুত হন; প্রবোধ সে সময়ে বেড়াইয়া আসিয়া নিজের কলেজের কাজের জন্য প্রস্তুত হইতে থাকেন।

ন্যায়রত্ন মহাশয় সাড়ে সাতটার সময় আসিয়া সাড়ে আটটা পর্য্যন্ত সংস্কৃত পড়ান। পাঠ সাঙ্গ হইলে নিরুপমা পতির আহারাদির বন্দোবস্ত দেখিতে প্রবৃত্ত হন; প্রবোধ কলেজে গেলে, তিনি ও সেই বিধবাটী স্নান করিয়া আহার করেন আহারান্তে কিয়ৎকাল বিশ্রামের পর, বেলা দুইটার সময় মহেশের বাড়ী হইতে সারদাসুন্দরী ও বীণাপাণি আসেন। সারদাসুন্দরী বিন্ধ্যবাসিনী ও সেই প্রথমোক্ত বিধবাটীর উপর জগদ্ধাত্রী-সদন চালাইবার ভার দিয়া, আবার মহেশের ভবনে আসিয়া, গৃহের কর্ত্রীরূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন; আসন্নপ্রসবা ক্ষীরদাকে সংসারের কাজ-কর্ম্ম হইতে অব্যাহতি দিয়াছেন। সে যাহা হউক, বৈকালে দুইটার সময় সারদাসুন্দরী ও বীণাপাণি আসিলে নিরুপমা প্রায় একঘণ্টা বা দেড় ঘণ্টা কাল বীণাপাণিকে ও গৃহস্থিত বিধবাটীকে পড়ান; তৎপরে নিজের পাঠাদিতে নিমগ্ন হন; সেই পাঠ প্রবোধের কলেজ হইতে ফেরা পর্য্যন্ত চলে; প্রবোধ কলেজ হইতে ফিরিলে, নিরুপমা তাঁহার পরিচর্য্যাতে নিযুক্ত হন; তাঁহাকে কাপড় ছাড়ান, বাতাস করা, খাওয়ান, এই সকল কাজে প্রবৃত্ত হন; কিয়ৎকাল বিশ্রামের পর প্রবোধ বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে দেখা করিবার জন্য বাহির হন; তখন নিরুপমা কিছু সময়ের জন্য সারদাসুন্দরী ও বীণাপাণির সঙ্গে মহেশের ভবনে ক্ষীরদার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যান, এবং সেখানে গিয়া আবশ্যকমত গৃহকার্য্যে সাহায্য করেন; সন্ধ্যার সময় প্রবোধ দুই একটী অন্তরঙ্গ বন্ধুর সঙ্গে ফিরিয়া আসিলে, কিয়ৎক্ষণ সেতার এসরাজ প্রভৃতি সহকারে গান

বাজনা হয়; পরে সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইলে সকলে মিলিয়া ভগবানের নাম করা হয়; তারপর আত্মোন্নতি সভার সভ্য প্রবোধের যুবকবন্ধুরা এক এক জন করিয়া জুটিতে থাকেন; প্রবোধ তাঁহাদিগের সহিত জ্ঞানালোচনাতে নিযুক্ত হন; তখন নিরুপমা রাত্রিকালের আহারাদির ব্যবস্থা করিতে যান; কোন কোনও বিশেষ জ্ঞানগর্ভ আলোচনা উপস্থিত হইলে, পার্শ্বের ঘরে বসিয়া সেই আলোচনাতে যোগ দেন; কেবল তাহাই নহে; বিবাহিত হইয়া প্রবোধের কাছে আসিয়া থাকার পর হইতে নিরুপমার জ্ঞানস্পৃহা দিন দিন আরও বাড়িতেছে; রাত্রিকালের আহারের পর, শয়নের পূর্ব্বে, প্রবোধের পাঠাগারে বসিয়া, প্রায় এক ঘণ্টা দেড় ঘণ্টা কাল, তাঁহাকে ইংরাজী ভাল ভাল বই পড়িয়া শুনাইয়া থাকেন; কোন কোনও দিন বা প্রবোধের কলেজের নোটের বই কাপি করিয়া দেন; অথবা ছেলেদের উত্তরের কাগজ পড়িয়া শোনান, এবং প্রবোধ যেটা যেরূপে সংশোধন করিতে বলেন তাহা করিয়া থাকেন; এইরূপে পতির কলেজের কাজেও সহায়তা করিয়া থাকেন। লোকে আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলাবলি করে, "এই ত স্ত্রী! স্বামীর ডান হাতের দোয়ার!"

এই ত গেল নিরুপমার গৃহের কাজের ব্যবস্থা; ইহার সঙ্গে বাহিরের কাজও আরম্ভ হইয়াছে। প্রবোধ বরহমপুরে আসিয়া কলেজের প্রোফেসর রূপে প্রতিষ্ঠিত হইলেই স্থানীয় ব্রাহ্মসমাজটীর ভার প্রধানরূপে তাঁহার উপরেই পড়িয়া গেল। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে সমাজটী প্রধানতঃ তাঁহার চেষ্টাতেই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল; এখন তাহার রক্ষা ও উন্নতির ভার তাঁহার উপরেই পড়িল। লোকে তাঁহাকে সমাজের সাপ্তাহিক উপাসনাতে আচার্য্যের কার্য্য করিবার জন্ত ধরিল। তিনি বড় বিনয়ী মানুষ, আপনাকে এত বড় কাজের অনুপযুক্ত ভাবিয়া প্রথমতঃ ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন; কিন্তু অবশেষে নিরুপমার অনুরোধে সে কার্য্যেরও

ভার গ্রহণ করিতে হইল। নিরুপমা যে কেবল তাঁহাকে ঐ কার্য্যে প্রবৃত্ত করিলেন তাহা নহে, নিজে সারদাসুন্দরী, বীণাপাণি ও গৃহস্থিত বিধবাটীকে সঙ্গে করিয়া সামাজিক উপাসনাতে যাইতে লাগিলেন। কেবল তাহা নহে; সারদাসুন্দরীর সহিত মিলিত হইয়া মহেশের গাড়ীতে সারদাসুন্দরীর পূর্ব্ব পরিচিত কোন কোনও ভদ্র মহিলার বাড়ীতে গিয়া তাঁহাদের সঙ্গে ধর্ম্ম বিষয়ে আলোচনা করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের কেহ কেহ সমাজের উপাসনাতে উপস্থিত হইতে লাগিলেন।

কেবল ইহাও নহে, নিরুপমা সপ্তাহের মধ্যে দুই একদিন মহিলা-শিল্পাশ্রমে ও বালিকা-বিদ্যালয়ে যাইতে লাগিলেন; এবং নিজের অঙ্কিত ছবিসকল দেখাইয়া তাহাদিগকে চিত্রবিদ্যাশিক্ষা বিষয়ে উৎসাহিত করিতে লাগিলেন। তাঁহার শ্রম এখানেই শেষ হইল না। আত্মোন্নতি-সভার অধীনে যে দীনসেবা-ফণ্ড ছিল, তিনি তাহার তত্ত্বাবধানের ভার লইলেন। তাহার পরিচালন ভার যে সকল যুবকের প্রতি ছিল, তাহাদিগকে লইয়া তিনি নিজ ভবনে স্বীয় পতির সহিত বসিতে লাগিলেন এবং অর্থ সংগ্রহ ও উপযুক্ত পাত্রে তাহার দানের ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন।

ইহার সঙ্গে আর একটা কাজ আসিয়া পড়িল। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, প্রবোধ ইংরাজী বিদ্যাতে সুপরিপক্ক হইলেও সংস্কৃত ভাষা অধ্যয়নে তাঁর প্রগাঢ় অনুরাগ এবং পদার্থবিদ্যা ও উদ্ভিদবিদ্যা অনুশীলনের বাতিক আছে। সেই বাতিকে তিনি নিরুপমাকে উদ্দীপ্ত করিয়াছেন। বহরমপুরে আসিয়া স্থির হইয়াছে যে, তাঁহারা পতিপত্নীতে এক এক রবিবার নৌকা ভাড়া করিয়া, গঙ্গার ধারে ধারে বাগানবাড়ী দেখিয়া বেড়াইবেন; বাগানে উঠিবেন, বৃক্ষাদি পরিদর্শন করিবেন, পাতা লতা সংগ্রহ করিবেন, উদ্ভিদবিদ্যার আলোচনাতে সময় যাপন করিবেন। এইরূপ নানাস্থান পরিদর্শন করিতে করিতে একদিন দুজনে ক্লিনবরণ

সাহেবের কলকারখানার নিকট গিয়া উঠিলেন। তন্নিকটস্থ একটী বাগানে পরিদর্শন করিয়া ফিরিতেছেন, এমন সময়ে কয়েকজন শ্রমজীবী আসিয়া তাঁহাদিগকে নমস্কার করিল এবং সমাদরে তাহাদের নিজের আবাস স্থানে লইয়া গেল। নিরুপমা এই কলকারখানার শ্রমজীবীদের কথা পূর্ব্বে শুনিয়াছিলেন, কিন্তু কখনও দেখিতে যান নাই। মহেশের চেষ্টাতে তাহাদের অবস্থার কিরূপ উন্নতি হইয়াছে তাহা দেখিয়া তাঁহাদের পতি-পত্নীর বিশেষ আনন্দ হইল; এবং মধ্যে মধ্যে রবিবারে তাঁহারা সেখানে যাইবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত হইয়া আসিলেন। আসিয়া মহেশকে সেই কথা জানাইলেন; মহেশ তাঁহাদিগকে উৎসাহিত করিয়া তুলিলেন; এই আর একটা কাজ আরম্ভ হইল।

নিরুপমার বাহিরের কাজের মধ্যে আর একটী কাজ এই আসিল যে মহেশ ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবকে বলিয়া তাঁহাকে মীরা হাঁসপাতালের পরিদর্শক কমিটিতে লইলেন। মীরা হাঁসপাতালে যাওয়া, রোগীদের কাছে বসা, তাহাদিগকে মিষ্ট কথা বলা, আবশ্যকমত তাহাদের সাহায্য করা—তাঁহার একটা প্রধান কাজ হইয়া দাঁড়াইল। এই সূত্রে লেডী ডাক্তার সরোজিনীর সঙ্গে তাঁর বিশেষ বন্ধুতা হইল। একদিন বৈকালে প্রবোধও মহেশের সহিত মীরা হাঁসপাতালে গিয়া নিরুপমা রোগীদের সঙ্গে কথা কহিতেছেন এমন সময়ে ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব তাঁর গৃহিণীর সঙ্গে, হাঁসপাতাল-পরিদর্শনের জন্য, আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মহেশ প্রবোধ ও নিরুপমাকে তাঁহাদের সহিত পরিচিত করাইয়া দিলেন। ম্যাজিষ্ট্রেটের মেম নিরুপমার ইংরাজী শুনিয়া এবং বিনয়, সৌজন্য ওভদ্রতা দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া গেলেন; এবং তাঁহাকে পতির সঙ্গে একদিন সন্ধ্যার পর তাঁহাদের ভবনে যাইবার জন্য নিমন্ত্রণ করিয়া গেলেন। প্রবোধ ও নিরুপমা একদিন ম্যাজিষ্ট্রেটের বাড়ী গিয়া তাঁহাদের আতিথ্য ও সদাশয়তা দেখিয়া মুগ্ধ

হইয়া আসিলেন। ইহার পরে একদিন বৈকালে ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব নিজ পত্নীর সহিত তাঁহাদের ভবনে আসিয়া উপস্থিত। নিরুপমা তাঁহাদিগকে অভ্যর্থনা করিয়া লইলেন, বাড়ীঘর দেখাইলেন, সহরে কি কি কাজ চলিতেছে তার সংবাদও দিলেন। তিনি নিজের ঘর কিরূপ সুন্দর করিয়া সাজাইয়া রাখিয়াছেন, তাহা দেখিয়া ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব ও তাঁহার পত্নী চমৎকৃত হইয়া গেলেন। ম্যাজিষ্ট্রেটের পত্নী বলিতে লাগিলেন—"কি সুন্দর ঘর সাজিয়েছ! অনেক ইংরেজের বাড়ীতেও এমন দেখা যায় না!" নিরুপমা হাসিয়া বলিলেন—"আমার মার সৌন্দর্য্যজ্ঞান বড় প্রবল; তিনি ছেলেবেলা হতে আমাদের সকলকে ঘর সুন্দর রাখতে শিখিয়েছেন।" তারপর নিরুপমা সেতার বাজাইয়া এবং হারমোনিয়মে বসিয়া গান করিয়া তাঁহাদিগকে শুনাইলেন। ম্যাজিষ্ট্রেটের পত্নী বলিতে লাগিলেন—"তবে দেখি তুমি সকলদিকেই কৃতী; এ দেশের লোকের মধ্যে এমন মেয়ে আছে তা'ত' আগে জানতাম না!"

নিরুপমার আদর অভ্যর্থনা এখানেই শেষ হইল না। মহেশের মুখে তাঁর প্রশংসা শুনিয়া দেবীপ্রসাদের জননী গৃহিণীঠাকুরাণী, একদিন মহেশের দ্বারা, তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠাইলেন। সেদিন দুপুর বেলা তিনি মহেশের সঙ্গে তাঁহাদের বাড়ীতে গেলেন; গিয়া দেখেন গৃহিণী-ঠাকুরাণী রুগ্ন ও ভগ্ন হইয়া শয্যাতে শয়ান আছেন। এই কয়েক বৎসরের মধ্যে তাঁহার শরীর একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে; পূর্ব্বেকার সবলতা ও কর্ম্মিষ্ঠতা আর নাই! মহেশের প্রতি অবিচলিত আস্থা ও প্রীতি পূর্ব্বের মতই রহিয়াছে! তিনি নিরুপমাকে সমাদরে গ্রহণ করিয়া নিজ শয্যার পার্শ্বে বসিবার আসন দেওয়াইলেন। মহেশ তাঁহাকে বসাইয়া দিয়া নিজ কার্য্যে গেলেন। গৃহিণীঠাকুরাণী নিরুপমাকে বলিলেন—"তোমাকে আগে মহেশবাবুর বাড়ীতে দেখেছিলাম, বিশেষ আলাপ

হয় নাই ; গাইনে বাজালে দেখে চমৎকৃত হয়েছিলাম ; তুমি যে এমন মেয়ে তা তখন জানতাম না ; এখন লোকের মুখে শুনছি, তুমি সকল ভাল কাজে তোমার পতির সঙ্গে আছ, বাড়ীটী সুন্দর করে সাজিয়ে বসেছ, চারিদিকের লোককে ভাল কাজে সাহায্য করছ ; শুনে মনে বড়ই আনন্দ হয়েছে, তাই ডেকেছি। আমার আগেকার শরীর আর নাই ; তা না হলে মধ্যে মধ্যে তোমার বাড়ীতে যেতাম ; আমি শয্যায় পড়ে আছি, আর যে উঠবো এমন মনে হয় না ; সময় পেলে মাঝে মাঝে এসে আমাকে দেখে যেও ; তোমাদের দেখলে আনন্দ পাই।”

নিরুপমা। একি সৌভাগ্য, আপনি আমাকে ডেকে পাঠিয়েছেন! আমি বহুদিন আপনাকে শ্রদ্ধাভক্তি করে আসচি ; আপনার সাহায্যেই মহেশবাবু এত কাজ করতে পেরেছেন ; যীরা হাঁসপাতালে যাই, আর আপনার কথা মনে পড়ে! জগদীশ্বর করুন আপনি সেরে উঠুন, উঠে আমাদের সাহায্য করুন।

গৃহিণী ঠাকুরাণী। সেরে ওঠাত আমার হাত নয়? ভগবান যদি তোলেন, উঠবো ; কিন্তু আমার মনে হয়, শেষ শয্যায় শুয়েছি ; তোমরা কাজ কর আমি দেখতে দেখতে চলে যাই!

ইহার পরে গৃহিণীঠাকুরাণী আপনার কন্যা ও পুত্রবধূ প্রভৃতিকে ডাকিয়া নিরুপমার সহিত পরিচিত করিয়া দিলেন ; প্রচুর পরিমাণে মিষ্টান্ন আনাইয়া তাঁহাকে খাওয়াইলেন ; এক টাকা দামের একটী পান খাইতে দিলেন ; এবং একখানি উৎকৃষ্ট মূল্যবান বস্ত্র উপহার দিয়া বিদায় করিলেন।

প্রবোধ ও নিরুপমা কলকারখানার শ্রমজীবীদিগকে যে বলিয়া আসিয়াছিলেন যে, তাঁহারা মধ্যে মধ্যে তাহাদিগকে দেখিতে যাইবেন,

তাহা ভুলিলেন না। মাঝে মাঝে এক এক রবিবার সারদাসুন্দরী ও বীণাপাণিকে সঙ্গে করিয়া সেখানে যাইতে লাগিলেন। তাহাদিগকে সুরাপান ছাড়াইবার জন্য প্রবোধ বিশেষ ভাবে লাগিলেন। তিনি ছবি সংগ্রহ করিয়া শারীর বিদ্যার দিক দিয়া সুরাপানের অনিষ্টকারিতা বুঝাইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন; তাহাতে অনেকে সুরাপান পরিত্যাগ করিতে লাগিল। এই সূত্রে কিলবরণ সাহেবের সঙ্গে তাঁহাদের আলাপ পরিচয় ও আত্মীয়তা হইল। কিলবরণের জীবনে একটী পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। মহেশের সঙ্গে যখন তাঁহার প্রথম আলাপ হয় তখন তিনি অবিবাহিত ছিলেন। এই কয়েক বৎসরের মধ্যে বিবাহ করিয়া একটী সহৃদয়া নারীকে নিজ ঘরে আনিয়াছেন। এই রমণী অবিবাহিত অবস্থায় কয়েক জন নরহিতৈষিণী নারীর সহকারিণী হইয়া দার্জ্জিলিং ও তন্নিকটস্থ পাহাড়ে শ্রমজীবীদের মধ্যে কাজ করিতেন। বিবাহের পর এখানে আসিয়া তাঁহার সেই পরহিতৈষণা প্রবৃত্তি কার্য্য করিবার স্থান পাইয়াছে। শ্রমজীবীদের অবস্থার উন্নতির দিকে তাঁহার বিশেষ মনোযোগ দৃষ্ট হয়। মহেশ পশ্চাতে থাকিয়া তাঁহাকে অনেক সাহায্য করিয়া আসিতেছেন। এক্ষণে প্রবোধ ও নিরুপমাকে দেখিয়া তাঁহার আনন্দ ও উৎসাহ বাড়িয়া গেল। তাঁহাদিগকে তিনি ডাকিয়া, আদর করিয়া, নিজ গৃহে বসাইলেন; এবং চা রুটী খাওয়াইয়া নিজের বন্ধুতার দ্বারা প্রীত করিয়া বিদায় করিলেন। তাঁহারা আসিয়া এই সকল কথা যখন মহেশকে জানাইলেন, তখন মহেশ আনন্দিত হইয়া নিরুপমার হাতে ধরিয়া বলিতে লাগিলেন—"দেখ নিরুপমা, আমার শরীর ক্রমে দুর্ব্বল হয়ে আসচে; কিছুদিন পরেই আমি কাজের বাহির হয়ে যাব; তাই ঈশ্বর আমার কাজ কাঁধে লইবার জন্য তোমাদিগকে এনেছেন! উৎসাহে কাজ কর, আমি পশ্চাতে আছি।"

এইরূপে শ্রীবোধ ও নিরুপমা তাঁহাদের বিবাহিত ও সম্মিলিত জীবনকে নানা প্রকার সৎকার্য্যে রত রাখিলেন।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

লেডী ডাক্তার সরোজিনী যে বিধবাটীকে জগদ্ধাত্রী সদনে দিয়াছিলেন, এবং যার ছেলেমেয়েগুলিকে নিজের ভবনে স্থান দিয়াছিলেন, সেই বিধবাটী এই কালের মধ্যে সারদাসুন্দরীর সাহায্যে বিশেষ শিক্ষা লাভ করিয়াছেন এবং কাজের মানুষ হইয়াছেন। মহেশ মাসিক বেতনের বন্দোবস্ত করিয়া সারদাসুন্দরীর স্থানে তাঁহাকে বিধবাশ্রমের কাজে বসাইয়াছেন; এবং জগদ্ধাত্রী সদনের নিকটবর্ত্তী বিন্ধ্যবাসিনীর পুরাতন বাড়ীতে তাঁহাকে স্বীয় পুত্র ও কন্যাগণসহ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। তাহার সাহায্যের জন্য একটী মেয়ে সেখানে থাকে। বিধবাটী প্রাতে উঠিয়া সন্তানদের আহারাদির বন্দোবস্ত করিয়া জগদ্ধাত্রী সদনে আসেন; সেখানকার কাজ করেন; পরে সাড়ে নয়টার সময় বাড়ীতে গিয়া ছেলেদের খাওয়া দাওয়া দেখেন; তাহারা স্কুলে গেলে সেখানে স্নানাহার করিয়া বিধবাশ্রমে আসিয়া বিশ্রাম করেন; অপরাহ্নে ছেলেরা স্কুল হইতে আসিলে একবার গিয়া সায়ংকালের আহারাদির ব্যবস্থা করেন; পরে তাহাদিগকে সঙ্গে করিয়া জগদ্ধাত্রী সদনে আসেন; এবং সেখানেই তাহাদিগকে পাঠে বসাইয়া দেন; পরে রাত্রে বাড়ীতে গিয়া আহারাদি করিয়া সেখানেই রাত্রি যাপন করেন। বিন্ধ্যবাসিনী বিধবাদের সহিত এ বাড়ীতে থাকেন। এইরূপে জগদ্ধাত্রী সদনের কাজ নিরুপদ্রবে ও অবাধে চলিতেছে। ঐ বিধবাটী আসার পর আরও কয়েকটী বিধবা জুটিয়াছেন; শিল্পাশ্রমে তাঁহাদিগকে শিল্প শেখান হয়; দুপুর বেলা বালিকা বিদ্যালয়ের পার্শ্বে বসাইয়া ঐ বিদ্যালয়ের শিক্ষকদিগের দ্বারা তাঁহাদিগকে শিক্ষা

দেওয়ান হয়; তাঁহাদের মধ্যে যিনি যিনি ব্রাহ্ম সমাজের উপাসনাতে উপস্থিত হইতে চান, সারদাসুন্দরী বা নিরুপমা তাঁহাদিগকে সঙ্গে করিয়া উক্ত উপাসনাতে লইয়া যান; এইরূপে কাজ চলিতেছে।

জগদ্ধাত্রী-সদনের কার্য্যের প্রতি মহেশের সর্ব্বপ্রধান দৃষ্টি। তিনি প্রায় প্রত্যহ একবার করিয়া উক্ত সদনে আসেন; বিন্ধ্যবাসিনীর সঙ্গে বসিয়া আয় ব্যয়ের হিসাব দেখেন; কি কি প্রয়োজন তাহা অনুসন্ধান করেন; কাহারও পীড়াদি হইলে চিকিৎসাদির ব্যবস্থা করেন; এবং পাঠ ও শিল্পাদিতে বিধবাগণ কিরূপ উন্নতি লাভ করিতেছেন তাহার খবর লন। নিজ গৃহে আর একটী কাজে তাঁর বিশেষ মনোযোগ দৃষ্ট হয়; সেটী বীণাপাণিকে মানুষ করিয়া তোলা। বীণাপাণিকে তিনি স্কুলে দেন নাই; তার শিক্ষার ভার প্রধানতঃ নিজের উপরে রাখিয়াছেন। তাহাকে সংস্কৃত শিখাইবার জন্য ন্যায়রত্ন মহাশয়কে রাখিয়াছেন এবং ইংরাজী শিখাইবার জন্য একজন মিশনারি মেমকে নিযুক্ত করিয়াছেন। মেমটী বৈকালে আসেন, তাহাকে ইংরাজী পড়ান ও পিয়োনো বাজাইতে শেখান। এতদ্ভিন্ন একজন মুসলমান ওস্তাদকে সেতার শিখাইবার জন্য নিযুক্ত করা হইয়াছে। সকল বিষয়েই বীণাপাণির বিশেষ পারদর্শিতা দেখা যাইতেছে। মেয়েটী বড় প্রতিভাশালিনী! একবার যে বিষয়ে মন দেয় তাহাতে পারদর্শী হইয়া উঠে। অঙ্ক শাস্ত্রে তার বিশেষ দক্ষতা, মেয়ে হইয়া অঙ্ক বিদ্যাতে এরূপ পরিপক্ক দেখিয়া সকলেই আশ্চার্য্যান্বিত হয়। ভিতরকার কথা এই, মহেশ নিজে তাহাকে অঙ্ক শিখাইয়াছেন। প্রতিভাশালিনী মেয়ে একটু বড় হইয়াই বাড়ীর খরচ পত্রের হিসাব রাখা, জগদ্ধাত্রী-সদন প্রভৃতির হিসাব দেখা, পিতার আফিসের হিসাব পত্রের কাগজ পরীক্ষা করিয়া দেওয়া প্রভৃতি করিয়া থাকে। মহেশ তাহার অঙ্কশাস্ত্র-পারদর্শিতা দেখিয়া হাসিয়া বলেন, "দেখ বীণাপাণি,

তোমাকে এই সহরের একাউন্টান্ট করিলে হয়। বার্দ্ধক্যে বীণাপাণির সাহায্যে চারিদিকের হিসাব পত্র কলের মত চলিতেছে! সেটা মহেশের এত কাজের মধ্যে নিরুদ্বেগের একটা প্রধান কারণ। কেবল তাহাই নহে; বয়োবৃদ্ধি সহকারে বীণাপাণি সর্ব্ববিধ জনহিতকর কার্য্যে পিতার দক্ষিণ হস্ত হইয়া উঠিয়াছে। জগদ্ধাত্রী-সদন, শিল্পাশ্রম, বালিকা বিদ্যালয়, মীরা হাঁসপাতাল প্রভৃতি সকল দিকেই তাহার মনোযোগ। অনেক সময় মহেশ এই সকল স্থানে যাইবার সময় বীণাপাণিকে সঙ্গে করিয়া যান। লোকে পিতা ও কন্যাকে একত্র ভাল কাজে বাহির হইতে দেখিলেই আনন্দিত হয়; বলে—"যেমন বাপ, তেমনি মেয়ে।" এইরূপে বৎসরের পর বৎসর যাইতে লাগিল। লোকে বীণাপাণির সম্মুখে ক্ষীরদার নিকট বীণাপাণির বিবাহের প্রস্তাব উপস্থিত করিলে বীণাপাণি হাসিয়া বলে—"এত ব্যস্ত কেন? আমি কি মা বাপের গলগ্রহ হয়েছি? মার শরীর খারাপ হচ্চে, আমি গেলে বাবাকে দেখবে কে?" ফল কথা বীণাপাণির বিবাহের দিকে মনই নাই; মনের আনন্দে ও উৎসাহে পিতা মাতা ভাই ভগিনীর সেবাতে নিযুক্ত আছে।

সুরেনকে পড়াইবার ভার বীণাপাণির উপরে; তাহাতেও বীণা-পাণির প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। তাহাকে শিখাইবার জন্ম তিনি নূতন প্রণালী অবলম্বন করিয়াছেন। নানা রঙের তাস ও ঘাঁটুল, ম্যাপ, ছবি, প্রভৃতি সংগ্রহ করিয়াছেন; সুরেন সেই সকলের সাহায্যে যখন পাঠে মগ্ন থাকে, তখন বুঝিতেই পারে না যে পড়িতেছে বা কিছু শিখিতেছে। অথচ বাড়ীতে সে যাহা একমাসে শেখে, সচরাচর স্কুলে ছেলেরা তাহা ছয় মাসেও শেখে না। বীণাপাণির শিখাইবার কৌশল দেখিয়া সকলেই আশ্চর্য্য।

নিরুপমা বহরমপুরে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার কিছুদিন পরে, ক্ষীরদার সর্ব্ব

কনিষ্ঠ মেয়েটী যখন এক বৎসরের, তখনকার একটী ঘটনা উল্লেখযোগ্য। সে ঘটনাটী এই :—সেবার পূজার ছুটীর সময় ডাক্তার ভদ্র তাঁর হাঁস-পাতালের কাজ হইতে দুই মাসের জন্য অবসর লইয়া নিস্তারিণী ও তাঁহার ক্রোড়স্থিত একটী কন্যা ও একটী পুত্রকে লইয়া বহরমপুরে মহেশের ভবনে আসিয়া প্রতিষ্ঠিত হইলেন! অপর দিকে সেই সময়েই মহেশের বন্ধু বিধুশেখর গুপ্ত মহাশয়ও সপরিবারে আসিয়া নিরুপমার ভবন আশ্রয় করিলেন। ইঁহাদিগকে সমবেত দেখিয়া ক্ষীরদার ইচ্ছা হইল যে তাঁর কনিষ্ঠা কন্যাটীর নামকরণ করা হয়। অগ্রেই তাহার নামকরণ করা উচিত ছিল; কিন্তু এতদিন তাহা হয় নাই; 'খুকী, খুকী' বলিয়াই সকলে তাহাকে ডাকিতেছে। নামকরণের প্রণালী বিষয়ে সকলে পরামর্শ করিয়া এই স্থির হইল যে, সুরেনের নাম করণের সময় যেমন প্রাতে জগদ্ধাত্রী-দেবীর পূজা গৃহে ভগবানের অর্চ্চনা করিয়া নাম রাখা হইয়াছিল, তেমনি খুকীরও নাম দেওয়া হইবে এবং সন্ধ্যাকালে বন্ধুদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া ঐকতান বাদ্য শোনান হইবে। কিন্তু সেবার ঢুলীদিগের যে বাজনা হইয়াছিল, তাহা আর হইবে না; এবং সেবারে যত লোক খাওয়না হইয়াছিল, তাহাও হইবে না। তৎপরিবর্ত্তে দরিদ্রদের ঘরে গিয়া তাহাদের অবস্থা জানিয়া তাহাদিগকে দান করা হইবে। কারণ, এবারে বর্ষার ব্যতিক্রম ঘটিয়া স্থানে স্থানে দুর্ভিক্ষ এবং সাধারণতঃ দরিদ্র প্রজাদের বড় অন্নকষ্ট উপস্থিত হইয়াছে। মেয়েদের অনুরোধে প্রবোধ ও ডাক্তার ভদ্র দরিদ্রদের বাড়ী বাড়ী গিয়া অনুসন্ধান করিবার ভার লইলেন। এক রবিবার প্রাতে ন্যায়রত্ন মহাশয়কে ডাকিয়া জগদ্ধাত্রী দেবীর পূজার ঘরে, সকলে মিলিয়া ভগবানের স্তুতি পাঠ পূর্ব্বক খুকীর নাম দেওয়া হইল। বীণাপাণির অনুরোধে তার নাম "সুজাতা" রাখা হইল। বীণাপাণি বৌদ্ধধর্ম্মের ইতিবৃত্তে সুজাতার বিবরণ পড়িয়া নিজের ভগিনীর নাম

সুজাতা রাখিবার জন্য ব্যগ্র হইয়াছিলেন; তদনুসারেই খুকীর সুজাতা নাম দেওয়া হইল।

নাম করণের দিন সন্ধ্যাকালে ঐকতান বাদনের আয়োজন হইল। শিল্পাশ্রম ও জগদ্ধাত্রী-সদনের মেয়েরা এবং সহরের অনেক ভদ্রঘরের মেয়েরা আসিয়া ঐকতান বাদনের পার্শ্বের ঘরে আশ্রয় লইলেন। দেবী-প্রসাদের জননী গৃহিণী ঠাকুরাণী রোগশয্যায় পড়িয়া থাকাতে এবারে আর আসিতে পারিলেন না! তাঁহার অনুপস্থিতি নিবন্ধন তাঁহার পুত্র-বধূ ও কন্যারাও আসিলেন না। যথাসময়ে মনোরমা, নিরুপমা, নিস্তারিণী, সারদাসুন্দরী বীণাপাণি প্রভৃতি স্বীয় স্বীয় বাদ্যযন্ত্র লইয়া ঐকতান বাদনে বসিলেন; ডাক্তার ভদ্র ও তাঁহার আর একজন বন্ধু বেহালা লইয়া দাঁড়াইলেন। যে মুসলমান ওস্তাদটী বীণাপাণিকে সেতার শেখায়, সেও এসরাজ লইয়া একপার্শ্বে বসিল। পার্শ্ববর্ত্তী বৈঠক ঘরে মহেশ ও তাঁহার নিমন্ত্রিত যুবক বন্ধুগণ বসিলেন। গুপ্ত মহাশয়ের গৃহিণী মনোরমা অধিনেত্রীরূপে হারমোনিয়মে বসিয়া সাহায্য করিতে লাগিলেন। এইরূপে আনন্দে সেদিনকার সায়ংকালটা অতীত হইল।

তৎপরদিন প্রাতে প্রবোধ ও ডাক্তার ভদ্র দরিদ্র প্রজাদের পাড়ায়, তাহাদের অবস্থা বিষয়ে অনুসন্ধান করিবার জন্য গেলেন। তাঁহারা তাহাদের কুটীরে কুটীরে ঘুরিয়া পরিদর্শন করিতে লাগিলেন। যাহা দেখিলেন ও শুনিলেন তাহাতে হৃদয়ে বড় বেদনা পাইতে লাগিলেন। অনেক স্থানে দেখিলেন তাহাদের সেদিন খাইবার কিছুই নাই; কাহাকেও তিন টাকা, কাহাকেও দুই টাকা, কাহাকেও এক টাকা এইরূপ করিয়া দান করিতে লাগিলেন। অনেক গৃহে ডাক্তার ভদ্র দেখিলেন যে, স্ত্রীলোক ও বালক বালিকা একপ্রকার নূতন জ্বরে পীড়িত

হইয়া পড়িয়া আছে, দেখিবার কেহ নাই; ঔষধ পথ্যাদি পাইতেছে না; প্রায় ছয় সাত জন স্ত্রীলোকের পীড়া বড় কঠিন বোধ হইল। বাড়ীর লোককে সেই মেয়েদিগকে মীরা হাঁসপাতালে লইয়া যাইতে বলিলেন; কিন্তু তাহাদের পুরুষেরা বলিল—"তা কি হয়, লোকে কি বলবে?" তখন তাঁহারা বাড়ীতে ফিরিয়া আসিলেন। আসিয়া মেয়েদিগকে পীড়িত স্ত্রীলোকদিগের সংবাদ দিলেন। শুনিয়া নিরুপমা মেয়েগুলিকে মীরা হাঁসপাতালে আনিবার জন্ত ব্যগ্র হইয়া উঠিলেন; বলিলেন—"আমি গিয়ে তাদের বোঝাব। মেয়ে হাঁসপাতাল কাছে থাকতে তারা কিনা বিনা চিকিৎসায় মারা যাবে! তা হবে না"। সেইদিন দুপুরে বিশ্রামের পর গাড়ী করিয়া ঐ সকল গৃহে যাওয়া স্থির হইল। সারদাসুন্দরী নিরুপমার সঙ্গে যাইতে প্রস্তুত হইলেন। ডাক্তার ভদ্র বৈকালে গাড়ী করিয়া তাঁহাদিগকে লইয়া সেই সকল বাড়ীতে গেলেন। নিরুপমা ও সারদাসুন্দরী গিয়া সেই সকল স্ত্রীলোকের আত্মীয়দিগকে বুঝাইতে লাগিলেন; বলিলেন—"মেয়ে হাঁসপাতালে গিয়ে দেখ; সেখানে অন্ত লোক যায় না; মেয়ে ডাক্তার, মেয়ে চাকরাণী, সব মেয়েরা করে। তোমাদের কোনও অসুবিধা হবে না, তোমরা গিয়ে দেখবে, শুনবে, দেখে ঘরে আসবে। এখানে মেয়েদের দেখবে কে? রোগে ভুগে ভুগে মরবে!"

তাঁহাদের বোঝানর ফলে এই হইল যে তিনটী মেয়ে মীরা হাঁসপাতালে যাইতে স্বীকৃত হইল। তাঁহারা সেই তিনটী মেয়েকে নিজেদের গাড়ীতে করিয়া হাঁসপাতালে পাঠাইলেন; নিজেরা সেখানে বসিয়া রহিলেন। অবশেষে গাড়ী ফিরিয়া আসিলে নিজেরা হাঁসপাতালে গেলেন; এবং লেডী ডাক্তার সরোজিনীর প্রতি তাহাদের ভার দিয়া আসিলেন।

একদিকে যখন এই কাজ চলিতে লাগিল তখন অপর দিকে সম্মিলিত বন্ধুগণের আনন্দ উল্লাসের অবধি রহিল না। গুপ্ত মহাশয় ও ডাক্তার ভদ্রের পরিবারস্থ ব্যক্তিগণ অগ্রে এরূপ একত্রে মহেশের গৃহে বাস করেন নাই। সকলকে একত্রে পাইয়া মেয়েরা আনন্দে বিভোর হইতে লাগিল; ছুটাছুটি, হাসাহাসি, খেলাধূলা, নানা স্থান দেখা প্রভৃতিতে কোথা দিয়া দিন যাইতে লাগিল তাহা যেন তাহারা বুঝিতেই পারিল না। নিরুপমার বাড়ী মহেশের বাড়ীর নিকটস্থ হওয়াতে যাহার যে বাড়ীতে ইচ্ছা খাওয়া শোওয়া আরম্ভ করিল; দেখিয়া পিতা মাতার হৃদয় আনন্দে প্লাবিত হইতে লাগিল! এইরূপে ছুটীর সময়টা সুখেই কাটিয়া গেল।

ইহার পরে ডাক্তার ভদ্র ও গুপ্ত মহাশয়ের পরিবারগণ কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলেন; প্রবোধ ও নিরুপমা স্বীয় স্বীয় কার্য্যে রত হইলেন; এবং মহেশ বীণাপাণিকে সহায় করিয়া আপনার কার্য্য চালাইতে লাগিলেন। মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর অতীত হইতে লাগিল।

কয়েক বৎসর পরে মহেশ দেবীপ্রসাদ বাবুদের কর্ম্ম হইতে অবসৃত হইলেন। তখন গৃহিণীঠাকুরাণী ও বাবু গোপাললাল ইহলোক হইতে অবসৃত হইয়াছেন; দেবীপ্রসাদ প্রবীণ হইয়াছেন; মহেশের তত্ত্বাবধানে তাঁহার বিষয় কিরূপ উন্নতি লাভ করিয়াছে, তাহা তিনি দেখিয়াছেন; এবং সেজন্ত তাঁহার নিকট চিরকৃতজ্ঞ ও শ্রদ্ধাতে নত। মহেশ যখন কর্ম্ম হইতে অবসৃত হইবার ইচ্ছা জানাইলেন, তখন তাঁহার মনে দারুণ চিন্তা আসিল; —এমন করিয়া বিষয় দেখিবে কে? কিন্তু মহেশের শরীর রুগ্ন ও দুর্ব্বল হইয়া যাইতেছে এজন্ত দেবীপ্রসাদ "না" বলিতেও পারিলেন না; বাধ্য হইয়া সম্মত হইলেন; মনে মনে স্থির করিলেন যে, তিনি যতকাল জীবিত

থাকিবেন, ততকাল তাঁহাকে মাসিক দুইশত টাকা পেনসন দিবেন ; এবং তাঁহাকে বিদায় দিবার দিন নিজের আত্মীয়, স্বজন, বন্ধুবান্ধব, সহরের ভদ্রলোক, ইংরাজ, বাঙ্গালী, সকলকে ডাকিয়া সভা করিয়া সেই সভা মধ্যে তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিয়া উপহার দিয়া বিদায় করিবেন।

তদনুসারে একদিন আত্মীয় স্বজন, নিজের প্রজাদের মধ্যে বিশিষ্ট ব্যক্তি, ও সহরের ভদ্রলোকদিগকে ডাকা হইল। মহেশ কর্ম্ম হইতে অবসৃত হইতেছেন, সম্মানার্থ সভা হইতেছে, শুনিয়া সর্ব্বশ্রেণীর লোক সভার দিকে ধাবিত হইল। ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব সস্ত্রীক এবং কারখানার বৃদ্ধ কিলবরণ সাহেব সস্ত্রীক উপস্থিত হইলেন। সভার মধ্যে দেবীপ্রসাদ তাঁহার গুণাবলি বর্ণন করিয়া এবং তাঁহাদ্বারা স্বীয় বিষয়ের কিরূপ উন্নতি হইয়াছে তাহা নির্দ্দেশ করিয়া একটী উপহার-পত্র পাঠ করিলেন; ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব ও কিলবরণ সাহেব তাঁহার সাধুতা, সদাশয়তা ও কর্ত্তব্য-নিষ্ঠার বিষয়ে কিছু কিছু বলিলেন; তৎপরে বাবু দেবীপ্রসাদ একখানি রূপার থালাতে করিয়া প্রায় এক হাজার টাকার মোহর ও অপরাপর মূল্যবান দ্রব্য সাজাইয়া উপহার দিলেন। মহেশ উঠিয়া সেগুলি যখন গ্রহণ করিলেন, তখন চারিদিকে করতালি ধ্বনি পড়িয়া গেল। মহেশ দেবীপ্রসাদের প্রশংসা-পত্রের ও বন্ধুগণের উক্তির উত্তরে কিছু বলিবেন বলিয়া দাঁড়াইলেন; কিন্তু ভাবাবেশে কণ্ঠরোধ হইয়া বলিতে পারিলেন না; চক্ষের জল মুছিয়া আসন পরিগ্রহ করিলেন। সভার মধ্য হইতে একজন ভদ্রলোক বলিয়া উঠিলেন, "ঐ গুণেই ত আপনার চরণে সকলে নত।" অমনি চারিদিক হইতে প্রতি-ধ্বনি উঠিল,—ঠিক! ঠিক!

বিষয় কর্ম্ম হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া মহেশ জগদ্ধাত্রী-সদনকে স্থায়ী ভিত্তির উপর স্থাপন করিবার জন্য ব্যগ্র হইলেন। যাহার সুদ হইতে

তাহার মাসিক ব্যয় নির্ব্বাহ হইতে পারে এরূপ কয়েক হাজার টাকা স্থানীয় মিউনিসিপালিটীর হাতে দিয়া, তিনজন ট্রাষ্টী নিয়োগের বন্দোবস্ত করিলেন; এবং সেই মর্ম্মে একখানি দানপত্র লিখিয়া রেজেষ্টারী করিয়া রাখিলেন। তৎপরে নিজের বিষয় বিভবের সংরক্ষণের জন্য এক উইল লিখিয়া রেজিষ্টারি করিলেন; তাহাতে স্বীয় পত্নী ও পুত্র-কন্যার রক্ষা ও শিক্ষার সমুচিত ব্যবস্থা করা হইল। দেশে বাসগ্রামে তাঁহার যে সম্পত্তি ছিল, তাহার ব্যবস্থা-বিষয়ে চিন্তা উপস্থিত হইল। বাসগ্রামে পৈতৃক বাসভূমিতে বংশের কেহ থাকে এটা প্রার্থনীয় বোধ করিয়া গিরিশের সঙ্গে চিঠিপত্রে পরামর্শ করিতে লাগিলেন; গিরিশ কথা দিলেন যে তিনি তাহার বন্দোবস্ত করিবেন; সুতরাং দানপত্র লিখিয়া সে সমুদয় সম্পত্তি গিরিশকে দান করা হইল।

ইহার পরে তিনি একবার বাসগ্রামে যাওয়া স্থির করিলেন। তিনি ক্ষীরদা ও ছোট কন্যা সুজাতাকে সঙ্গে করিয়া সেখানে গেলেন; যাইবার সময় ক্ষীরদার বাপের বাড়ী হইয়া তাঁহাকে দেখাইয়া লইয়া গেলেন। গ্রামে গিয়া নিজের বাসভবনে উঠিলেন। যাঁহারা তখন সে ভবনে বাস করিতেছিলেন তাঁহারা সমাদরে তাঁহাদিগকে গ্রহণ করিলেন। গ্রামে গিয়া মহেশ কি পরিবর্ত্তনই লক্ষ্য করিতে লাগিলেন! ব্রজনাথ দত্ত মহাশয় আর নাই; তাঁহার পিসা মহাশয় ও পিসী মাতাঠাকুরাণী নাই; এ জগত হইতে তাঁহার যৌবন সুহৃদগণের মধ্যে অনেকে চলিয়া গিয়াছেন; অবশিষ্ট ব্যক্তিগণের মধ্যে অনেকে কর্ম্মসূত্রে নানাস্থানে বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িয়াছেন; যে দুই চারি জন আছেন, তাঁহারাও রুগ্ন ভগ্ন; মহেশ তাঁহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া নিজের প্রীতি ও সদ্ভাব জানাইলেন। তৎপরে আর এক কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহাদের বাস-ভবনের এককোণে যে ঠাকুর-ঘরটী ছিল, সেইটীকে মেরামত করিয়া,

সুন্দররূপে গঠন করিয়া, স্বীয় জননীর স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ শ্বেতপ্রস্তর ফলকে "জগদ্ধাত্রীমন্দির" খোদাইয়া, তাহার দ্বারের উপর বসাইলেন। গিরিশের সহিত কথা রহিল যে সে মন্দির চিরদিন ঐ ভাবে রক্ষা করিবার বন্দোবস্ত করিবেন। তদ্ব্যতীত গিরিশের সম্মতি ক্রমে পৈতৃক ভূমির আয় ও নিজের প্রদত্ত অর্থের স্থদ এই উভয়ের দ্বারা ঐ মন্দিরের পূজা চালাইবার বন্দোবস্ত করিলেন।

এই সকল কার্য্য শেষ করিতে কয়েক মাস অতীত হইল। সে কালের জন্য তাঁহারা কলিকাতায় গুপ্ত মহাশয়ের ভবনে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন; এবং মধ্যে মধ্যে গিরিশের সঙ্গে দেখা করিয়া ও লোক পাঠাইয়া মন্দিরনির্ম্মাণের বন্দোবস্ত করিতে লাগিলেন। তখন ডাক্তার ভদ্র ও নিস্তারিণী সহরে নাই। ডাক্তার ভদ্র উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের এক বড় হাসপাতালে কর্ম্ম লইয়া সেখানে গিয়াছেন; এবং সেখানে গিয়া নানা সৎকার্য্যের সৃষ্টি করিতেছেন।

স্বদেশ হইতে ফিরিয়া আসিয়া মহেশ জ্বরে পড়িলেন। লোকে বলিতে লাগিল তাঁহাকে ম্যালেরিয়াতে ধরিয়াছে; কারণ জ্বর ছাড়িয়াও ছাড়ে না; দুই দিন ভাল থাকিলে আবার জ্বর আসে; শরীর ভাঙ্গিয়া যাইতে লাগিল; অরুচি, অনিদ্রা, মাথাধরা হাত পা জ্বালা প্রভৃতি নানা উপসর্গ দেখা দিতে লাগিল। তিনি এত কাহিল হইয়া পড়িলেন যে শয্যা হইতে উঠিতেই ক্লেশ হয়। তাঁহার এই অবস্থাতে ক্ষীরদা, নিরুপমা ও বীণাপাণি প্রভৃতি তাঁহার পরিচর্য্যাতে নিযুক্ত হইলেন। জগদ্ধাত্রী-সদন হইতে সারদাসুন্দরী ও বিন্ধ্যবাসিনী প্রতিদিন প্রাতে ও সন্ধ্যাতে আসিতে লাগিলেন। সারদাসুন্দরীর ইচ্ছা হইতে লাগিল যে তিনি মহেশের ভবনে প্রতিষ্ঠিত হন; কিন্তু মহেশ তাহাতে সম্মত হইলেন না; বলিলেন, "তা হবে না, সেখানকার কাজ দেখিবার ভার তোমার উপর,

তুমি আসিলে চলিবে না; ক্ষীরদা ও বীণাপাণি আমাকে দেখিতেছেন, তৎপরে নিরুপমাও নিকটে আছেন, আবশ্যকমত সাহায্য করিতে ত্রুটী করছেন না; ইহাতেই চলে যাবে; আমি শীঘ্রই সেরে উঠবো"। কাজেই সারদাসুন্দরী আপনার মনের আবেগ সম্বরণ করিতে বাধ্য হইলেন।

মহেশ যাহা ভাবিয়াছিলেন তাহা হইল না। তিনি শীঘ্র সারিয়া উঠিতে পারিলেন না; মাসের পর মাস যাইতে লাগিল; সহরের বন্ধু-বান্ধবগণ সকলেই মহা চিন্তার মধ্যে বাস করিতে লাগিলেন। প্রাতে ও বৈকালে দলে দলে তাঁহারা আসিতে লাগিলেন; এবং কোনও বিষয়ে তাঁহাদের সাহায্যের প্রয়োজন আছে কি না জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন।

সর্ব্বাপেক্ষা অধিক শ্রম ও দুশ্চিন্তা আরম্ভ হইল বীণাপাণির; ব্যারামে যথাসময়ে ঔষধ খাওয়ান, শয্যাদি পরিবর্ত্তন করান, বস্ত্রাদি ছাড়ান, ঠিক সময়ে আহার করান, এই সকলের প্রতি প্রধান দৃষ্টি রাখিতে হইতেছে; তাহার উপরে খরচপত্র দেখা, হিসাব রাখা, চাকরবাকর চালান এ সকলও দেখিতে হয়। এখানেও বীণাপাণির নিষ্কৃতি নাই; তিনি পিতার হাত হইতে জগদ্ধাত্রীসদন দেখা, মীরা হাসপাতালের কাজকর্ম্ম দেখা, মিউনিসিপ্যালিটীর হিসাবপত্র প্রভৃতি দেখার ভারও লইয়াছেন। মহেশ বলিয়াছিলেন—"এসব কাজ এখন থাক, আমি উঠে দেখব; তুমি এত কাজ দেখে উঠতে পারবে না।" তাহার উত্তরে বীণাপাণি বলিয়াছেন,—"কি বল বাবা, তুমি কবে উঠবে তার ঠিক কি, ও সকল দেখা ত আমার অভ্যাস আছে। কাজগুলি পড়ে থাকলে তোমার মনটা খারাপ হবে; তাতে তোমার শরীর আরো খারাপ হয়ে যাবে।" এই বলিয়া বীণাপাণি সেই সকল কাজেও লাগিয়াছেন। সপ্তাহের মধ্যে তাঁর তিন চারিদিন বৈকালে নিরুপমার সঙ্গে জগদ্ধাত্রীসদন, মীরা হাসপাতাল প্রভৃতি

স্থানে গিয়া থাকেন এবং কোন কাজ কিরূপ চলিতেছে, কোন কাজে কিরূপ সাহায্যের প্রয়োজন, কোন বিষয়ে বিশেষ মনোযোগ আবশ্যক, এই সকল জানিয়া আসেন। তাহার মধ্যে যে বিষয়গুলিতে মহেশের সাহায্য ও পরামর্শ আবশ্যক সেইগুলিই তাঁহাকে জানান, অবশিষ্টগুলি নিরুপমার সহিত পরামর্শ করিয়া তাঁহারই সাহায্যে নিজে সম্পন্ন করেন।

আগে মনে করা গিয়াছিল মহেশ বড় জোর এক মাস শয্যাতে পড়িয়া থাকিবেন, কিন্তু ফলে দাঁড়াইল যে তিনি চারি মাস শয্যাতে আবদ্ধ রহিলেন; চারি মাস পরে যখন উঠিলেন তখনও কাজ করিবার হালে আসিতে আরও কিছু দিন গেল। ইতিমধ্যে আর এক বিপদ উপস্থিত। বোধ হয় মহেশের পীড়ার অবস্থার দুর্ভাবনা, রাত্রিজাগরণ, স্নানাহারের অনিয়ম প্রভৃতি কারণবশতঃ ক্ষীরদা একপ্রকার বিকৃত-মস্তিষ্ক-জনিত জ্বরে পড়িয়া গেলেন। জ্বরটা প্রথম হইতেই ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করিল। প্রলাপ বকা, বালিশ প্রভৃতি ছুড়িয়া ফেলা, মুখে নানাপ্রকার শব্দ করা, মাঝে মাঝে ধুড় মুড় করিয়া উঠিয়া বসা ও ঘরের বাহির হইবার চেষ্টা করা আরম্ভ হইল; তাঁহাকে সামলান আর একা বীণাপাণির সাধ্যে কুলায় না; বাধ্য হইয়া বিন্ধ্যবাসিনীকে জগদ্ধাত্রী-সদন হইতে ছুটী লইয়া এবাড়ীতে আসিতে হইল; বীণাপাণি, নিরুপমা, ও বিন্ধ্যবাসিনী, পালা করিয়া রোগীর সেবা আরম্ভ করিলেন। বহরমপুরের বিজ্ঞ চিকিৎসকদিগের দ্বারা যতদূর হয়, তাহা আর করিতে বাকি রহিল না; কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না; ক্ষীরদা কয়েকদিনের মধ্যেই ভবধাম পরিত্যাগ করিলেন। মহেশের ঘর অন্ধকার হইয়া গেল! তিনি তখনও বাড়ীর বাহির হন নাই। সকলে অনুমান করিতে পারেন, তাঁহার পক্ষে কি পরীক্ষাই আসিল!— রাত্রিদিন একাকী ক্ষীরদার শয়নগৃহের পার্শ্বে বসিয়া থাকা, ও তাঁর

গুণাবলী স্মরণ করা, সে কি বিষাদজনক অবস্থা! এই অবস্থাতে বীণাপাণি তাঁহার একমাত্র বিনোদনের উপায় হইয়া দাঁড়াইলেন। তিনি পিতাকে বিষণ্ণ মুখে একা বসিয়া থাকিতে দেখিলেই কাছে আসিয়া বসেন; এবং এটা ওটা করিয়া তাঁহার চিত্তকে চিন্তান্তরে লইয়া যাইবার চেষ্টা করেন।

ক্রমে সুস্থ ও সবল শরীর হইয়া মহেশ কাজকর্ম্মে বাহির হইতে লাগিলেন; এবং সুরেন ও সুজাতার শিক্ষাদিতে মনোযোগী হইতে সমর্থ হইলেন। বীণাপাণি ছায়ার ন্যায় তাঁহার অনুগামিনী; বাড়ীর সকল কাজের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা তাঁর প্রতি মনোযোগ; রাত্রে সুজাতাকে লইয়া যেখানে জননী আগে শয়ন করিতেন, পিতার পার্শ্বের ঘরে সেই স্থলেই শয়ন করেন, পিতা একটু হুঁ, আঁ্যা, করিলেই উঠিয়া বসেন, "কেন বাবা হুঁ আঁ করছ, কিছু কষ্ট কি হচ্ছে? বলিয়া জিজ্ঞাসা করেন। মহেশ বলেন ও কি! আমার কোনও কষ্ট নাই; তুমি আমার ঘরের পাশে থেক না, তা হলে ঘুমটুম হবে না"। বীণাপাণি সে কথাতে কর্ণপাত করেন না, সে ঘর ছাড়িয়া যান না।

ক্রমে আর এক পরীক্ষা আসিয়া উপস্থিত। মহেশ যখন উৎসাহের সহিত পূর্ব্বের ন্যায় আবার কাজকর্ম্ম করিতেছেন, তখন মিষ্টার বি,মুখার্জ্জি নামে একজন বিলাত ফেরত সিবিলিয়ান যুবক এসিষ্টাণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট হইয়া বহরমপুরে আসিলেন। অপরাপর ভদ্রলোকদিগের ন্যায় মহেশেরও সহিত তাঁহার আলাপ হইল। মানুষটীর সৌজন্য ও সদ্ব্যবহারে মহেশ মুগ্ধ হইয়া গেলেন; এবং তাঁহাকে একদিন সন্ধ্যার সময় নিজ ভবনে আহার করিবার জন্য নিমন্ত্রণ করিলেন। সেদিন প্রবোধ ও নিরুপমা প্রভৃতি কয়েকজন বন্ধুও উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু আহারাদির তত্ত্বাবধান করা, তাঁহাকে বাড়ী ঘর বাগান বাগিচা দেখান, সহরের কাজ কর্ম্মের

বিবরণ দেওয়া, এসকল ভার বীণাপাণির উপর পড়িল। বীণাপাণির প্রতিভা, বুদ্ধিমত্তা, কাজকর্ম্মের ব্যবস্থা, ও সুশিক্ষা দেখিয়া ভদ্রলোকটী মুগ্ধ হইয়া গেলেন। তৎপরে তুই একদিন অন্তর এবাড়ীতে পদার্পণ করিতে লাগিলেন; এবং সৌজন্য ও সদ্ব্যবহারে বীণাপাণিকে আপ্যায়িত করিতে লাগিলেন। মহেশের বুঝিতে বাকি রহিল না যে, বীণাপাণির দিকে তাঁহার মন ঝুঁকিয়াছে। তিনি গোপনে মানুষটীর সংবাদ লইতে লাগিলেন। যাহা শুনিলেন, তাহাতে যুবকটীর প্রতি তাঁহার প্রীতি ও শ্রদ্ধা বাড়িয়া গেল। তিনি মনে করিলেন, ইহার সহিত বীণাপাণির বিবাহ হইলে মন্দ হয় না। কিন্তু বীণাপাণি সে দিকেই নাই। তাঁর যে যুবকটীর প্রতি প্রীতি ও শ্রদ্ধা কিছু কম জন্মিয়াছে তাহা নহে; কিন্তু জন্মিলে কি হয়, তিনি মনের মুখে লাগাম দিয়া মনকে ধরিয়া রাখিতেছেন। এবিষয়ে একদিন পিতা ও কন্যাতে যে কথোপকথন হইল তাহা এই;—

মহেশ। দেখ বীণাপাণি! মিষ্টার মুখার্জ্জির ভাবগতিক দেখে মনে হয় তোমার উপর ভালবাসা পড়েছে; সেই জন্যই যখন তখন আমাদের বাড়ীতে আসতে আরম্ভ করেছেন; তুমি কি বল, যদি মানুষটা বিবাহের প্রস্তাব করে কি বলা যাবে? মানুষটী শিক্ষিত, উচ্চপদস্থ, ও অতি ভদ্র, ইহার সঙ্গে বিবাহ হলে তোমার সকল দিকে ভাল হবে।

বীণাপাণি। না বাবা! অমন কথা বলো না; আমি বিবাহ টিবাহ করবো না; আমি এক সময়ে হেসে মাকে বলতাম, আমাকে তাড়াতে চাও কেন? আমাকে চারিটী খেতে দেওয়া কি তোমাদের পক্ষে এতই ভারবহ? এখন সেদিন গিয়েছে; নূতন কাজ, নূতন চিন্তা এসে পড়েছে; এখন বিবাহের প্রস্তাব আর নয়।

মহেশ। সে কি, তুমি চিরদিন অবিবাহিত থাকবে! আমার ত

একটা কর্ত্তব্য আছে; তোমাকে সৎসঙ্গে বসিয়ে দিয়ে সুখী দেহে যাওয়াতে ত আমার সুখ।

বীণাপাণি। বল কি বাবা, তোমাকে ফেলে কি যেতে পারি তোমার শরীর রুগ্ন ভগ্ন দেখবে কে? তারপর সুরেন, সুজাতা, এদের ত দেখবার লোক চাই; আমার দ্বারা যা হবে তা কি অন্য কাহারো দ্বারা হতে পারে?

মহেশ। সে কি! আমরা কি, ভেসে যাব? এতদিন যদি আমরা চালিয়ে নিতে পেরে থাকি, এখন কি চালিয়ে নিতে পারব না?

বীণাপাণি। না না তা হবে না, তোমার এই রুগ্ন ভগ্ন দেহে তোমাকে একলা ফেলে আমি যেতে পারব না।

মহেশ। তবে আমার আর কথা নাই; এত জোর জবরের কর্ম্ম নয়; বিবাহ করা না করা তোমার হাত; কিন্তু তোমাকে সুখে প্রতিষ্ঠিত দেখে যেতে পারলে সুখী হতাম।

বীণাপাণি। কি বাবা! বল কি, তোমার কোলে থাক্‌লে আমি সুখে থাকব না! তুমি যে আমাকে খেতে দিতে পারবে না, তা আরত নয়; আমি তোমার কোনও অসুখের কারণ হব না; সুখেই থাকবো, তোমার সেবা করবো, মন্দ কি? তারপর জগদীশ্বরের কৃপায় তুমি আমার রক্ষার ব্যবস্থা করে যেতে পারবে।

মহেশ। আচ্ছা তবে তাই হোক্ আমি আর অধিক কি বলবো।

ইহার পরে মিষ্টার মুখার্জ্জি একদিন নির্জ্জনে বাগানে বেড়াইতে বেড়াইতে নানা বিষয়ে নানা কথা বলিতে বলিতে বীণাপাণির নিকট বিবাহের প্রস্তাব উপস্থিত করিলেন। বীণাপাণি, মন খুলিয়া তাঁহাকে সকল কথা জানাইলেন; তাঁহার প্রীতি গভীর প্রতি ও শ্রদ্ধা ব্যক্ত করিলেন; পত্নীভাবে তাঁহার সঙ্গে না মিশিয়া, বন্ধুভাবেই মিশিবেন এই

কথা বলিলেন। যুবকটী একদিকে বীণাপাণির জ্ঞানানুরাগ, আত্মোন্নতিস্পৃহা প্রভৃতি দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া গেলেন; অপরদিকে তাঁহার দৃঢ়চিত্ততা, স্বাধীনভাব ও ধর্ম্মপরায়ণতা দেখিয়া চমৎকৃত হইলেন। বীণাপাণির প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধা দশগুণ বাড়িয়া গেল! তিনি মনের আবেগে বীণাপাণির হস্ত নিজ হস্তে লইয়া বলিতে লাগিলেন; "আজ আমি কি দেখলাম কি শুনলাম! তুমি যাই বল, আমার মন সহজে ফিরবে না। তুমি আমার কাছে দাঁড়ালে যে আমার জীবন ধন্য হবে তাতে কি সন্দেহ আছে? আচ্ছা বেশ, তুমি পিতার সেবা কর, আমি অপেক্ষা করে রৈলাম; তোমার মন যদি কখনও ফেরে আমাকে পাবে; কিন্তু এখন আমাকে বন্ধুভাবে থাকতে দেও; তোমাদের বাড়ীতে আসতে বাধা দিওনা; আমি কিছু উপহারাদি দিলে ফিরিয়ে দিও না; আমার সঙ্গে মিসতে সংকোচ করনা"।

বীণাপাণি। না, তা করবো না।

ইহার পরে মহেশের ভবন মিষ্টার মুখার্জ্জির একটী প্রিয় স্থান হইয়া রহিল; সদা সর্ব্বদা নানা উপহার দ্রব্য তাঁহার নিকট হইতে আসিতে লাগিল; তিনি দুই এক দিন অন্তর সন্ধ্যার সময় আসিয়া আহারের স্থানে বসিতে লাগিলেন; তিনি যেন ডাক্তার ভদ্রের স্থান অধিকার করিলেন। তাঁহার ভাবগতিক দেখিয়া মনে হইল, তিনি বীণাপাণি হইতে মন তুলিয়া লইতে পারিতেছেন না; আশা করিতেছেন কিছুদিন পরে তাঁর মন ফিরিবে; মহেশও বোধ হয় সেই আশা হৃদয়ে ধারণ করিতে লাগিলেন।

এইখানেই বিধবার ছেলের ইতিবৃত্তে যবনিকা পড়ুক। মহেশ কবে [illegible] গেলেন, শেষে বীণাপাণির কি অবস্থা দাঁড়াইল, সুরেন, [illegible] কিরূপ [illegible] উঠিল, পাঠককে তাহা শুনাইয়া আর কি

হইবে? এইমাত্র বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে মহেশ যখন চলিয়া গেলেন তখন একজন দৃঢ়চেতা, কর্ত্তব্যপরায়ণ, স্বজনবৎসল, স্বদেশানুরাগী ও ধর্ম্মপরায়ণ মানুষের স্মৃতি রাখিয়া গেলেন। এরূপ স্মৃতি যাঁহারা রাখিয়া যান, তাঁহারা অমূল্য সম্পদ রাখিয়া যান। অধিক আর কি বলিব।

সমাপ্ত